আধুনিকতার রূপপ্রতিমা

প্রথম খণ্ড

ডি. এন. পাবলিকেশনস্

নিবেদন

সব যুগই আধুনিক যুগ এবং সব কালই আধুনিক কাল।

ধর্মচিন্তায়, সমাজ ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় এবং জীবনের আচার-আচরণ ও ব্যবহার নীতিতে জনগণের জন্য সাধারণ নিয়ম ও রীতি প্রচলিত থাকে। কিন্তু যখন বাঁধা বোলের বুলিতে জনজীবন বাঁধা পড়ে, গতানুগতিকতার কুম্ভীপাকে ক্লান্তি নামে, কুসংস্কারের রুদ্ধতোয়ে মন অসাড় ও স্তব্ধ হয়ে যায়, অবসাদের ভারে জীবন মাধুর্যহীন হয়—তখনই মানুষের মনে মুক্তিপিপাসা জাগে আর এই চিত্ত জাগরণে মানুষ কামনা করে নতুন দিগন্তের, অনুসন্ধান করে নতুন বন্দরের ;—যতক্ষণ পর্যন্ত না ইতিহাস চেতনার নির্মল আলোকে ও পরিবর্তনের পথে এই অন্ধ বিচার, অসাড় অনুভূতি ও শুষ্ক আচারের মরু বালুরাশিতে আবদ্ধ জীবন-সম্পর্কহীন নিয়ম-নীতিতে এবং ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তাতে পালাবদলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিল্প এবং সাহিত্যও এই পরিবর্তনের বাঁকে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। 'আধুনিক' ও 'আধুনিকতা' শব্দের যেন নতুন করে আবার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ঘটে।

দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা জীবন-সম্পর্কহীন আচার ও প্রথার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় অনুশাসনের বিপক্ষে ও পরিবর্তনের সপক্ষে যে আন্দোলন—তাই আধুনিকতার লক্ষণ। 'আধুনিকতা' ব্যাপ্তিত লক্ষণার আধার। 'Time Spirit' বা যুগধর্ম আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ হলেও মনে রাখতে হবে যে আধুনিকতা ও সাম্প্রতিকতা এক বস্তু নয়—একটিতে আছে বিচার, রুচির পরিবর্তন, যুগের দাবি এবং দর্শন ভাবনা ; অন্যটিতে আছে অনিকেত ভাব ও তাৎকালিক উন্মাদনা। আধুনিকতা শব্দটি তাই যুগে যুগে পৃথক পৃথক লক্ষণ গ্রহণ ও অর্থ বহন করে। রেনেসাঁস কালে আধুনিকতার যে লক্ষণ, তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে। এমন কি উনিশ শতকের আধুনিক ভাবনা ও চিন্তার সঙ্গে বিংশ শতকের আধুনিকতার কত পার্থক্য! আগামী একবিংশ শতাব্দী বিংশ শতকের সঙ্গে আধুনিকতার বিচারে কত না সুদূর পার্থক্য রচনা করবে! আবার, একই শতাব্দীর সূচনায় ও পরিণতিতে মানুষ ভাবে ও মর্জিতে বহুতর ব্যবধান রচনা করে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে যে আধুনিকতার লক্ষণ আর অন্তিম পর্বে যে আধুনিকতার স্বরূপ, তাতে সীমাতিক্রমী পার্থক্য ও ব্যবধান দেখা যায়। বাংলা কথাসাহিত্য বিচারে এই ভাবটি স্পষ্ট হয়ে নজরে আসে। আবার যেহেতু মানুষের জীবনসাধনা অখণ্ড

এবং তার বিকাশও অবিচ্ছেদ্য, ফলে অতীতের কোন এক যুগের গৃহীত জীবন-তথ্য সাহিত্যের জীবনসত্য রূপে গৃহীত হতে পারে এবং সে যুগে সেটাই হয় আধুনিকতার লক্ষণ। প্রাচীন আধুনিকতার চিতাভস্মে নবীন আধুনিকতার নবজন্ম। এ যেন পুরাণের ফিনিংস পাখির দেহ থেকে অপর ফিনিংস পাখির সৃষ্টি।

বিংশ শতকের সূচনাতে পৃথিবীর মানুষের 'ভাবে' ও 'মর্জি'তে এক পরিবর্তনের পালা নতুন করে শুরু হয়েছিল। পূর্বেকার ভাব ও আধুনিকতার মর্জির সঙ্গে পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। অতীতের শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষের চেতনারাজ্যে যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল, বিংশ শতকের উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কার এবং প্রয়োগের অভাবনীয় উন্নতিতে মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসে তার পরিবর্তন এনে দিয়ে আরও আধুনিক করে তোলে। ফলে, অতীতের সমস্ত মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিবর্তন চলে দ্রুত তালে ও লয়ে। আধুনিকতার প্রত্যেক পর্যায়ে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে—এবং এই নির্দিষ্ট লক্ষণার জন্যই এক একটি আধুনিক কাল পূর্ববর্তী আধুনিকতার ভাব ও মর্জি থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রগতিমুখী। বর্তমান শতাব্দীতেও মানুষ বিশেষ কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। সমাজ বিচিন্তায়, চিন্তা-ভাবনার অন্তর্মুখিতায়, সংশয় ও সন্দেহে সত্যের প্রকৃত স্বরূপান্বেষণে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, তির্যক দৃষ্টিতে মনোলোকের অন্তস্তলে ডুব দিয়ে inner reality-র অনুসন্ধানে, নির্মোহ দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু যাচাই করে সত্যের জয়গান ও বিচারে, উদার মানবিক হিতাদর্শে সমাজতন্ত্র রচনার আগ্রহে এবং সাম্য-শান্তি-মৈত্রী প্রেরণায় মানুষকে নব চেতনার এক বিশ্ব রচনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। এই যুগে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সমস্ত অনুভাবনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা স্থাপন, অতীতের নিয়ম-নীতিকে পরিত্যাগ, নির্মোহ দৃষ্টিতে পৃথিবীর মায়াময় রূপকে অস্বীকার করে কায়িক রূপকে স্বীকার করা, চৈতন্যপ্রবাহের গতিপথে জীবনানুভাবনার অসংকোচ অনুসন্ধান ও উদ্ধত স্পর্ধায় প্রকাশ, ক্ষণবাদিতাকে চিরন্তন মনে করা ও বিবর্তনবাদের নিরিখে এবং প্রত্যক্ষবাদের মধ্যে সমস্ত রহস্যের উন্মোচন ঘটানো ও ঐহিকমুখিতা—যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্ব-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) পূর্বেই মানুষের ভাবরাজ্যে এই সমস্ত অনুভূতির তাণ্ডব হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ও পরে কাল বৈশাখীর কৃষ্ণ মেঘ সঞ্চারে ঝটিকায় রূপ নেয়।

মানুষের চিন্তারাজ্যে এই পরিবর্তনের চিত্র Virginia Woolf-এর লেখায় বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর কথায়—"On or about December 1910 human nature changed......All human relations shifted—those between masters and servants, husbands and wives, parents and children. And when human relations change there is at the same time a change in religion, conduct, politics and literature".

আবার,

D. H. Lawrence লেখেন,

"It was in 1915 the old world ended."

বাংলা সাহিত্যের তটভূমিতে একই সময়ে পরিবর্তনের ঢেউ লাগে ও মানুষের ভাব ও মর্জিতে বদল শুরু হয়—এবং এই পরিবর্তনের পালাকার ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। জীবন 'চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য' সবুজপত্রে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে উল্কার বেগে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা কথা ও কাব্য সাহিত্যে বর্তমান আধুনিকতার জয়যাত্রা শুরু হয় সেই সময় থেকে।

আমরা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় বিংশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার রূপ—প্রথম পর্বের সূচনা—বিস্তার—শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আধুনিকতার সূত্রপাতে যে বাধা আচার ও নিয়মতান্ত্রিক এবং প্রথাবদ্ধ এক শ্রেণীর সমাজপতি ও অতীতমুখী সমালোচকদের কাছ থেকে নিন্দা ও আক্রমণ রূপে এসেছিল, তারও রূপচিত্র গ্রহণে প্রয়াসী হয়েছি। দুই বিপরীত ভাবধারার সমন্বয়সাধক শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের আলোচনার কালসীমা এই পর্বে নির্ধারিত। শরৎচন্দ্রের পর থেকে আধুনিকতার লক্ষণ পরিবর্তিত হয়েছে যুগপরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। এই পর্বেরও নান্দীপাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে কেন্দ্র করে সাহিত্য ভাবনাতে ভাবদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের সময়ে। সে আলোচনা পরবর্তী কালের। 'আধুনিকতার রূপ প্রতিমা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রত্যেক শিল্পভাবনাই অখণ্ড প্রতিমা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্য শিল্পীরাও চিন্তাঋদ্ধ ভাব-ভাষা, প্রকরণ, চিত্রকল্প ও নব আঙ্গিকে প্রতিমার শিল্পরূপ গঠন করেন। সাহিত্য বিশ্লেষণে আবার এক একটি দিক নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে। এই শতকের সূচনায় মানুষের জীবনচিন্তা যে নব নব রীতি, প্রকৃতি ও আবিষ্কারের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হয়েছিল, ঐহিক চিন্তার ব্যাকুলতায় ও আগ্রহে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মনোভাবে সাহিত্যে গবেষণা

চালিয়েছিল, সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। সফলতা বিচার্য নয়, অনুসন্ধিৎসাই বিবেচ্য।

পরম স্নেহভাজন শ্রী প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য প্রারম্ভকাল থেকেই এই গ্রন্থটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত। অকৃত্রিম সাহিত্য প্রীতিবশে অনেক সময় নীরস দায়িত্ব সযত্নে বহন করে শ্রীমান প্রদীপ তার উদার হৃদয়ের পরিচয় রেখেছে। তার সহযোগিতা আমাদের যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তকটি তাকেই উপহার হিসাবে প্রদত্ত হল।

এই পুস্তকটি রচনা প্রসঙ্গে আমাদের উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক অজিত কুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক অনীক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শোভনলাল গোস্বামী, অধ্যাপক বিদ্যুৎ বরণ ঘোষ, অধ্যাপক ডঃ গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমিত কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ডঃ দেবাশিষ মুৎসুদ্দি, অধ্যাপক ডঃ তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুজিত কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ডঃ বীরেন চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক সুভাষ চক্রবর্তী, কবি শীতল চৌধুরী, অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা সুমিত্রা গুপ্ত, অধ্যাপিকা বাসবী পাল, অধ্যাপিকা সীমা ঘোষ ও বাণিজ্যকর আধিকারিক সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়।

এ ছাড়াও চন্দননগর মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক সর্বশ্রী সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শাশ্বতী ঘোষাল, সনৎ মালিক, লোকনাথ পাইন এবং গোয়েঙ্কা বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক সর্বশ্রী অঞ্জন দত্ত, বীণা দত্ত, নীরবিন্দু দেবনাথ, পরিতোষ দে, পূর্ণচন্দ্র পাত্র এবং বন্ধুবর সফল প্রকাশক শ্রী বিহঙ্গভূষণ কুণ্ডুকে (গোরাবাবু) আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশনার ব্যাপারে ডি. এন. পাবলিকেশনসের তরুণ ও উদ্যমী পরিচালক ও প্রকাশক শ্রী শিবশংকর দে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। তিনি যে রকম দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে গ্রন্থটিকে শোভন ও সুন্দর আকারে প্রকাশ করেছেন, তা সত্যই অভাবনীয়। 'অন্বেষা'র প্রকাশক বন্ধুবর শ্রী প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্য না করলে এই পুস্তকটির আত্মপ্রকাশে বিলম্ব হত। তাঁকে আমাদের হার্দিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছেন শ্রী কানাই চক্রবর্তী। তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

সাহিত্য রসিক, সঙ্গীত প্রেমিক ও চারুবাক্

শ্রীপ্রদীপ·কুমার ভট্টাচার্য

স্নেহভাজনেষু—

অনুক্রম

। সবুজপত্র ও প্রমথ চৌধুরী ।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন যৌবনের অগ্রদূত। 'সবুজপত্রে'র পৃষ্ঠায় তিনি আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন। যে সমস্ত পুরানো সংস্কার ও চিন্তার বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তার সব কটিই বীরবলের সাহিত্য অনুভাবনায় রূপায়িত হয়। তাঁর অনুভূতিতে ঃ "সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যাপ্তি।...অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।"[১] 'সবুজপত্রে'র মননধর্মী জীবনজিজ্ঞাসা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতিষ্ঠা, পার্থিব রূপ-চেতনার মধ্যে সৌন্দর্যের পূজারতি, রক্ষণশীলতা মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ ঝলসানো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অঙ্কুশাঘাতে 'রোম্যান্টিসিজমে'র মোহ মুগ্ধতাকে ক্ষত বিক্ষত করবার প্রবণতা এবং সর্বোপরি যৌবন বন্দনায় জাতির সুপ্ত চিত্তকে জাগরিত করার যে অভীপ্সা, তাতে আশাপরিণামহীন, চিন্তাসংশয় বিক্ষুব্ধ বাঙালী চিত্ত বহুলাংশে সংহত হয়ে আত্মবিকাশের পথ আবিষ্কার করেছিল। প্রমথ চৌধুরী তাঁর যৌবননিষ্ঠ মনোভাবনার প্রবল স্রোত ভীমবেগে দেশবাসীর ঊষর অস্থির জীবন বেলাভূমির উপর প্রবাহিত করেছিলেন। এক নতুনত্বের বিস্ময় এবং আত্ম আবিষ্কার চিন্তা, যা সে সময়ে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে প্রহর গুণছিল, 'সবুজপত্র' তাকে মুক্তি দিয়েছিল মানুষের চিন্তা ও মনোভাবনার মধ্যে। তাই এই পত্রিকা কোন সাধারণ মাপের ছিল না। "তার কণ্ঠে ছিল নব জীবনের মন্ত্র— ওঁ প্রাণায় স্বাহা।" 'সবুজপত্রে'র চিন্তাদর্শ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী লেখেন ঃ "সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখিরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নবশাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন তাহলে আমরা বাঙালী জাতির সবচেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারই জ্ঞান। *** সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। ***

...তবে বাংলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে তার চেষ্টা আমাদের

আয়ত্তাধীন।...আমাদের প্রবৃত্তির সহজ গতিটি যে ঐ নিজেকে ; এবং অপরকে সজাগ করে তোলার দিকে।"[২]

বাঙালীকে চৈতন্যবোধ বিলুপ্তি থেকে মুক্তিদান ও আত্মহননের যন্ত্রণাভার লাঘব করবার যে শপথ 'সবুজপত্রের মুখপত্রে' ঘোষিত হয়েছিল, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জীবনের মাটিতে নতুনত্বের ভাব বীজ বপনের পরিকল্পনা, এবং এই নববোধন ছিল সম্পূর্ণভাবে যুগলক্ষণাক্রান্ত। সংস্কারমুক্ত মন, মানবহিতবাদ ও মননের পূজারতি —এই ত্রয়ী আদর্শে আধুনিকতার যে বেদী রচিত হয়েছিল, তার উপরেই প্রমথ চৌধুরী আপন সাহিত্য চিন্তার বিগ্রহটি স্থাপন করেছিলেন। তিনি যে জীবনচিন্তা নিয়ে সাহিত্য রচনাতে ব্রতী হন, তাতে হৃদয়ধর্মের বাহুল্য ছিল না, 'বুদ্ধির মননা-লোকেই তার অধিষ্ঠান। হৃদয়ধর্ম বর্জিত আধুনিকতার যে প্রসার তৎকালে প্রতীচ্য সাহিত্যে সাহিত্যধর্ম হিসাবে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল, প্রমথ চৌধুরী সেই যুগধর্মের চিন্তাই বহন করতেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে এই যুগধর্মের প্রভাবের ফলে মানুষের জীবন ক্রমশঃ হৃদয়ধর্ম বর্জিত ও বুদ্ধিবৃত্ত হয়ে পড়ছে। সাহিত্যে মননের লীলা খেলা শুধু অপরিহার্য নয়—অনিবার্যও বটে। 'সবুজপত্রে' এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতীচ্য সংস্কৃতির তরণী বেয়ে আগত যে মননধর্মী অনুধ্যান জাতির তন্দ্রাবিজড়িত চিত্ততটে আঘাত হেনে সুপ্ত চৈতন্যসত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল, তাতেই তার দীক্ষা হয় আধুনিকতার গতিবেগের মুক্তিবাণীতে। 'সবুজপত্রে'র পৃষ্ঠাতে এই নবজাগরণী চেতনাকে বাণীরূপ দেওয়া হয়েছিল। "ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি।"[৩]

বাংলা সাহিত্যকে মননের গ্রাণাইট স্তরে স্থাপন করে জীবনানুভাবনাকে এক নতুন পথে পরিচালিত করেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'নতুনের পথ'ই প্রকৃত আধুনিকতার পথ—পুরানোকে আঁকড়ে থাকার পথই থেমে যাওয়া এবং স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হওয়া। তাই বিচারবুদ্ধি ও মনন শক্তির উপর গুরুত্ব দান করে প্রমথ চৌধুরী আধুনিকতার যুগবৈশিষ্ট্য অথবা যুগধর্মের মৌল চেতনাকে পরিস্ফুট করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সাবধানতার সীমা ছিল না। একদিকে প্রাচীনের সুদৃঢ় বেড়া, অপরদিকে নবীনের নতুন জীবনবেদ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে আধু-নিকতার সরণী নির্মাণ তাঁর সুকঠোর ব্যক্তিত্বের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মতে 'সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।' প্রমথ চৌধুরীর চিন্তা ও লেখনী উভয়ই ছিল

ব্যক্তিত্বস্পৃষ্ট। তাঁর অনন্যসাধারণ মননশীলতার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য পালাবদলের কালে সংহত হয়ে বাস্তবমুখী হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বিস্তারে প্রমথ চৌধুরী বর্তমান বিশ্বের গতিশীল বিবর্তনবাদী প্রবহমানতাকে গ্রহণ করেন। 'সবুজপত্রে' তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেন: "ইউরোপীয় সাহিত্য ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক মদিরাই হোক আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে এই ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে, আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে দিকে হোক কোনো একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুপাঁকু করছি।...আমরা সকলেই গতিশীল, কেউ স্থিতিশীল নই।"[৪]

সবুজের বন্দনাগীতিতে প্রমথ চৌধুরী যৌবনের চিরন্তন চিরশাশ্বত প্রাণশক্তিকে আহ্বান করেছিলেন। কারণ তাঁর চিন্তাতে: "যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজের যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়।...দেহের যৌবন অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে, সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে।...সমগ্র সমাজের এই জীবন প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবনও সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।"[৫] যৌবনের অন্তরে যে নিত্যস্থায়ী অমর প্রাণশক্তি আছে, তাকেই প্রমথ চৌধুরী প্রাণের প্রাকৃত ধর্ম বলে মনে করেছেন—কারণ প্রাণের ধর্ম অগ্রসর হওয়া—অমৃতত্ব অর্জন। এই গতির লীলাই শক্তি—জীবনের সত্যকার স্বরূপ অন্বেষণের ধর্ম।

'সবুজপত্রে'র পৃষ্ঠাতে প্রমথ চৌধুরী যৌবনের দূতীয়ালি করলেও কোথাও তরল উচ্ছলতার পরিচয় দেন নি। অসাধারণ সংযমের মধ্যে তিনি যৌবনের উদ্দামতাকে সংযত করতে সফল হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন: "যে শক্তি আমাদের নিজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয় নি; তা হয় দূর দেশ থেকে নয় দূর কাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনো আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিংবা জীবনে ফল পাব না। এই নতুন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত হওয়া দরকার। অথচ

ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করতে পারি তবেই তা পরে সাহিত্য দর্পণে প্রতিফলিত হবে।···সাহিত্য গড়তে কোন বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া।"[৬]

এক নিবিড় আত্মসংযমের অধিকারী ছিলেন বলেই প্রমথ চৌধুরী কোনদিন দেহ-সর্বস্বতা ও ভোগবিলাসিতাকে যৌবনের প্রাকৃত ধর্ম বলে গ্রহণ করেন নি। 'যৌবনকে রাজটীকা' দেবার অর্থ তাঁর কাছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল ঃ "দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র।···দেহ সংকীর্ণ ও পরিছিন্ন ; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই ; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে। *** যেমন প্রাণী জগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই।"[৭]

তাই সাহিত্য রচনাতে তিনি কোনদিনই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাকে প্রশ্রয় দেন নি, নিজে ইন্দ্রিয়বাদী হবার সাধনা করেছেন ও সাহিত্য রচনাতেও নির্দেশ দিয়েছেন সমকালের লেখকদের। এই প্রখর ইন্দ্রিয়বাদিতা তাঁকে প্রকৃত 'রূপজ্ঞানে'র অধিকারী করে তুলেছিল। বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখ লাভ করে, তা আর্টের উপকরণ হিসাবে গৃহীত এবং বস্তুর এই সুখদায়ক গুণের নাম 'এসথেটিক্যাল কোয়ালিটি' অর্থাৎ রূপ ; এবং মনের সেই সুখলাভ করবার ক্ষমতার নাম 'এসথেটিক ফ্যাকালটি' অর্থাৎ রূপ জ্ঞান।"[৮] ফলে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ, যার দ্বারা মানুষ সমাজকে অধিকতর সুন্দর করে তুলতে পারে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই রূপজ্ঞান ছিল সম্পূর্ণভাবে নির্মোহ। রূপের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদী চিত্ত কোন অকারণ রূপমুগ্ধতায় ডুব দেয় নি। রূপের মধ্যে প্রাণের অন্বেষণই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য চিন্তার বড় কথা। তাঁর ইন্দ্রিয়বাদের আরাধনার মধ্যে কোন ভোগ লোলুপতার নিবিড় আশ্লেষ নেই। তিনি রূপচর্চার মধ্যে লোভ অথবা ভোগের অনুপ্রবেশ ঘটান নি ; তাঁর সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের কোন অভিষেক নেই।[৯] এরই ফলে তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যকে স্তুতি বাক্যে গ্রহণীয় ও বরণীয় করতে পারেন নি।*

সাহিত্য বিচিন্তার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী নিরাসক্ত বস্তুনিষ্ঠ ঋজু মনোভঙ্গী নিয়ে সমস্ত কিছু বিচার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের আজীবন অনুরাগী হওয়ার জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনীয় বিষয় সম্পর্কে হয়েছিল বিশেষভাবে objective। এবং এই objective দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তিনি যা ইন্দ্রিয় অগোচর বা বুদ্ধির অগম্য, তার অনুসন্ধান খুব বেশী কোথাও করেন নি। প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস যে সামাজিক মনই আমাদের চিরদিনের মন আর বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের চিরজীবনের সহায়। ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ, তার প্রধান কারণ, "বাহ্য ঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই ফরাসী সাহিত্যের আসল কারবার; এককথায় ফরাসী জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশী তীক্ষ্ণ ও প্রখর। *** মানব সমাজ, মানব মন ও মানব চরিত্রের জ্ঞান লাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসী সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। *** ফরাসী জাতির দেহে কিংবা মনে কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিন কালেও তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। *** ফরাসী সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য দেবতা হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে চিত্রিত করে। *** ফরাসী সমালোচনায় বিষয় কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সমগ্র মানব জীবন।"[১০]

'সবুজপত্রে'র অপর মূল উদ্দেশ্যও আমরা এই উদ্ধৃতির মধ্যে খুঁজে পাই। প্রমথ চৌধুরী রোম্যান্টিকতার অকারণ মোহবিলাস ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ রোম্যান্টিক সাহিত্য অথবা রোম্যান্টিক কবি সর্বদা নিজের কথাই বলে থাকেন। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা নৈরাশ্য, বিশ্বাস-সংশয় নিয়েই কাব্য রচিত হয়ে থাকে।

---

* "জয়দেব-বর্ণিত প্রেমের উপলব্ধি দেহজ আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহার পরিণতি দেহের মিলনে, তাহার উদ্দেশ্য দেহের ভোগজনিত সুখলাভ; তাঁহার নিকট বিরহের অর্থ প্রণয়ী-প্রণয়িণীর দেহের বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্ট।

গীতগোবিন্দে আসলে ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবলমাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার। যে রমণীর মনে প্রেম নাই, যাহার হৃদয় নাই, কেবলমাত্র দেহ আছে—তাহার স্ত্রী সুলভ লজ্জা নম্রতা ইত্যাদি মানসিক সৌন্দর্যের বিশেষ অভাব থাকিবার কথা; রাধিকা প্রমুখ গোপ যুবতীদিগের এই নির্লজ্জতার পরিচয় তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথোপকথনে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়।" —জয়দেব।

রোম্যাণ্টিকদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বই হচ্ছে জগতের সার সত্য। ফলে মানবসমাজ, মানব মন ও মানব চরিত্রের কথা ও বর্ণনা এতে অনুপস্থিত থাকে। সেইজন্যই সংস্কার-মুক্ত মননদীপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রমথ চৌধুরী ইংরেজী সাহিত্যের 'রোম্যাণ্টিসিজমে'র পরিবর্তে ফরাসী সাহিত্যের 'রিয়েলিজমে'র দিকেই ঝুঁকেছিলেন। মানবমন ও মানব জীবনের উপর বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করে তিনি যা দেখে-ছিলেন, তাকেই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। সে আলোকে 'অনেক সুন্দর, অনেক কুৎসিত, অনেক মহৎ, অনেক ইতর' মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলি 'যা হেয় তাও যেমন সত্য, যা উপাদেয় তাও তেমনি সত্য।' এরই জন্য তিনি 'রবীন্দ্রযুগের' বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েও রবীন্দ্রপ্রভাবিত হন নি। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁর কৃতিত্বের অন্যতম লক্ষণ—তাঁর প্রকাশিত 'সবুজপত্রে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্রে'র এই বিশিষ্টতাকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন: "মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে—পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তা ছাড়া আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে—এখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখক মণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে ইচ্ছা করি। এইজন্যই সবুজপত্রের প্রতি আমার যা-কিছু ঔৎসুক্য।"[১১]

কেবলমাত্র বুদ্ধিবাদ বা মননশীলতার চর্চা নয়, সমকালে বিশ্বসাহিত্যে গণচেতনা, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক চেতনার অনুশীলন শুরু হয়েছিল। 'সবুজপত্রে'র পাতাতেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা সমানভাবে স্থান পায়। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য ছিল: "...নবযুগের ধর্ম হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে কোনও জিনিষ মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই।"[১২] পরবর্তীকালে সব বিষয়ে প্রগতিবাদের ধারক 'কল্লোল' পত্রিকা এবং সমাজতন্ত্রের প্রচারক 'পরিচয়', যা অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে জনচিত্তে পরিব্যাপ্ত করতে আগ্রহী হয়েছিল, তার সমস্ত কৃতিত্ব 'সবুজপত্রে'র প্রাপ্য।[১৩]

'সবুজপত্রে'র এই বিশালতাকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন: "প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার

তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। পরিচিত কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'নূতন ভূমিকা' বলে অভিহিত করেছেন, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে বাঙালীকে রুদ্ধ মানসিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার আগ্রহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নানা জটিলতা বাঙালীকে বহু সংশয়তার আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল, তারপর যুদ্ধোত্তর কালের ঘটনা বাঙালী জীবনকে করে তুলেছিল আরও সমস্যাসঙ্কুল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌পর্বে, সর্বনাশা ভাঙনের মুখে 'সবুজের অভিযানে' রুদ্ধ খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবার ডাক দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—আর প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' জীবন-বন্দীশালার লৌহ কপাটকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন নির্মোহ মননশীলতায়। তাঁর মনপ্রাণের অবাধ মুক্তিতেই লেখনী 'পালিশ করা ঝক্‌ঝকে তীক্ষ্ণ' অসির মত ঝল্‌সে উঠেছিল। বাঙালীর মানসিক সংগঠনের জন্য শাশ্বত যৌবন বন্দনায় তিনি এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছিলেন। তিনি প্রাণোচ্ছল যৌবন-দীপ্ত গতিশীলতাকে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর সামাজিক মনকে তৈরী করতে চেয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর এই চিন্তা কালের স্রোত বেয়ে ভেসে এসেছিল এবং তিনি তাকে উচ্চ শিল্পবোধ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদিতা ও অসাধারণ সংযমের মধ্যে সংহত করেছিলেন। ফলে 'সবুজপত্রে'র গুরুত্ব ছিল অপরিসীম—যা পরবর্তীকালে আধুনিকতার সরণী নির্মাণ করেছে।

আমরা জানি যে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বসবাস করেও নিজেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত রাখতে সমর্থ হন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা প্রখর স্বাভিমানবোধ বর্তমান ছিল যা তাঁকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে রেখেছে। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্বনাশা ভাব-বিহ্বলতার মোহ থেকে সচেতন করে নতুন সাহিত্যিকদের চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় আত্মানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। পরবর্তীকালের নতুন বিদ্রোহীগোষ্ঠীর মত তিনি প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি, কিন্তু অক্ষম রবীন্দ্রানুকরণ যে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অবলুপ্তির পথ, সেই আসন্ন মৃত্যু থেকে তিনি জাতি ও সাহিত্যকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অক্ষম অনুকরণ, 'রোম্যাণ্টিসিজমে'র আবেগ বিহ্বল 'দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে'র প্রতি সুগভীর অনুরক্তি, প্রমথ চৌধুরীকে গভীরভাবে বিমর্ষ করেছিল। কারণ, রবীন্দ্রানুসারী কবিকুল, রবীন্দ্রনাথের বাহ্যিক কাঠামোর আবেগটুকুকে অনুকরণ করতে ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু সেই মনোহরণ ভাব ও সৌন্দর্যের অন্তরালে চিন্তা ও অনুভূতির যে কঠিন বন্ধন হীরক খণ্ডের দৃঢ়তায় নিটোল হয়ে

আছে, তা তাঁদের চিন্তার বাইরে ছিল। ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নৈরাজ্যের অবতারণা হয়। এই ধরণের অন্ধ অনুকরণ যে স্বাস্থ্যহীনতার কারণ, তা উপলব্ধি করেই তিনি 'হাস্যরস প্রধান গল্প ও ভাস্কর্যধর্মী সনেট' রচনাতে মনোনিবেশ করেন। এই দুই অনুভাবনাই তাঁর মৌলিক চিন্তার ফল। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ অথবা অনুসরণ না করেও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ সম্ভব, এই দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরী পরবর্তীকালের 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' প্রভৃতি বিদ্রোহীগোষ্ঠীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন। যৌবনের প্রাণবন্যায় অভিষিক্ত ছিলেন বলেই তিনি ছিলেন রবীন্দ্রযুগে, "প্রথম সেই সুরে আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে।"[১৫]

পরবর্তীকালের নবীন লেখকেরা প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকেই আধুনিকতায় দীক্ষিত হয়েছিলেন ; যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ মনে রাখতে পারেন নি। যে কঠোর 'আত্মসংযম' ও 'সীমার ভিতরে আবদ্ধ হওয়ার' কথা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি বারবার বলেছিলেন, কোন লেখকই তা রাখতে পারেন নি। অতি-কথনের ভাবালুতায় এবং 'রোম্যান্টিসিজমে'র মোহমুগ্ধতায় তাঁরা ভেসে গিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী যে সংস্কারমুক্ত মন এবং সুনীতি-দুর্নীতি চেতনা সাহিত্য অনু-ভাবনাতে লাভ করেছিলেন, তার কোন অনুবর্তন পরবর্তীকালে হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তার ফলপ্রসূ ভাবসম্মিলন। আর্টের সাধনাতেই প্রাণশক্তির যে স্ফুরণ হয়, তাতেই এই মিলন সম্ভব। "পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণ শক্তির বিরোধ নয় ; মিলনের উপর আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশাকরি বাংলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটবে তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য চাই আর্ট, কারণ প্রাণ-শক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য।"[১৬]

পরবর্তীকালে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি' যে পরিমাণ 'কনটিনেনটাল' সাহিত্য চর্চার নিদর্শন রেখেছিল, তাতে দেশের অতীত এসে মেলেনি বরং অতীত আরও দূর-অতীত হয়ে গিয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের '**waste land**' উর্বর হয় নি। এই গোষ্ঠীর রচনাশৈলীতে প্রকৃত সাহিত্যের প্রাকৃতিক কুসুমের বর্ণালী প্রস্ফুটিত হয় নি, কেবলমাত্র কাগজ-ফুলের কৃত্রিম সৌন্দর্য মন ও চোখকে যে পরিমাণে ধাঁধিয়েছে, ঠিক সমপরিমাণেই চিত্তকে করে রেখেছে তৃষিত এবং উষর।

বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের সূচনা করাই প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র প্রধান

কৃতিত্ব। বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্রে নতুন তরঙ্গের ঢেউ যে পলি নিক্ষেপ করেছিল, তাতেই আধুনিকতার বীজ বপন করা হয়। "মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে (বিংশ) শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস-ক্ষেত্রে একটা রাজ পরিবর্তনের যুগ সূচিত হইয়াছে।"[১৭] উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য ধারার অবসান এই সময়েই ঘটেছিল। সমাজের বাধা-নিষেধের গণ্ডীর ভিতরে মানুষের হৃদয়াবেগ ও প্রবৃত্তি মার্গকে আবদ্ধ করা যায় না, সংস্কারসম্মত নীতিবোধের তুলাদণ্ডে ব্যক্তি-মানসের মূল্যায়ন সম্ভব নয়—যুগান্তর সৃষ্টিকারী এই মুক্ত চিন্তা এবং জীবন প্রত্যয় বাংলা সাহিত্যে দেখা দিতে শুরু করে। সাহিত্য চিন্তায় বৌদ্ধিক চেতনার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটতে থাকে। রূপ ও সৌন্দর্য পিপাসা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ সম্ভোগ কামনা স্তরে নেমে আসে, দেহতলীতে শুরু হয় প্রাণের সুধার অন্বেষণ। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর লেখনীতে এই নতুন কালের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই বঙ্কিমী রীতি পরিত্যাগ করে-ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর বৌদ্ধিক চিন্তা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যস্পৃষ্ট দৃঢ় মনোভাব, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি ইন্দ্রিয় সচেতন অনুভাবনা, বলিষ্ঠ জীবনবাদ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অঙ্কুশে ভাবলেশহীন রোম্যাণ্টিকতাকে ক্ষত বিক্ষত করার চেষ্টা, সমস্ত কিছু একত্র যোগে আধুনিকতার বাক্ প্রতিমা নির্মাণ করে। রবীন্দ্রনাথের হাতে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। 'সবুজপত্রে' আধুনিকতার বোধন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কর্মচিন্তা সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বান মাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি।"[১৮] রবীন্দ্রনাথের কথার শেষাংশে 'সবুজপত্রে' তাঁর সাহিত্যের পালাবদলের কথা আপন উক্তিতেই স্বীকৃত হয়েছে।

॥ ২ ॥

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব অনুবাদক হিসাবে। তিনি ফরাসী সাহিত্যের বিখ্যাত গল্পকার প্রস্পেয়ার মেরিমের দু'টি গল্প 'Etruscanvase' অবলম্বনে 'ফুলদানী' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) ও 'কার্মেন' (Carmen) তর্জমা করেন। অবশ্য কোন কারণে শেষেরটি অসমাপ্ত থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'ফুলদানী' গল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সাধনা' পত্রিকাতে লেখেন: "ফুলদানীর মত গল্প বঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা অনুচিত।"

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'তে লিখেছেন : "তার পরেই আমি মেরিমের কার্মেন তর্জমা :করি। কিন্তু সেটি শেষ করতে পারিনি বলে প্রকাশ করিনি। কার্মেন অনুবাদ করবার কারণ, তার বিষয়বস্তু ফুলদানীর চাইতে ঢের বেশি অসামাজিক। সাহিত্যের শুচিবাই প্রথম থেকে আমার ছিল না। এবং প্যুরিটানিজম্‌কে আমি কোন কালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি।"

শেষ বাক্যটিতে প্রমথ চৌধুরীর আধুনিক চেতনা ও শিল্পী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। কেবল বুদ্ধিবাদিতা নয়, পরিপূর্ণ যৌবনশক্তিকে জীবন ও প্রাণের প্রতি স্পন্দনে রূপায়িত করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর রূপতৃষ্ণা, সৌন্দর্যের প্রতি গভীর আগ্রহ, জীবনকে অবিকৃত এবং তদ্‌গত চিত্তে না দেখার অভিলাষ, মানুষকে নির্মোহ দৃষ্টিতে স্বচ্ছ ঋজু ভঙ্গীতে বিচার করার প্রবণতা, সবই তিনি ফরাসী সাহিত্য থেকে লাভ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য রচনা 'জোর করা ভাব আর ধার করা ভাষা'তে রূপমণ্ডিত হয়নি সত্য, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের 'রিয়ালিস্টিক' চেতনা ও 'অব্‌জেকটিভ' দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সাহিত্য মানস পুষ্টিতে যে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।* এইজন্য তিনি কোনকালেই কোন সংস্কার অথবা গোঁড়ামির শিকার হন নি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই তিনি যাবতীয় দ্বিধা ও সংকোচ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'কেবলমাত্র সাহিত্য নয়, সমগ্র মানব জীবন।' শুধু তর্জমার দুর্বলতা হেতু রবীন্দ্রনাথ গল্পটির প্রচারে বাধা সৃষ্টি করেন নি—গল্পটির বক্তব্য বিষয়ে সর্বসংস্কার মুক্ত মনোভাব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মননদীপ্তি তৎকালে কবিগুরুর পক্ষে সহ্য করা সহজসাধ্য ছিল না। এমনকি পরবর্তীকালে 'চোখের বালি' ও 'নষ্ট নীড়ে'র রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাযুক্ত চিত্তের পরিচয় গোপন নেই। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই ছিলেন কুণ্ঠাহীন এবং আপন মত ও পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সাহিত্য চিন্তার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী আপন মনের অভীপ্সাকে বিবৃত করে লিখেছিলেন : "সকল দেশেই মনেরও একটা চল্‌তি পথ আছে। অভ্যাসবশতঃ এবং সংস্কারবশতঃ দলে দলে লোক সেই পথ ধরেই চলতে ভালবাসে, কারণ মুখ্যতঃ সে পথ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ।...আপনাদের মত এই যে সামাজিক জীবনের পদানুসরণ কবি

---

* "...In the simplicity of his themes, which are concerned with primary emotions like greed, hate, lust and jealousy, he is in the true Maupassant tradition. He also sees life in a glare"—A Challenging Decade : Lila Roy ; P55.

কিংবা দার্শনিকের মনের কাজ নয়। জীবনকে পথ দেখানোই হচ্ছে সে মনের ধর্ম অতএব কর্তব্য।"[১৯] শিল্পীর সঙ্গে শিল্প নির্দেশকের এক সমন্বয় প্রমথ চৌধুরীর গল্পে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান ভঙ্গী হচ্ছে সৃজন শক্তির আবেশময়তার সঙ্গে সমালোচনাশক্তির এবং অতন্দ্রিত বিচার বুদ্ধির অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ফলে তাঁর ছোট গল্পগুলি আসলে গল্প ও প্রবন্ধ—একাধারে দুই-ই।[২০]

সুতরাং রবীন্দ্রযুগে আত্মপ্রকাশ করেও কেন প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র প্রভাবিত হন নি, এবং কোন অনুভাবনায় স্বকীয় পথে সাহিত্য পরিচালনা করেছিলেন, তার স্বরূপটি আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্বভাবতঃই নেই। গল্পের অন্তর্নিহিত গভীর জীবনবোধ, নিগূঢ় সৌন্দর্য-চেতনা, কথা ও কাহিনীর বিস্ময়কর সংমিশ্রণের 'ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা', সামাজিক বাস্তবতা—যা রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের অন্তর্নিহিত উপাদান, কোন কিছুই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ ছাড়াও মৌলিক গল্পের রূপায়ণে তাঁর সদা সচেতন ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে হয়। তিনি একটি পত্রে আত্মবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: "আমার মনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে প্রচলিত মতগুলোকে আমল না দেওয়া। অর্থাৎ সচরাচর enlightened নামধারী লোকদের সঙ্গে মতে যাতে না মেলে তার জন্যে আমার একটু চেষ্টা আছে।"[২১] এই রকম একটি অতি আত্মসচেতন ব্যক্তিমানসের অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে একক—বোধহয় নিঃসঙ্গ। তবে ব্যক্তিত্বের বিকাশে ভরপুর।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্ফটিক স্বচ্ছ কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গীতে গল্পগুলির মধ্যে যা বলতে চেয়েছেন, তা মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। তাই তাঁর পক্ষে puritanism মানসিকতার অধিকারী হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রগতিবাদী মন বিশ্বাস করত না যে জীবনের সত্যকে গোপন করে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন: "আমার মতে যা সত্য, তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়।"[২২] জীবনে সত্যের পরিচয় তিনি লাভ করেছিলেন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রস-গন্ধ ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ জগৎ থেকে। তাঁর ইন্দ্রিয়বাদী হবার যে প্রচেষ্টা, তা সচেতন ব্যক্তি মানসিকতার সক্রিয় প্রয়াস। প্রমথ চৌধুরীর সদা জাগ্রত বৌদ্ধিক অনুভাবনা রূপলোক ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সচেতনতাতেই সাহিত্যের 'ভাবলোক' সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল: "ভগবানে আমার বিশ্বাস, মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখবার জন্য; তাতে ঠুলি পরবার জন্য নয়।"[২৩] 'অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' ছোট গল্পে তিনি বলেছেন: "ছেলেবেলা থেকে beauty-এর মধ্যে বর্ধিত না হলে লোক যথার্থ সুশিক্ষিত হয় না।" এই beauty চেতনাই তাঁর মন-

প্রাণের অবাধ মুক্তি দিয়েছিল এবং শিল্প-লেখনীও মুক্তি পেয়েছিল সমস্ত puritanic মনোভাবনার বিরুদ্ধে। তৎকালে রবীন্দ্রনাথের অতি সূক্ষ্ম ভাবনায় যা অসম্ভব ছিল, এমন কি শরৎচন্দ্রের পক্ষেও যা সম্ভব হয় নি, প্রমথ চৌধুরী দ্বিধাহীনভাবে সেই মনোলোকের অপার রহস্যময়তাকে অকুণ্ঠচিত্তে বাণীরূপ দিয়েছেন।[২৪] এই বিষয়ে তাঁর চিন্তা যেন 'কল্লোল', কালি-কলম', 'প্রগতি'র সাহিত্য ভাবনার অগ্রদূত। 'ঝাঁপান খেলা' গল্পের পরিসমাপ্তিতে নিটোল ছোটগল্পের স্বাদ ও মাধুর্য যতই থাক না কেন, মনের অপার রহস্যময়তা মুক্ত প্রাণের পরিপূর্ণ জীবন শক্তিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ নিবিড় প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একদিকে পৌরুষের তীব্র প্রাণশক্তি অপর দিকে রূপমুগ্ধতা, দুই-ই একটানে যেমন সমাজের ঘুণধরা কাঠামোকে ভেঙ্গে ভাসিয়ে দিয়েছে, তেমনি বলিষ্ঠ জীবনের জয়গানও গেয়েছে। 'ঝাঁপান খেলা' গল্পের প্রধান চরিত্র বীরবলের রূপ বর্ণনা: "আর তার রূপ! অমন সুপুরুষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। সে ছিল কালো পাথরের জীবন্ত এপোলো।" আর তার পৌরুষের বর্ণনা: "···মাস দুই পরে ঝগড়ু মেথর যখন···এসে নালিশ করলে যে, বীরবল তার বউকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে,···মার মনে হল এটা অবিচার, এবং বাবাকে সে কথা বলাতে তিনি বললেন, 'তুমিও যেমন, ওদের বিয়েই নেই, তো কে কার বউ। আর তা ছাড়া ঝগড়ুকে তো দেখেছ, বেটা বাঁদরের বাচ্চা। আর লখিয়াকেও তো দেখেছ? কী সুন্দরী! সে যে ঝগড়ুকে ছেড়ে বীরবলের কাছে চলে যাবে, এ তো নিতান্ত স্বাভাবিক। রাধাকে কেউ ঘরে রাখতে পারবে না—সে কৃষ্ণের কাছে যাবেই যাবে। এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম।" গল্প কথকের পিতার উক্তি প্রকারান্তরে প্রমথ চৌধুরীর নিজেরই সদা জাগ্রত রূপচেতনার অনুলিপি। সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব—শুধু তাই নয়, পৌরুষের উগ্র বীর্যই যে জীবন রস পানের প্রকৃত অধিকারী, সে কথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছেন। তাঁর 'রূপজ্ঞান' তথাকথিত 'ধর্মজ্ঞানকে চাপা দিয়েছিল।'

রূপের নেশায় এবং রূপের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক রীতি-নীতিকে অস্বীকার করবার আর এক অনুলিপি প্রমথ চৌধুরীর 'সহযাত্রী' গল্পটি। রূপ সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র পুরুষের মধ্যে থাকে না, নারীচিত্তের গভীরেও তা সমশক্তিতে ক্রিয়াশীল। রূপের তৃষ্ণা ও দেহের ক্ষুধা যে পরস্পরের পরিপূরক, তা প্রকাশ করতে প্রমথ চৌধুরী কখনও কুণ্ঠিত হন নি। তিনি জীবনের **vital force**-এর বিকাশকে সত্য বলে মনে করতেন, তাই জীবনের যে ধর্ম স্বাভাবিক, তা প্রাগৈতিহাসিক জৈবানুভূতি হলেও প্রকাশ করতে দ্বিধাচিত্ত হন নি। জীবন সত্যকে প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাছে লজ্জাকর বস্তু বলে কিছু ছিল না।

যৌবনের অপরিমেয় আবেগের মধ্যে যে প্রাণশক্তি রূপ-রস-বর্ণ-স্পর্শভরা ইন্দ্রিয়-বাদিতার দিকে চিত্তকে আকর্ষণ করে, প্রমথ চৌধুরী তাকেই জীবনের স্বাভাবিক লীলা বলে মনে করতেন। জীবনচিন্তার অন্তর্দ্বন্দ্বে দেহমন পীড়িত হয় না বলেই জীবনের বিকাশ কোন কারণে খর্ব হয় না। জাড্য সংস্কার ও প্রথাবদ্ধ রীতির মধ্যে প্রমথ চৌধুরী কোনদিন জীবনের স্রোতকে আবদ্ধ করেন নি। তাঁর মতে—'প্রবাহই হচ্ছে মুক্তি।' কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হলেই জীবন মাধুর্যহীন হয়ে পড়ে। শুষ্ক প্রথা ও আচারের মরুবালুতে এই বিনাশ, মানুষের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ট্র্যাজেডি। জীবনকে উপভোগ বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয় দিয়ে করা যায়—ধর্মীয় সংস্কারের পুঁটুলিতে 'নহুলি যৌবন' বাঁধা থাকে না। 'সহযাত্রী' গল্পের স্ত্রী সাহচর্য বঞ্চিত সিতিকণ্ঠ ঠাকুরের কাহিনীতে এই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর অজ্ঞতাই সিতিকণ্ঠের সকল দুঃখের কারণ। সুতীব্র প্রাণশক্তি ও যৌবনোচিত সাহস দিয়ে সে নারীর রূপতৃষ্ণা ও যৌবনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি বলেই প্রাণ তার কাছে ধরা দেয় নি। দেহ-প্রাণ যখন জেগে উঠেছে, তখন রূপ ও সৌন্দর্য অনেক দূরে—নাগালের বাইরে। "সে ছিল নিতান্ত গরীবের মেয়ে, কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। স্বর্গের অপ্সরা ভুলে মর্তে এসে পড়েছিল। *** আমারই এক ছোকরা আমলার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেও সে বিবাহ করবে না, এই পণ সে ধরে বসেছিল। ছোকরাটি *** দেখতে সুপুরুষ ***। বলা বাহুল্য, এ গুজব শোনবামাত্র আমি ছোকরাটিকে আমার বাড়ি থেকে দূর করে দিলুম। তার কিছুদিন পরেই আমার স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেলেন। সুতরাং আমার মনে এ সন্দেহ রয়েই গেল যে, সে মরে নি—পালিয়েছে। সে যে কি প্রকৃতির মেয়ে ছিল তা আমি বলতে পারি নে, কারণ বিবাহের পর তার সঙ্গে আমার ভালো করে আলাপ পরিচয় হয় নি। সে ছিল বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাই তাকে ছুঁতে ভয় করতুম। বিদ্যুৎকে পোষ মানাবার বিদ্যে আমি জানতুম না। বহুমূল্য রত্ন বাক্সেই বন্ধ ছিল, হঠাৎ একদিন অন্তর্ধান হল। *** ওঃ কি রূপ তার! *** আমার স্ত্রী হরণ করে নিয়ে যাবে, আর অক্ষত শরীরে হেসে খেলে বেড়াবে, এমন লোক এ দুনিয়ায় আজও জন্মায় নি। *** পাশ দিয়ে একখানি ট্রেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল। সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'এই যে, ট্রেনে তারা যাচ্ছে।" গল্পটির সর্বাঙ্গে কৌতুকের ঘন রস মাখানো থাকলেও জীবন ট্র্যাজেডির গভীরতা কোথাও কম হয়ে যায় নি। ইশারা দিয়ে যে সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়ে গেল, তাকে সিতিকণ্ঠ বাবু কোনদিন খুঁজে পাবেন না, অথচ 'হিমালয়ে না সাগর পারে, জেলে না পাগলা গারদে', যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, তৃষ্ণা তাঁর চিত্তে জেগে থাকবেই এবং খোঁজার প্রচেষ্টাও শেষ হবে না।

ক্ষুব্ধ মনে সমস্ত জীবন ধরে এই বৃথা অন্বেষণের কাহিনীই 'সহযাত্রী' গল্পটির মূল সুর।

প্রমথ চৌধুরী বলিষ্ঠ প্রাণধর্মের উপাসক ছিলেন। আর সেই জন্য তিনি সংরক্ষণশীল মনোভাবকে কোনদিন সমর্থন করতে পারেন নি। বাঙালীর নিস্তেজ প্রাণধর্মকে নিন্দিত করে তিনি লিখেছিলেন: "আমরা *** দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশান বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণ স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই।"[২৫] ফলে যে বলিষ্ঠ প্রাণধর্মের অভাবে বাঙালী জাতি মুমূর্ষু, সেখানে তিনি vital force সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর ছোটগল্পের পাত্র-পাত্রী কেউ জটিল মানসিকতার স্বীকার হয় নি; বরং দেহ-কামনামুখর ঈর্ষা-ঘৃণা-লোভ-অন্ধ বিশ্বাস সমন্বিত জৈবলীলাই সমধিক প্রস্ফুটিত করেছে। 'ঝাঁপান খেলা', 'আহুতি', 'যক্ষ', 'পূজার বলি', 'অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' প্রভৃতি গল্পকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। রূপের ক্ষুধার সঙ্গে দেহের ক্ষুধার সংমিশ্রণ এই গল্পগুলিতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আমরা প্রমথ চৌধুরীর 'রূপলোক'-এর যে কিঞ্চিৎ পরিচয় উদ্ধার করেছি, তাতে জেনেছি যে তিনি ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রবাদী (sensual) না হয়ে ইন্দ্রিয়বাদী (sensuous) হবার সাধনা করেছেন। তিনি আপন রূপরসিক চিত্তের অনুভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর গল্পগুলিতে। "আমি চিরকালই রূপ ও শক্তির বিশেষ ভক্ত।"[২৬]—এই ছিল তাঁর সাধনা এবং সিদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে তিনি আর্টকে গ্রহণ করার পক্ষে বলেছিলেন: "মুক্তির দুটি মাত্র উপায় আছে—এক আর্ট আর এক ধর্ম। কারণ এ দুটি বস্তুই মৃত্যুকে অতিক্রম করে; এবং মর্তকেও অমৃতলোকে পরিণত করে। *** আর্ট হচ্ছে সেই বস্তু যা প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন রূপ প্রকাশ করে।"[২৭] বিশেষভাবে 'চার-ইয়ারী কথা' ও 'নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা' গল্পে তাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন রূপরসিক মনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে; এবং তাঁর এই রূপচেতনা নারী, পুরুষ ও প্রকৃতি বর্ণনাতে সঞ্চারিত হয়েছে। 'চার-ইয়ারী কথা' গল্পে সেন, সোমনাথ ও সীতেশের উক্তিতে নারীর সৌন্দর্য ও মোহসঞ্চারী শক্তির যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণনা আছে, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। প্রমথ চৌধুরী যেন রূপসাগরে ডুব দিয়ে চিরদিনই চিন্তা ও কল্পনার রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়েছেন। নারীর পরমারূপ প্রকৃতির প্রতি তাঁর চিরন্তন আকর্ষণের কথা বর্ণনা করে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন: "আমি কৈশোর উত্তীর্ণ

না হতে হতেই টের পেয়েছিলুম যে জীবনে কোন্ কোন্ জিনিস আমাকে অধিকার করে নেবে—beauty, mind এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না যে আমার মনোজগতের কেন্দ্র হবে—The Eternal Feminine।”[২৮] সৌন্দর্য, মন ও মনোলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নারী—এই তিনের সংমিশ্রণে তাঁর শিল্পীচেতনা গড়ে উঠেছিল। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, “আমরা যাকে উঁচুদরের কাব্য বলি তার ভিতরকার কথা হচ্ছে নারী। নারী বাদ দিয়ে ট্রাজেডিও হয় না, কমেডিও হয় না।”[২৯] ফলে তাঁর কাব্যে যে প্রণয়াসক্তি নেই, তা ঠিক নয়। তবে তিনি যে গল্পগুলিকে সবসময়ে tragedy থেকে 'tragi-comedy'-তে পরিণত করেছেন, তার কারণ গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যে convention-এর অন্ধ অনুকরণ এবং অনুসরণ দুই-ই পাঠকের মনকে একঘেয়েমির বিষাদবোধে সেঁৎসেতে করে দেয়, ব্যক্তিত্বের প্রাণ-স্রোত গতানুগতিকতার রুদ্ধ তোয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—তাকেই প্রমথ চৌধুরী আক্রমণের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রোম্যান্টিক প্রেম-কাহিনীর উপর তাঁর স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল। 'ফরমায়েসি গল্পে' ঘোষালের মুখে দুর্গেশনন্দিনীর মত বিখ্যাত রোম্যান্স উপন্যাসের প্রতি যে কটাক্ষপাত, তা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের হৃদয়সর্বস্ব আবেগমুখর রোম্যান্স পাঠকদের উপর নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ-সায়ক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কৃত্রিম আবেগমুখর স্বাদ-বৈচিত্র্য বিমুক্ত দায়-দায়িত্বলেশহীন ভাবালু কুহেলিকাকে তিনি সাহিত্যের একমাত্র বিষয় বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই বিষয়ে তাঁর সংস্কারমুক্ত চেতনা ও বুদ্ধিবাদী মন সদা জাগ্রত ছিল। তবে তিনি কোনদিনই প্রকৃত প্রেমকে সাহিত্যের অন্তরায় বলে মনে করেন নি, অবজ্ঞা করেন নি আন্তরিক ভালবাসাকে।* নিসর্গ রূপের বর্ণনা, জীবন মধুরিমার প্রতি স্বপ্নাবেগ ভরা উৎকণ্ঠা, 'চারইয়ারী কথা' গল্পে রোম্যান্টিক কল্পনার পক্ষে একটি প্রকৃত মনোরম পরিবেশ রচনা করেছে। গল্পগুলির অভিব্যক্তিতে শুধু ভাষার চারুশিল্পত্ব নেই, বক্তব্যের সুরভিত আবেশের সঙ্গে করুণ বেহাগের সুর-মূর্ছনা এক বিষাদঘন বিধুরিমায় ভরিয়ে তুলেছে। আশার সঙ্গে আশাভঙ্গের এমন করুণ রূপ বোধহয় বাংলা সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ বললে ভুল হয় না। এ প্রসঙ্গে 'চারইয়ারী কথা' গল্পের সেন চরিত্রের উক্তি উদ্ধৃতি হিসাবে নিতে পারি ঃ “আমার মনে হল যে, আমি আজ রাত্তিরে কোনো মিরাণ্ডা কি ডেস্ডিমনা, বিয়াট্রিস কি টেসার দেখা পাব—এবং তার

---

* “যে ভালবাসার মূল হচ্ছে অন্তরে, বাইরের অবস্থায় নয়, সেই ভালবাসার মর্ম ও মর্যাদা আমি বুঝতে পারি।”

—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীকে লেখা পত্র।

দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

স্পর্শে আমি বেঁচে উঠব, জেগে উঠব, অমর হব। আমি কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, আমার সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত eternal feminine সশরীরে দূরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।" পরিশেষে, "এই আমার প্রথম ভালবাসা, আর এই আমার শেষ ভালবাসা। এর পরে ইউরোপে কত ফুলের মতো কোমল, কত তারার মতো উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি—ক্ষণিকের জন্যও আকৃষ্ট হয়েছি, কিন্তু যে মুহূর্তে আমার মন নরম হবার উপক্রম হয়েছে সেই মুহূর্তে ঐ অট্টহাসি আমার কানে বেজেছে, অমনি আমার মন পাথর হয়ে গেছে। আমি সেই দিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal feminine কে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।" উপহাসছলে 'সেন' ভাববিহ্বলতা ও মনের ভাবাতিরেক সংহত করলেও জীবনযন্ত্রণার অশ্রুজলকে গোপন করতে পারেন নি। রোম্যান্সের প্রতি বিরূপতা প্রকাশিত হলেও, আপাতঃ কৌতুকের মধ্যে বক্তার তীর্যক হাসি অশ্রুজল হয়ে উঠতে বাধা পায় নি। শুধুমাত্র 'সেন' নয়, 'সীতেশ', 'সোমনাথ' এবং 'আমার' কথার মধ্যে উত্তম পুরুষের যে উক্তি, সমস্ত কিছুতেই সেই চিরন্তন চিরাকাঙ্ক্ষিত নারীসত্তার অন্বেষণের ইতিহাস এবং সঙ্গে সঙ্গে আশাহীনতার মধ্যে মুখের হাসি দিয়ে মনের দুঃখ গোপনের চেষ্টা, যা নিঃসংশয়ে মর্মস্পর্শী। এই গল্পের তৃতীয় বক্তা সোমনাথ বলেছেন: "স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসার পুরো অর্থ মানুষের দেহের ভিতরও পাওয়া যায় না, মনের ভিতরও পাওয়া যায় না। কেননা ওর মূলে যা আছে তা হচ্ছে একটি বিরাট রহস্য—ও পদের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাংলা অর্থেও বটে—অর্থাৎ ভালবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke." চারটি গল্পের শেষাংশে যে চমক আছে এবং যার মধ্য দিয়ে লেখকের প্রেম সম্পর্কে joke বা পরিহাস প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জীবনের এক গভীর তাৎপর্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। জীবনের serious বিষয়গুলি নিয়ে আপাতঃ পরিহাসের চেষ্টা থাকলেও লেখক জীবনের তাৎপর্যই অনুসন্ধান করেছেন।* নর-নারীর প্রকৃত প্রেমের রহস্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয় বলেই প্রতিটি নারীর চরিত্র ও আচরণ এক প্রহেলিকাপূর্ণ ও জটিলতায় ভরা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। গল্পগুলির উপসংহারে নায়কদের

'নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে

লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল।'—এই paradoxical

---

* "সেন কবিতায় যা পড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা পেয়েছিলেন তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। আর সোমনাথ মানবজীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। *** কিন্তু তোমরা, যে ভালবাসা আসলে হাস্যরসের জিনিস, তার ভিতর দু-চার ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে তাকে করুণ রসে পরিণত করতে গিয়ে ও বস্তুকে এমনি ঘুলিয়ে দিয়েছ

উক্তির মধ্যে আমরা কখন যেন মানবিকতার হৃদয়দ্বারে পৌঁছে যাই। 'চার-ইয়ারী কথা'তে প্রমথ চৌধুরী প্রেম ও যৌবনের যে স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন, তার অসামান্যতা সম্পর্কে বলা যায়: "ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া। কিন্তু ওর যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগ মণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা চারইয়ারী লেখা যায় না, কেন না ইচ্ছে করলে আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার তরুণের চোখে তরুণীকে দেখা যায় না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের swan song গাওয়া হয়েছে ওতে।"[৩০] আধুনিকতার চেতনা বিস্তারে প্রমথ চৌধুরীর সবচেয়ে বড় দান ছিল গতানুগতিকতা থেকে সাহিত্যের মুক্তি। তাঁর রোম্যান্সবিমুখতার পরিচয় ও প্রকৃতি আমরা ইতোমধ্যে বুঝতে চেষ্টা করেছি। মানুষের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে তাঁর বিস্ময় ও কৌতুকে paradox নিত্য নির্গত হলেও তা নিছক রঙ্গ-রসিকতা ছিল না, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিদগ্ধ স্মিত হাস্যের চাপে তা যেন ঝকঝকে তীক্ষ্ন পালিশ করা স্বর্ণ শয্যায় শায়িত হীরকখণ্ডের মতো রূঢ় দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করত। তবে সে কাঠিন্যের অন্তরালে থাকত গভীর অশ্রু জল। এই বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়েই শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন: "বিদ্রূপ ব্যঙ্গের খোঁচায় কোনো একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস করে তুলতে আপনি ভারি পারেন। কিন্তু আমি দেখি মানুষকে মানুষ করে দেখবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি। এক-একটা চাপা লোক যেমন তার বড়ো দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে, হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারো দুঃখটা গল্প করে বলে যাচ্ছে, এর সঙ্গে তার নিজের যেন কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেমনি করে।"[৩১]

প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই স্বরূপ বিচার প্রকৃতই যথার্থ। ব্যঙ্গ-কটাক্ষের অন্তরালে জীবনকে দেখবার ও সহানুভূতিতে সম্পৃক্ত হবার যে অনুভাবনা তাঁর সদা জাগ্রত ছিল, তাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। ফলে তাঁর ছোট গল্পগুলিতে বৌদ্ধিক চেতনা অতিক্রম করে সহানুভূতির সংবেদন রস প্রবাহিত

যে সমাজের চোখে তা কলুষিত ঠেকতে পারে। কেননা সমাজের চোখ, মানুষের মনকে হয় সূর্যের আলোয় নয় চাঁদের আলোয় দেখে। তোমরা আজ নিজের মনের চেহারা যে আলোয় দেখেছ, সে হচ্ছে আজকের রাত্তিরের ঐ দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো।"

—চারইয়ারী কথা (আমার কথা) ।

হয়েছে ; আর এইখানেই স্বরাট্ মহিমায় প্রমথ চৌধুরী আপন বৈশিষ্ট্যে ও ভাস্বরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 'ট্রাজেডির সূত্রপাত', 'সহযাত্রী', 'ছোটগল্প' 'একটি সাদা গল্প' ইত্যাদিতে লেখকের পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে জীবনান্বেষণের পরিচয় দেখতে পাই। একটি গল্পের সাহায্যে আমরা প্রমথ চৌধুরীর জীবনজিজ্ঞাসার স্বরূপটি বুঝে নিতে চেষ্টা করব। তিনি জীবনের pathos-এর গভীরতাকে wit-এর তীব্র আলোকে ভাসিয়ে দিতে পারেন নি—নিষ্করুণ tragedy-কে উপহাসের tragi-comedy-তে পরিণত করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন। 'একটি সাদা গল্পে' পরিহাস-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের একান্ত ভক্ত প্রমথ চৌধুরী জীবনের সহজ আবেগ বিহ্বলতাকে ছারখার করলেও পরিশেষে জীবন চেতনার দ্যোতনায় আপন চিত্তের গোপন অশ্রুজল রোধ করতে পারেন নি। গভীর সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস করুণ কাহিনী বর্ণনার মধ্যে অশ্রুজলে নিষিক্ত হয়ে অজান্তে কপোলদেশ বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে—অথচ সর্বত্রই স্থির দৃঢ়তা ; জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে মরণের কোলে জীবনের মাহাত্ম্য প্রচার একটি নিষ্করুণ উক্তির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর এই ক্রন্দন— প্রকৃত শিল্পীর আর্তি ; তাই এই গল্প এত দুর্বিষহ। "এরপর একমাস না যেতেই শ্যামলালের মেয়ের বিয়ে হল।·· মনে হ'ল সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়—শ্বেত পাথরে খোদা দেবী মূর্তি ; তার সকল অঙ্গ দেবতার মতোই সুঠাম, দেবতার মতোই নিশ্চল, আর তার মুখ দেবতার মতোই প্রশান্ত আর নির্বিকার।...বর কনেতে যে মন্ত্র পড়ছিল, তা প্রথমে আমার কানে ঢোকেনি, তারপর হঠাৎ কানে এল ক্ষেত্রপতি বলছেন, 'যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। একথা শোনা মাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম, এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে তা comedy কি tragedy বুঝতে পারলুম না।" অসম বিবাহের এই রকম ট্র্যাজিক ছবি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ বল্লেই হয়। এ যেন মরণের যূপকাষ্ঠে প্রাণের আত্মনিবেদন ; জীবনের মহিমা এখানে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত। উত্তম পুরুষের উক্তিতে লেখক যেন নিজের হৃদপিণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন হাতে তার স্পন্দন বন্ধ করে দিতে ব্রতী হয়েছেন। মৃত্যুর করাল গ্রাসে জীবনের এই বিলুপ্তি যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির বিষাদঘন গভীরতায় স্তব্ধ। লেখকের পরিহাসপ্রিয়তা এই বিষাদ চেতনাকে আরও করুণ করে তুলেছে শেষের কয়েকটি পংক্তির ভিতরে।

প্রমথ চৌধুরী নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত মানব জীবনের রোজনামচা নিয়ে কাহিনী রচনাতে সচরাচর অভিলাষী ছিলেন না। তিনি তাঁর 'গল্প লেখা' ছোটগল্পে বলেছেন, "যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা

নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।" ফলে তাঁর গল্পের অধিকাংশ পটভূমিতে মধ্যযুগোচিত সামন্ততান্ত্রিক জীবনের বর্ণাঢ্য পট, প্রেম-প্রতিহিংসার আদিম প্রাণলীলা, দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের 'নাগরীর হাট', সুদূর প্রতীচ্য দেশের প্রেক্ষাপটে প্রেম ও কামনার বিচিত্র লীলা-কাহিনী নিত্য পাণ্ডুর একঘেয়ে ঘটনার পরিবর্তে স্থান লাভ করেছে। কারণ আর্টের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী সর্বদা রূপ ও বৈচিত্র্যের পিয়াসী ছিলেন। তবুও সাধারণ ঘটনা ও সাধারণ মানুষের বর্ণহীন জীবনের কথাকে তিনি গ্রহণ না করে পারেন নি। সাধারণ মানুষকে সাহিত্যের পদবাচ্য এবং মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করা আধুনিক সাহিত্যে একটি বিশেষ কামনা ও প্রয়াস হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছিল সমকালের বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যে। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন: "যে ঘটনা নিত্য ঘটে এবং বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, হঠাৎ এক-এক দিন তা যেন অপূর্ব অদ্ভুত বলে মনে হয়; কিন্তু কেন যে হয়, তাও আমরা বুঝতে পারি নে।" তাঁর 'একটি সাদা গল্পে'র এই উক্তি মামুলী জীবনের করুণ কথাচিত্র। সাধারণ ঘটনার মধ্যে অসাধারণত্ব যে প্রকাশ পায়, তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন সহৃদয় চিত্তে। কেবল সমাজের জীর্ণ নীতি ও সংস্কারের খড়্গাঘাতে জীবনকে ছিন্নমূল হতে দেখে তিনি ক্লিষ্ট হন নি, অর্থনৈতিক দুর্দশা যে মানুষের জীবনকে ভগ্ন-শ্রান্ত ও শুষ্ক করে তুলেছিল, তাও তিনি দরদী হিয়া দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর 'আহুতি' গল্পে আমরা এর নিদর্শন পাই।"...বেহারাদের চেহারা দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্মসার মানুষ অন্য কোনো দেশে বোধহয় হাসপাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরি হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাত-পায়ের মাংস সব দাঁড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। ..মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন শক্তিহীন হতে পারে তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম; এ রকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে।...আমরা ধনী লোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকেদের কাঁধে চড়েই তো জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্প সংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে, থাকবে এবং থাকা উচিত—এই তো 'পলিটিক্যাল ইকনমির' শেষ কথা। Conscience-কে ঘুম পাড়াবার কত না মন্ত্রই আমরা শিখেছি।" ফলে 'যে আছে মাটির কাছাকাছি'—সেই শ্রেণী সম্বন্ধেও প্রমথ চৌধুরীর দরদী মনের পরিচয় পাই—তাঁর feudal-বাদী জীবনযাত্রা তাঁকে বুর্জোয়া চিন্তার অধিকারী করে নি—সাম্য-মৈত্রী ও মানবিকতার বেদীতেই তিনি নিজের জীবনচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে, বোধ হয় তাঁর কৌতুক-

প্রিয়তা এত প্রাণময়ী এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এত সুতীক্ষ্ন। তাই তিনি সবচেয়ে প্রগতিবাদী আধুনিক। সমকালীন বাস্তবতাকে তিনি যে অস্বীকার করেন নি, তার আর এক পরিচয় লিপি—তাঁর 'রাম ও শ্যাম' গল্পটি। এই গল্পটি wit-এর স্পর্শে সঞ্জীবিত ও সুমার্জিত। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে একশ্রেণীর বাক্ সর্বস্ব স্বার্থান্বেষী মানুষের চিন্তা ও আচরণ দুই ভাই 'রাম' ও 'শ্যামে'র মধ্যে ধরা পড়েছে। সাধারণ বাঙালী উত্তেজনার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়ে, পরিশেষে কি ভাবে লাঞ্ছিত ও হতোদ্যম হয়েছিলেন এবং অপরদিকে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা রাজনৈতিক আন্দোলনের নাম করে মুনাফা তুলেছিলেন—তারই পরিহাসময় অথচ আত্মজাগরণী চিন্তায় সমৃদ্ধ এই গল্পটি। প্রমথ চৌধুরীর এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ "তোমার···গল্পটি সুতীক্ষ্ম – ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এ রকম ক্ষুরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই।"[৩২] 'ভাববার কথা' গল্পেও প্রমথ চৌধুরী অনুরূপ মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন। তৎকালে এক শ্রেণীর হৃদয়াবেগসর্বস্ব নব্য বঙ্গীয় যুবকদের মধ্যে যে কৃত্রিম ভাবালুতা সর্ববিধ অস্বীকার ও বর্জনের পথে ধাবিত হয়ে প্রতীচ্য অনুকরণের মধ্যে দেশবাসীর সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি উদ্ধারের প্রচেষ্টাতে সীমায়িত হয়েছিল, তাকে তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উপহাস্যে বাণবিদ্ধ করে বলেছেন, ঃ "আজকালকার ছেলেরা কি·চৌকোস, আর তাদের কি wide culture! এরা প্রতিজনে একাধারে খেলায় ইংরেজ, পড়ায় জার্মান, বুদ্ধিতে ফরাসী, প্রেমে ইতালিয়ান, পলিটিক্সে রাশিয়ান। ইংরেজরা আমাদের স্বরাজ দিলে তা নেবে কে— ।"

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমে এবং গল্প লেখার ভিতরে যে সাধনা করেছিলেন —তা হচ্ছে মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের সাধনা। তাঁর 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণের বীজরূপ এটাই। মানবতার বৃহৎ পশ্চাদ্‌পটে তিনি total man·কে আবিষ্কার করতে চান। আর এরই জন্য তিনি কোনদিন সহজ sentiment-এর ধার ধারেন নি। তিনি অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই মানুষের মন জিনিসটিকে একটি মাত্র মৌল পদার্থ বলে ভাবেন নি। মনের চুল চিরতে আগ্রহী হলেও, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মানুষের মন হচ্ছে বহুর সমষ্টি—আর মনের ঐক্য মানে তার গড়নের ঐক্য। মনের ভিতরকার সব রেখা মিলে একটা ধরবার ও ছোঁবার মতো আকার করে নেয়। তাঁর সকল হাস্য-রসিকতার মূলে এরূপ কাঠামো নির্মাণের প্রয়াস আছে—যা সমস্ত গল্পের আকৃতি রচনা করেছে। 'নীললোহিত' গল্পে নীললোহিতের যে বৈশিষ্ট্য তিনি এঁকেছেন, তা প্রকারান্তরে

তাঁর গল্পসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের প্রতিরূপ বলা যেতে পারো। 'নীললোহিতে'র epigram, wit এবং paradox-এর স্পর্শে সমুজ্জ্বল যে কাহিনী তা আপাতঃ দৃষ্টিতে কল্পলোকের সামগ্রী হলেও 'কল্পলোকের সত্য' কথা ছিল না, ছিল মর্ত্য লোকের বস্তু। 'নীললোহিতে'র গল্পগুলিতে romanticism-এর স্পর্শ আছে ; কারণ প্রমথ চৌধুরী জানতেন যখন লোকে "একটা রোমান্টিক গল্প গড়ে তোলে, তখন অসংখ্য লোক তা পড়ে মুগ্ধ হয়—কারণ বেশির ভাগ লোকের গায়ে romanticism এর গন্ধ নেই। মানুষের জীবনে যা নেই, কল্পনায় সে তাই পেতে চায়। আর তার সেই ক্ষিধের খোরাক জোগায় রোমান্টিক সাহিত্য।"[৩৩] ফলে 'নীললোহিতে'র গল্প সেই না-পাওয়া অথচ চির আকাঙ্ক্ষিত চিত্তের অভিসার। "তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বলতেন, সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ সবই ছিল ঐ কল্পনা রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়।"[৩৪] নীললোহিত কল্পলোক থেকে গল্প বলতেন—তাই তাঁর তুল্য মিথ্যাবাদী কেউ ছিল না—কিন্তু এই মিথ্যা ভাষণ যে কখন কঠিন সত্য হয়ে বাস্তবের ঘটনাবলীর রূপ নিত, তা অনেকেই উপলব্ধি করতেন না। নীললোহিতের কল্পজগতে যে স্বপ্নপ্রয়াণ আছে, তা প্রকৃতপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর গল্পলেখার একটি বিশেষ ভঙ্গিমা বা technique. Epigram, wit ও paradox-এর সংমিশ্রণে গল্পগুলি জাতির ক্ষতে যেন অস্ত্রোপচার করেছে। তবে একথা আমাদের সর্বদা স্বীকার করতে হবে যে তাঁর নাগরিক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মন সর্বদা সব শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করে ফিরেছে। মানুষের জীবনের নানা অসংগতিকে তিনি রূঢ় আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চাইলেও, তিনি মাটির জগৎ ও মাটির মানুষকেই ভালবেসেছেন। আধিভৌতিক জগৎ ও জীবন পরিত্যাগ করে তিনি কোনদিন অতীন্দ্রিয় জগতে পাড়ি দেন নি। তিনি তাঁর অপরিমেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৌদ্ধিক চেতনা দিয়ে মানুষের প্রকৃত মঙ্গলকে জীবনের বেদীমূলে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সর্বদাই একটি সহনশীল মনোভাব ছিল। নতুন চিন্তা ও আদর্শবাদকে তিনি যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে না পারলেও একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা সর্বদা করতেন। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে 'মডার্ণ'। "আমি অতীতেরও ধার ধারিনে, ভবিষ্যতেরও তোয়াক্কা রাখি নে। মনোজগতে দিন আনি, দিন খাই—অর্থাৎ যা পাই পেটে পুরি"[৩৫]—এই ছিল তাঁর প্রগতিশীল সাহিত্য চিন্তার রূপ ও রীতি। এরই জন্য পরবর্তীকালে যখন 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' গোষ্ঠীর লেখকেরা আধুনিকতার নামে অতীতের সমস্ত আনুগত্য ত্যাগ করতে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সংরক্ষণশীল দল তথা 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠীর সঙ্গে

তাঁদের বিরোধ বাধে—তখন সেই নবীনদের চিন্তাদর্শে তাঁর কোন বিরোধ বাধেনি।[৩৬] উপরন্তু এই নতুন সাহিত্য তুর্কীরা অনেকাংশে তাঁর ভাবাদর্শের অনুগামী হয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর রচনার মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মননশীলতা, রূপতৃষ্ণা, খোলা মন নিয়ে জীবনকে দেখবার চেষ্টা, কোন বিষয়ে puritan মনোভাবকে প্রাধান্য না দেওয়া এবং সর্বোপরি নারীর দেহতলীতে রূপ ও সুধার অন্বেষণ নবীন লেখকদের প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। তবে প্রমথ চৌধুরী যৌবনের পূজারী ও বলিষ্ঠ প্রাণধর্মের অনুরাগী হয়েও কোনদিন ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন নি। সংযম ও সুনীতি রক্ষাই ছিল তাঁর আর্ট চিন্তার মৌল ধর্ম। 'রবিচক্রে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি স্বকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন অপরিমিত মানসিক বলের তীব্র ক্ষমতায়। রবীন্দ্র ভাব ও চেতনাকে অতিক্রম করার নিবিড় প্রয়াস তাঁর ছিল এবং প্রাণধর্ম ও যৌবন বন্দনার উদ্দেশ্যও ছিল এই অনুভাবনার ভিত্তিমূলে। তিনি কোনদিন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চান নি—যা পরবর্তীকালের নবীন গোষ্ঠীর সাহিত্য চিন্তার প্রাকৃত ধর্ম হয়ে উঠেছিল। তবে তিনি রবীন্দ্রানুরাগী কবিদের অক্ষম অনুকরণ স্পৃহা ও প্রচেষ্টাতে গভীরভাবে আহত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যর্থ ও দুর্বল পুচ্ছগ্রাহিতা তাঁকে 'রোম্যান্টিক' বিদ্বেষী করে তুলেছিল। রবীন্দ্রানুসারীরা কবিগুরুর বাহ্য আবেগকে অনুকরণ করলেও তাঁর কাব্যে প্রকাশমান ভাব-সৌন্দর্যের অন্তরালে যে নিবিড় অনুভূতি ও চিন্তা অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞায় আত্মস্থ হয়ে আছে, তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য চিন্তায় স্বতন্ত্র পথ গ্রহণের প্রকৃত ইতিহাস হল এটাই—অবশ্য তাঁর সাহিত্যমানসও ছিল ভিন্ন পথের অভিযাত্রী, যা আমরা পূর্বেই বুঝতে চেষ্টা করেছি স্বল্প কথাতে। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাদর্শ এবং বাংলা সাহিত্যকে ব্যক্তিত্ব স্পৃষ্ট করার নিত্য নতুন অভীপ্সা ছিল বলেই 'কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি' গোষ্ঠীর উদ্দাম তরুণেরা তাঁর কাছে সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়েছিল। বিদ্রোহী তরুণেরা যে সাহিত্যচিন্তাতে রবীন্দ্রবিরোধিতার সঙ্গে অন্যান্য রীতি-নীতিকে অস্বীকার করার আওয়াজকে উচ্চগ্রামে তুলেছিলেন, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে নব মত ও পথকে সাহিত্যে প্রবর্তিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, তাতে 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর সমর্থন ছিল—প্রত্যক্ষ না হলেও অন্ততঃ পরোক্ষে। নবীনদের সাহিত্য রচনার পথ নির্দেশ দিতে তিনি বলেছিলেন : "প্রবাহই হচ্ছে পবিত্রতা—স্রোত মানেই শক্তি। গোড়ায় আবিলতা তো থাকবেই, স্রোত যদি থাকে তবে নিশ্চয়ই একদিন খুঁজে পাবে নিজের গভীরতাকে।... এমনভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ

তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা,তুমি অভিনব।.. তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার। সে তোমারই একলার পথ। যতই দল বাঁধো প্রত্যেকে তোমরা একা।...যদি সর্বক্ষণ মনে কর, সামনে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন, তবে নিজের কথা আর বলবে কি করে? তবে তো শুধু রবীন্দ্রনাথেরই ছায়ানুসরণ করবে। তুমি ভাববে তোমার পথ মুক্ত, মন মুক্ত, তোমার লেখনী তোমার নিজের আজ্ঞাবহ।"[৩৭]

প্রমথ চৌধুরীর নির্দেশকে পরবর্তী তরুণ সাহিত্যিকেরা উদ্দামতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রবিরোধিতা তীব্র আকারে তাঁদের সাহিত্যে প্রধান উপচার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই বিরোধিতা তাঁদের আন্তরিকতার ছোঁয়া পায় নি। রবীন্দ্রবিরূপতার নামে তাঁরা কতকগুলি ভাবের অবাধ কণ্ডূয়ন করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রদত্ত সাহস তাঁদের যে পরিমাণ দুঃসাহসী করেছিল, সেই পরিমাণে নতুন সত্যের আবিষ্কারক করতে পারে নি। সাহিত্য বিচিন্তাতে গভীর সংযম ও সীমার ভিতরে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে নবগোষ্ঠীর লেখকেরা কেবলমাত্র ভাবালুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদের উগ্র সাহসে শুধু রোম্যান্টিকতার মোহ মাখানো ছিল—ছিল না ভাব-চিন্তাকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার গভীর অনুভূতি। এরই ফলে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাবাতিরেকের স্ফীতি ঘটেছে অত্যন্ত উত্তাল ভঙ্গীতে। প্রমথ চৌধুরী কোনদিন 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' গোষ্ঠির মতো যৌনচেতনার অসংযত আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেন নি। আমরা বারবার দেখেছি যে তিনি নাগরিক সাহিত্যিক ও বিংশ শতাব্দীর বাংলায় নাগরিকতার ভাষ্যকার হলেও কোনদিনই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রবাদী হন নি—আর এরই ফলে তাঁর সাহিত্যে জীবনের রূপবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য উপভোগের প্রয়াস চলেছে শান্ত ও সংযত গতিতে। প্রমথ চৌধুরীর রূপচেতনায় যে objective দৃষ্টিভঙ্গী, যা সৌন্দর্যবোধ ও দেহলীন কামনাতে ঋদ্ধ হয়ে পরিমিতির শাসন পরিমণ্ডলে সংযত ছিল, নবীন লেখকেরা তা আয়ত্ত করতে পারেন নি। কেবলমাত্র বাহ্য সৌন্দর্য বিচার, রূপ মুগ্ধতা ও দেহদ্যুতির লাবণ্য বর্ণনা এবং সম্ভোগ চরিতার্থতাকে তাঁরা একমাত্র সত্য বলে মনে করেছিলেন। পুরুষের মনের eternal feminine-এর জন্য যে নিগূঢ় তৃষ্ণা ও আকর্ষণ সদা জাগ্রত থাকে, প্রমথ চৌধুরী অফুরাণ রূপযৌবন, অপরিমেয় প্রেম, দুর্নিবার প্রাণশক্তি ও ইন্দ্রিয়সচেতন প্রাণধর্মের মধ্যে যেমন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, নবীন সাহিত্যিকেরা সেই বোধ ও প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন না। তাঁরা সাহিত্যের শুচিবাই চিন্তা ও puritanism-কে ভাঙতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর realism-কে গ্রহণ

করতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে নবীন গোষ্ঠীর পার্থক্য এইখানেই। নবীনদের সঙ্গে যখন প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় ঘটে, তখন তিনি বয়সে প্রবীণ। প্রবীণ মনের গভীর চেতনাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা তরুণ গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে নবীনদের সমস্ত বিদ্রোহ ভাবালুতাকে আশ্রয় করেছিল। তাঁদের রূপচেতনা নারীর দেহলীন বাহ্য স্থূলতার মধ্যে সীমায়িত হয়ে সম্ভোগ পরিতৃপ্তির উগ্র কামনাতে নিঃশেষ হয়েছিল। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে রূপ এবং কামকে প্রত্যক্ষ করার কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না, উপরন্তু ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে অষ্টপ্রহর আচ্ছন্ন থেকে, দেহের দুর্দম্য প্রদাহকে ফেনিল রুধিরে উন্মত্ত করে প্রেমকে প্রকাশ করার চেষ্টাই তাঁদের প্রধান হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর ইন্দ্রিয়বাদিতার সত্য পরিচয় তাঁরা কোনদিনই উপলব্ধি করতে পারেন নি—বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই ভিতরের শাঁস-জল বলে গ্রহণ করেছিলেন। 'কামলোক', 'রূপলোক' ও 'ধ্যানলোক'—এই তিনের সমন্বয় সাধন করার কোন ক্ষমতা অথবা অনুভূতি নবীন লেখকদের ছিল না। প্রমথ চৌধুরী যেখানে 'রূপলোক' ও 'ধ্যানলোকে' আপন সাধন বলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেখানে তরুণ সাহিত্যিকেরা 'কামলোকে'র অধিবাসী হয়েই আনন্দে আত্মহারা হয়ে বন্ধনমুক্তির জয়গানে মুখরিত হয়েছেন। এর ফলে প্রমথ চৌধুরীর আধুনিক চিন্তা বহুদূরের বস্তু হিসাবেই অবস্থান করেছে, জাতির মর্মবেদী মূলে আশ্রয় হয় নি। তবুও তাঁর প্রচেষ্টাতে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিকতার নববীজ রোপিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যকে সর্ববিধ উপায়ে সংস্কার মুক্ত করে মননের দীপ্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অভিষিক্ত করে পরবর্তীকালের জন্য তিনি যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার উপরেই নবীন সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের সৌধ নির্মাণের চেষ্টা করেন। উত্তর কালের চিন্তাতে অনেক মৌলিক উপাদান ছিল সত্য, কিন্তু সাহস ভরে সর্ব বিষয়ে এগিয়ে যাবার প্রেরণা তাঁরা লাভ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা ॥

আধুনিক ভাবধারায় বাংলা কথা সাহিত্যে যে মানসপুষ্টি হয়েছিল তার নান্দীকার ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল শিল্পী সত্তার নিদর্শন হিসাবে আমরা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দকে চিহ্নিত করতে পারি। 'সবুজপত্র' পর্বের কাব্য, নাটক এবং বিশেষভাবে ছোটগল্প ও কথাসাহিত্যে তাঁর আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। বয়সের ধর্ম কবির দেহকে স্থবির করলেও মনকে কখনও পঙ্গু করতে পারেনি। সংস্কারমুক্ত মনের সজীবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশা ও বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর জীবনগোধূলি কালের রচনাগুলিকে বিশেষ-ভাবে দীপ্যমান করে তুলেছে।

সাহিত্য সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক। তাঁর বিস্ময়কর প্রাণ-ধর্মের জোয়ার সাহিত্য চিন্তাতে বিপুল বৈচিত্র্যের পরিচয় ও অনুসন্ধানের তরঙ্গ তুলেছে। ঔপনিষদিক চেতনা ও ঐতিহ্য তাঁর মনকে বিশেষভাবে শাশ্বত সত্য ও কল্যাণবোধে নিষিক্ত করলেও তিনি জীবনের বিস্ময়াবহ বহুচারী আন্তর গূঢ়তায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং কালান্তরের পটে মানুষের অনুভূতির রূপ যে পরিবর্তিত হয়, মানব ধর্ম জটিল রূপ গ্রহণ করে, বিভিন্ন প্রতিকূল ঘটনার সংঘাতে ও সংঘর্ষে চলমান জীবনের স্থায়ী বিশ্বাস কেঁপে উঠে এবং জীবন সংকটের ঘূর্ণাবর্তে যে প্রতিচ্ছবি বিলসিত হয়—তাও যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন ও নিজে তাকে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নি। প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে তাঁর মনের যে সহজ ও সাবলীল ঐক্য—অপরিমেয় আশাবাদ ও মানবতাবাদে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের এই-খানেই আধুনিকতার প্রকৃত পরিচয়। নিজের কালকে তিনি কোথাও আঁকড়ে ধরে থাকেন নি, বরং যুগের গতিবেগের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে বিশালতার মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ লেখা পর্যন্ত ছিলেন আধুনিক। তাঁর আধুনিকতার মূলতত্ত্ব ছিল—'চরৈবেতি'; অর্থাৎ সমস্ত রকম স্তব্ধতা, সংকট এবং স্থবিরতা থেকে জীবনকে মুক্তি দেওয়া। মানুষের জীবন যেখানে মর্যাদাহীন হয়েছে অথবা কোন গতিহীনতার রুদ্ধ তোয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, সেখানে তিনি আহত হয়েছেন এবং তাঁর কবিকল্পনা উদার সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মননদীপ্তিতে বিলসিত হয়ে বাঁধ ভেঙ্গে দেবার যৌবনগীতিতে মুখরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের

জীবন পর্বে মানস সংকটের কাল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও 'সবুজপত্রে'র অভ্যুদয় পর্ব। ফলে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ রবীন্দ্র জীবনের কালপর্বে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সময়সীমা। তাঁর মানস সংকটের গভীর ব্যথা সমকালীন চিঠিপত্র* ও প্রবন্ধে ধরা পড়েছে। বিশেষভাবে 'হিংসা নিঠুর স্পন্দনে' ভরা যুদ্ধকে তিনি মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিমানসের ব্যথা ও যন্ত্রণার প্রকাশ করে লিখেছিলেন : "স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে…মরছে মানুষ বাঁচাও তাকে।…বিশ্ব পাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্ব পাপকে দূর করো।…বিনাশ থেকে রক্ষা করো।"[১] যুদ্ধ তখন প্রকাশ্যভাবে শুরু না হলেও এক গভীর উৎকণ্ঠা তাঁর মানস পরিমণ্ডলকে কিরূপে আচ্ছন্ন করেছিল, তার পরিচয় তিনি সমকালীন কবিতাতেও প্রকাশ করেছেন। 'বলাকা'র 'সর্বনেশে,' 'আহ্বান' ও 'শঙ্খ' কবিতায় মনের মধ্যে কিসের যেন উৎকণ্ঠা কী যেন অমঙ্গল ঘটবে বলে আশঙ্কা, এমন ভাব প্রতিফলিত হয়েছে।[২] বিশ্ব রণাঙ্গনে বারুদের বিষবাষ্প যখন মনুষ্যত্বের সমস্ত কিছু শুভ ও কল্যাণকর দিককে বিনষ্ট করে দিতে তৎপর, তখন রবীন্দ্রনাথ এই নিদারুণ মানসযন্ত্রণা থেকে উত্তরণের পথ আবিষ্কার করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। নতুন বৈভবে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আকস্মিক আবির্ভাবের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের

---

*(ক) বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা পত্র :

"I am struggling on my way through wilderness My feet is bleeding and I am toiling with panting breath Wearied I lie down upon the dust and cry and call upon his name. I know that I must pass through death. God knows it is the death pang that is tearing open my heart···the toll of suffering has to be paid in full." [Letters to a Friend, May 21, 1914.]

(খ) "দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ ;—অন্যদের সকলের সম্বন্ধেই নৈরাশ্য এবং অনাস্থা।···কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার idealকে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আবার নূতন জীবন নিয়ে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।"

—পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি : চিঠি পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড) ; পৃ. ২৮-২৯।

২৭শে মে থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। পাশ্চাত্যদেশ পর্যটন তাঁর চিত্তে এক তাৎপর্যময় অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিল। বিশেষভাবে ইংলণ্ডে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ ও প্রচার এবং খ্যাতির নেপথ্যে তিনি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এই তথ্য ছিল ইউরোপবাসীর 'সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্'-এর প্রতি একনিষ্ঠ ও প্রগাঢ় অনুরক্তি। কিন্তু এই বছরের নভেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী এক শ্রেণীর মানুষের নিষ্ঠুর সমালোচনা ও নিন্দা তাঁকে আহত করেছিল অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। তাঁর সুতীব্র অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত এই নিন্দাভাষে আপনার চারিদিকে আবরণ সৃষ্টি করে তারই মাঝে ব্যথা, দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছিল। সাহিত্য সাধনার নামে আত্মতৃপ্তির নিছক কণ্ডুয়ন, পুরানো জীর্ণ সংস্কারকে শাশ্বত ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠিত করার অত্যুগ্র আগ্রহ, 'বাঁধি বোলের বুলি'তে জীবনচর্যার দিনলিপি রচনা ও মিথ্যার বেসাতি এবং যা তৎকালে জীবন চেতনার প্রকৃত ধর্ম হয়ে উঠেছিল, তাকেই তিনি বর্জন করতে আগ্রহী ছিলেন। সকল গতানুগতিকতা, বুদ্ধিবিবর্জিত ও সংস্কার তমসাচ্ছাদিত জীবনকে তৃপ্তিভরে লালন করার বিরুদ্ধে এবং জীবনের জয়গানে বিবেচনা ও অবিবেচনার দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনী পরিচালনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'সবুজপত্রে' সমস্ত পুরাতনী চিন্তার বিরুদ্ধে যে 'শিকল ভাঙার গান' গেয়ে প্রাণকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে মুক্তি দানে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন, তার মৌলিক চিন্তার অভিষেক হয়েছে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে। আধুনিকতার বিচারে রবীন্দ্রনাথের মানসধর্ম অনুসন্ধানে তাঁর বক্তব্যটি উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। "প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক—বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, 'কাজ কি'! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ ও প্রবীণের ভয় জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোসো' রোসো', প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই যাক-না'।

…………এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদীয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে

আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবনাটিকে রূপায়িত করার জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করেছিলেন ; এবং 'সবুজপত্র' তাঁর সেই প্রতীক্ষা পূরণ করেছিল। কারণ, 'সবুজ-পত্রে'র সাধনা ছিল প্রাণজাগানো আর্টের সাধনা। "এই পত্রিকা, যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে'র পৃষ্ঠাতে আধুনিকতার যে বোধন শুরু করেছিলেন তার সংজ্ঞা ছিল, সাহিত্যরচনায় বস্তুভারের পরিবর্তে চরিত্রের মননশীলতার অন্তমুর্খিতা, চিন্তার ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্তির জয়গান, মিথ্যা ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, বুদ্ধিবাদের প্রতিষ্ঠা, দেহলীন কামনার বেদীতলে প্রেমের পূজারতি, নারী-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি এবং যৌবনের উল্লাসকে জীবনের কর্মে ও জ্ঞানে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "মিথ্যার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাপুবাছা সম্বোধন করে আর চলবে না। আমাদের বর্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই—বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ—কিন্তু যেখানে যথার্থই বীর্যের দরকার······সেখানে দেখতে পাই বড় বড় সব সাহিত্যিক পাণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়চে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্ছে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, আধুনিক সাহিত্য এবং শিল্পচিন্তাতে জীবন-সত্যের মৌল যোগে রূপান্তর দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবনের সকল স্তরে। আর এই পরিবর্তন যেমন দ্রুত তেমনি জটিল। সাহিত্য ও শিল্পে জীবনের পরিণতি কেবলমাত্র আর যোগফলে সূচিত নয়, সমগ্রের প্রতিটি অংশই অর্থের উদ্ভাসে উজ্জ্বল। আধুনিকতার তাৎপর্য এইখানে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাবলীতে আমরা অনুরূপ দর্শনচিন্তার পরিচয় পাই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার বোধন ঘটিয়েছিলেন 'সবুজপত্রে' নবরূপে ও নবপ্রাণে আত্মপ্রকাশের অনেক আগেই। 'চোখের বালি' (১৩০৮-১৩০৯।১৯০২) উপন্যাস ও 'নষ্টনীড়' (১৩০৮।১৯০২) ছোটগল্পে আধুনিকতার পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল। 'চোখের বালি' উপন্যাসের সূচনা অংশে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে realism বা বাস্তবতার নবরূপত্বের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন :

" ......'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিন-কার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ। ● ● ● বস্তুত, ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প-সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানাঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হতো, এখনো হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলাভাষায় আর প্রকাশ পায় নি। তার পরে ওই পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায় নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি, এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তার পরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলছে।

......অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তারপরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল।......সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও রবীন্দ্রচেতনায় আধুনিকতার স্বরূপ উপলব্ধিতে এই বক্তব্যটির গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, রবীন্দ্রমানস পরিক্রমা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আত্মবিশ্লেষণের পথেই পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। বিংশ শতকের সূচনাতেই তিনি বিশ্বের কথাসাহিত্যে পালাবদলের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলেন। এই সময়ে ইউ-রোপীয় প্রগতিবাদী সাহিত্যে তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সার্ত, ক্যামু, কাফ্কা প্রভৃতি জার্মান ও ফরাসী সাহিত্যে existentialism বা অস্তিত্ববাদের অব-তারণা করেছিলেন। ইতিপূর্বে expressionism বা প্রকাশবাদ ও impressionism বা বাস্তবরূপবাদ তত্ত্বের বহুল প্রচলন হয়েছিল ইংরেজী কথাসাহিত্যে। এইসব তত্ত্ব-বাদের প্রবক্তা ছিলেন, ডি-এইচ-লরেন্স, টি-এস-এলিঅট, এইচ-জি-ওয়েলস, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ্ প্রভৃতি সাহিত্যরথীবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথাসাহিত্যে

কোন তত্ত্ববাদের প্রকাশ্যভাবে অবতারণা না করলেও মনন ও বৌদ্ধিক চেতনার সাহায্যে জীবনের গূঢ় রহস্য বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন। হৃদয়ানুভূতি ও রোম্যান্সমুখর আবেগের ক্ষেত্রে এই যে সমাপ্তি ঘোষণা, তাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক চিন্তার অপর এক বৈশিষ্ট্য। তিনি এ সম্পর্কে নিজেই বলেছিলেন : "আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই।"[৬]

চিন্তাপ্রবণতা চরিত্র সৃষ্টিতে প্রাধান্য পাওয়ার জন্য আধুনিক সাহিত্যে জীবন-সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করেছে। মননশীলতার এই ঘূর্ণাবর্ত আধুনিক কালের চিন্তার অমোঘ নিদান। তাই বর্ত্তমান সাহিত্যে 'প্লট' সৃষ্টির পরিবর্তে চিন্তা-তত্ত্বের বিপুল প্রাধান্য ও বৈচিত্র্যময় বিকাশ। কথাসাহিত্যে কাহিনী অংশ ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়তে শুরু করল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : "চরিত্র সৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশি চড়াও হয়ে উঠেছে তার কারণ, আধুনিক কালে জীবনসমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত।"[৭] এরই ফলে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' পর্বে প্লটকে দিলেন বিদায় এবং চরিত্র ব্যাখ্যাতে আধুনিক জীবনের 'জটিল গ্রন্থি'র বন্ধনমুক্তির প্রয়াসের সঙ্গে বরণ করলেন নর-নারীর ব্যক্তি সম্পর্কের গূঢ় রহস্য এবং ব্যক্তিত্বের অন্তরালে চেতনাপ্রবাহের অভিসঞ্চারী ভাবকল্পনা ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তিতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা সমাজনিরপেক্ষ মনোভাব ও মতবাদের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কোন বিশেষ দেশ-কাল এবং সমাজসীমার মধ্যে তিনি চিন্তাবিশ্লেষণকে আবদ্ধ করেন নি। চরিত্রের ব্যক্তিমানস সবসময়েই পটভূমির সীমানাকে অতিক্রম করেছে। ফলে, তাঁর নায়ক-নায়িকারা 'সব পেয়েছির দেশে'র অধিবাসী, তাদের প্রকাশ সার্বভৌম। আধুনিক কথাসাহিত্যে সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিমনের যে পরিচিতি এবং মানস-বৈচিত্র্যের যে অনুলিপি দেখা যায়, তাতে রবীন্দ্রভাবনারই অনুবর্তন দেখতে পাই। তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বারেবারে। 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-'প্রগতি' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ের লেখকদের সাহিত্যমানস বিশ্লেষণে এ বিষয়ে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তবে, তাঁরা যে প্রধান সুরটি অবলম্বন করে সাহিত্য জগতে স্বকীয় মর্যাদার আসনটি কায়েম করেছিলেন ; সেই সমাজনিরপেক্ষ দায়হীন ব্যক্তিত্ববাদ 'নারীর অবন্ধন' রূপ ও মনোভাবনার বিকাশ এবং সর্বক্ষেত্রে মুক্তিচিন্তা, মনের গহনে inner reality-র অনুসন্ধান—যাবতীয় মনশ্চারণার পূর্বসূরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য এর সঙ্গে প্রমথ

চৌধুরীর বৌদ্ধিক চেতনা, মননশীলতার নিরাসক্ত মতবাদ এবং শরৎচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবনপিপাসা সংমিশ্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা চিরন্তনী মানবী। কোন পারিবারিক বা সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে তাদের তিনি বাঁধতে চান নি। আধুনিক কালে নারীর বিদ্রোহিণী ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে individuality বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে,' 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং 'স্ত্রীর পত্র,' 'বোষ্টমী', 'পয়লা নম্বর' এবং 'তিন-সঙ্গী' গল্পসমূহের মধ্যে তা প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। 'সবুজপত্র' যুগে পরিবারানুগ সমাজপ্রধান জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় দিলেও, রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসের মধ্যেই কালচেতনার বিবর্তন ও পরিবর্তনের আগমনী গেয়ে সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর প্রাচীন সংস্কারের পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে আশ্রয় লাভের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়াম্বিত চিত্ত-আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া গেলেও দাম্পত্য, পাতিব্রত্য, সমাজ ও ধর্মের পুরাতন নীতি এবং চারিত্রিক আদর্শ যে আধুনিক মানুষকে আর শাঁসে-জলে পুষ্টিদান করতে পারছে না, এ সত্য তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। "এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, যাকে বলা যায় মনস্তত্ত্বপ্রধান, অর্থাৎ যেখানে বাইরের দিক থেকে ঘটনা সাজাবার কৌশলটাই বড় কথা নয়, মানুষের মর্মকথা টেনে বের করা যার লক্ষ্য।"[৮] একদিকে অবদমিত অথবা সযত্নে নিয়ন্ত্রিত অবচেতন মনের চৈতন্যপ্রবাহের আবিষ্কার ও অন্যদিকে পুরাতন সামাজিক এবং পারিবারিক আদর্শের অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে প্রগতিশীল সচেতনতাকে আধুনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ বাহন বলে মনে করা, বাংলা কথাসাহিত্যে 'চোখের বালি'তেই প্রথম হয়েছিল। ফলে, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠায় 'চোখের বালি'-র মহেন্দ্র-বিনোদিনী, আশা-বিহারী প্রথম নান্দীকার গোষ্ঠী।

বিশেষভাবে, বিনোদিনীর হৃদয় রহস্য বিশ্লেষণ, সর্ব সংস্কারমুক্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার পথে আত্মোদ্ঘাটন এবং আত্মাবিষ্কারের যে প্রয়াস, তাতে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন যুগের ভিত্তি পত্তন হয়েছিল। 'চোখের বালি' উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনীর চরিত্রের বিচিত্র বিশ্লেষণ ছিল আধুনিকতার মনোভূমি। তার প্রলোভন, চাতুরী, আত্মনিবেদন ও ঈর্ষা সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য বিহারীকে জয় করা। ফলে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তার প্রতিপক্ষ ছিল বিহারী। কিন্তু প্রণয়ের উদ্দেশ্য আত্ম-আবিষ্কার। বিনোদিনী জীবনের ক্রমস্তর ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই গূঢ় তত্ত্বটি

উপলব্ধি করেছে। বিহারীর কাছে তার যে বিবশ আত্মসমর্পণ : "ওইটুকু দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালো-বাসিয়া একটুখানি মন্দ হও। *** মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও"—এতে জীবনপিপাসার উষ্ণ ও তপ্ত অনুভূতি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি প্রেমের অনির্বচনীয়তার উপলব্ধিও অপরিস্ফুট থাকে নি। নিন্দা-ঘৃণা-অবহেলার সমস্ত সরণী অতিক্রম করে সে আঘাতের মধ্যে প্রেমের পবিত্র স্বরূপটি জীবনে একান্ত বলে গ্রহণ করে বিহারীকে পরে বলেছে : "তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি—একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো, আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে।" বিহারীর পদস্পর্শে বিনোদিনীর চিত্ত-অহল্যারই মুক্তি ঘটেনি, সেও রূপান্তরিত হয়েছে আপন আত্মা-বিষ্কারের মধ্য দিয়ে। বিনোদিনীর বিবশ আত্মসমর্পণ বিহারী সজোরে প্রত্যাখ্যান করলেও তার চিত্তের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেছে প্রেম ও অনুরাগের বিশালতার মধ্যে। সেই রজনীতে বিহারী যেন নবজন্ম লাভ করেছে। তার আত্মবিশ্লেষণে একটি রূপান্তরিত মানুষের মনোলোকেব inner reality-র বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিহারীর সচেতন মন সংস্কারের প্রত্যক্ষতায় চুম্বনোদ্যতা বিনোদিনীকে অস্বীকার করলেও অবচেতন স্তরে একটি জীবনকামনা বারবার মধুপ গুঞ্জরণে চিত্তকে আমোদিত করেছে। মনোবিকলন তত্ত্বের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিহারীর চৈতন্যপ্রবাহের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করেছেন : "কিন্তু আজ নিজের সেই অন্তরবাসীকে বিহারী কোনো-মতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না। কাল বিনোদিনীকে বিহারী দেশে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহার পর হইতে সে যে-কোনো কাজে যে-কোনো লোকের সঙ্গেই আছে, তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয় তাহাকে নিজের নিগূঢ় নির্জনতার দিকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছে। *** বিহারী প্রবল ঘৃণায় সেই বিনোদিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সুদূরে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। *** তাহার পরে সে একটি অপরূপ মায়ালতার মতো নিমেষের মধ্যেই বিহারীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া সদ্যোবিকশিত সুগন্ধি পুষ্পমঞ্জরীতুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখ বিহারীর ওষ্ঠের নিকট আনিয়া উপনীত করিল। *** একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।" বিহারী ও বিনোদিনীর মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা ও চিত্তরহস্য উদ্ঘাটনই 'চোখের বালি' উপন্যাসের আধুনিকতার ভিত্তি। এর অন্য কারণও অবশ্য আছে—তা হল কাহিনীকে বস্তুভারাক্রান্ত না করে চরিত্র প্রধান করে তোলা।

বিধবার সমাজনিষিদ্ধ প্রেমকে প্রত্যক্ষ করে তোলবার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবনে প্রেমের মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটিয়েছেন, তেমনি সংস্কারমুক্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মনোবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্যক্তির প্রকৃত অধিকার। কোন সামাজিক দায় ও দায়িত্বের অনুশাসন মানা বা তার গুরুভার বহন করা ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ফলে, আশা হিন্দু কুলবধূ হয়েও মহেন্দ্রের পরকীয়া প্রেমকে সমর্থন করতে পারে নি। যন্ত্রণার দায়ভাগ সে বহন করেছে, প্রতিবাদে মুখর হয়ে না উঠলেও অন্তরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উচ্চ অধিকারে সে ঘৃণা করেছে মহেন্দ্রকে। কোন সংস্কার অথবা পৌরাণিক চেতনা তাকে স্বামীনিষ্ঠ করে রাখেনি। আধুনিক চিন্তাদর্শে রূপান্তরিত ভাবনার অনুলিপিটি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন আশার মনোলোকের গোপন আত্মচারণার মধ্যে: "সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না—এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না, সে আজ বিনোদিনীর কলংকপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল।" বিবাহিতা হিন্দু নারীর এই মানসিক রূপান্তরই আধুনিকতার প্রভাত সঙ্গীত—যা পরবর্তীকালে বহু রূপবৈচিত্র্য ও সংলাপে অলংকৃত হয়েছে।

চরিত্রনির্ভর জীবনধর্মী উপন্যাসের অপর পরিচয় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। কাহিনী অথবা প্লটের অস্তিত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার না করেও রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের ব্যক্তিবিশেষত্ব প্রকাশ করেছেন; বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শবাদের মিলন সাধন করেছেন। 'গোরা'র রোম্যান্টিক স্বদেশপ্রেম ও রোম্যান্টিক ব্যক্তিপ্রেম যে পরস্পর অবিভাজ্য এবং পরিপূরক—চরিত্রের এই অনুভূতির বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথ কথা-সাহিত্যে আধুনিকতার নবরূপত্ব সৃষ্টি করেছেন। ফলে, "চোখের বালিতে চরিত্র নির্মাণপদ্ধতির যে সূচনা ঘটেছে, 'গোরা'য় তার অধিকতর পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়।"[১]

আমরা জেনেছি, রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও বোধি এবং মননের আত্মপ্রত্যয় ভৈরব গীতিতে নিনাদিত হয়েছিল 'সবুজপত্রে'র পৃষ্ঠাতে। তাঁর মানসনিষ্ক্রমণের পরিচয়টি উদ্ধার করলে আমরা দেখতে পাব যে, "সাহিত্যজীবনে দু-বার কিছু বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। প্রথমটি এতই বড়ো যে বিপ্লবের কাছাকাছি পৌঁছয়, দ্বিতীয়টি তেমন না-হলেও তাতে কিছু আকস্মিকতা ছিল। প্রথমবার 'সবুজপত্রে'র যুগে—যখন তিনি কাব্যে লিখলেন 'বলাকা', আর গদ্যে লিখলেন 'চতুরঙ্গ', চতুরঙ্গের অব্যবহিত পরে 'ঘরে-বাইরে'। দ্বিতীয়বার—যখন বাংলা সাহিত্যের তরুণ মহলে আর-একবার বিদ্রোহের ঢেউ উঠেছে—যখন তিনি 'শেষের

কবিতা' লিখলেন, প্রায় একই সময়ে 'যোগাযোগ', তারপর 'পুনশ্চ'। আসল কথাটা হয়তো এই যে বড়ো বদল একবারই ঘটেছিল, প্রথমবারের ভাঙনের পর অনিবার্য ছিল মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। 'সবুজপত্রে' মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; অবিরলতায় যদিও কোথাও ফাঁক নেই, তবু নদীর স্রোত তীব্র বাঁক নিলো এখানে; 'সবুজপত্রে'র আগে এবং পরে যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। সে-সময়ে পুরোনো কূল ছাড়লেন তিনি, বহুদিনের অনেক অভ্যাসের বেড়ি ভাঙলেন, যে-কূল ছেড়ে গেলেন সেখানে আর ফিরলেন না।"[১০]

ফলে, 'সবুজপত্রের রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিচিন্তাতে এক নতুন চিন্তার দিশারী ও বৈপ্লবিক ভাবনার পূজারী। তাঁর বৈপ্লবিক মানসের পরিচিতি প্রথম আত্ম-প্রকাশ করেছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। 'চোখের বালি' ও 'গোরা'তে যা স্ফুট-নোন্মুখ ছিল, 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত এই উপন্যাসে তা পূর্ণ প্রকাশে পাপড়ি মেলে ধরল। 'চতুরঙ্গ' সেই বিচারে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস। ডায়েরী আকারে লেখা এই উপন্যাসে মনুষ্য চরিত্রের চেতন ও অবচেতন লোকের এক নিবিড় সংহতি লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর বস্তুভার ত্যাগ করে এই উপন্যাস চরিত্রপ্রধান হয়ে উঠেছে—ফলে মননশীলতার পরিমিতি এখানে অনেক বেশী। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ ও দামিনী সর্বপ্রথম আধুনিক চরিত্র, যেখানে রবীন্দ্রনাথ চিন্তা ও অনুভূতির তন্তুজাল বয়ন করেছেন মনের গভীর অবচেতন স্তরের দুর্গম রহস্যালোকে। এই চরিত্র দুটি আত্মানুসন্ধান ও আত্মসমীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছে—বহির্জগত থেকে অন্তর্লোকের গহনে প্রস্থান করেছে। এর ফলে, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস মনের অবচেতন স্তরের অপার রহস্যময়তায় জটিলতার আশ্রয়ে ও প্রতীকের রূপকল্পে সুদূরপ্রসারী হয়েছে। "চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে ইনার রিয়ালিটির সন্ধান, আত্মআবিষ্কারের পথে চরিত্রের উত্তরণ···স্বাধীন বিবর্তন, চরিত্রের ব্যক্তি বিশেষত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রতিদিনের নির্মিত ও নির্মীয়মান চরিত্রের উপর অন্ধকার অবচেতনার প্রভাব, অসম্পূর্ণ অ-নির্ধারিত চরিত্রের নিরন্তর পূর্ণতার অন্বেষণ—সব কিছুরই ইঙ্গিত 'চতুরঙ্গে' আছে। বাংলা উপন্যাসে পূর্ণতার অন্বেষণ ও ব্যক্তি-চরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠার সূচনা রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ।"[১১] জীবন বিশ্লেষণের অপার রহস্য উন্মোচনই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মূলকথা। প্রেম এখানে কোন রোম্যান্টিক মনের অভিব্যক্তি নয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অখণ্ডপরিচয়ের স্বরূপ অন্বেষণই প্রধান কথা। নায়ক শচীশ এবং নায়িকা দামিনী উভয়েই আত্মান্বেষণ করে ফিরেছেন জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত। শচীশ ব্যক্তি জীবনে নানা দ্বন্দ্ব ও আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে জ্যাঠামশাই-এর কর্মবাদ ও মানবধর্মের সঙ্গে লীলানন্দ স্বামীর রস-সাধনার তাৎপর্য,

উপলব্ধি করার সাধনা করেছে এবং তার আত্মজিজ্ঞাসা প্রবলতর হয়ে উঠেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আত্মানুভূতির নিবিড় সংঘাতে। শচীশের জীবনদ্বন্দ্ব, মানস বিশ্লেষণ ও আত্মানুসন্ধানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মানুষের চিত্তসংকট ও জিজ্ঞাসাকেই বাণীবন্ধ করতে চেয়েছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশের কথায় তারই প্রতিধ্বনি : "একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম ; দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম ; দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজের দাঁড়ানো চলে না।"

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনী সমাজনিরপেক্ষ আধুনিক মনের সৃষ্টি। তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, মুক্তি পিপাসা, বিদ্রোহী চেতনা, অবিশ্বাস এবং ব্যক্তিপ্রেমে গভীর নিষ্ঠা সবই বর্তমান কালচেতনার অভিব্যক্ত রূপ। দামিনীর জীবনে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের ইতিহাসের চেয়ে বড় তার জীবনের সংকট ও যন্ত্রণা। তার বঞ্চিত ব্যক্তিসত্তা ও প্রণয়পিয়াসী নারীমন শচীশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার প্রেম তীব্র দুঃখের, গভীর সুখের। সে শ্রীবিলাসকে বলতে দ্বিধা করেনি : "এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য !" দামিনীর চরিত্রের প্রকাশ তার ব্যক্তিজীবনের নানা আচরণ ও অনুভূতির মধ্যে ঘটেছে। তাকে কোন পরিচিত সমাজবন্ধনের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। শ্রীবিলাসের অন্তরানুভূতিতে এই তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে : "আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল। সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।" 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে মর্ত্যচেতনার সঙ্গে অমর্ত্যচেতনার দ্বন্দ্ব প্রকাশই বড় কথা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর এক কোটিতে দামিনী, অপর কোটিতে শচীশ। জীবনের দাবীকে অস্বীকার করে তত্ত্বসাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটে না। শুষ্ক আইডিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে' যোগাসন রবীন্দ্রচিন্তার পরিপন্থী ছিল। মোহের মধ্যে মুক্তি লাভকে তিনি অসম্ভব বলে কখনও মনে করেন নি। শচীশ রসতত্ত্ব সাধনায় আইডিয়াকে প্রধান ভেবে সিদ্ধিলাভ করতে চেষ্টা করেছিল। ফলে দামিনীর আকর্ষণ তাকে বারবার বিভ্রান্ত করেছে এবং আকর্ষণও করেছে দুর্নিবারভাবে। শচীশের মানসিক অসংলগ্নতা শ্রীবিলাসের অনুভূতিতে লেখক প্রকাশ করেছেন : "জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।"

শচীশের তত্ত্ব জীবননির্ভর নয় বলে সে দামিনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না এবং অপর দিকে নিতান্ত স্থূলতার মধ্যে শচীশকে লাভ করবার প্রয়াসেও দামিনী ক্লান্ত ও চিত্তে ক্ষত-বিক্ষত হয়। দামিনী জীবনসম্পর্কহীন রসসাধনা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশে শচীশের কাছে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছে : "প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ওই রাক্ষসীর (রসের পথে রসের রাক্ষসী) কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। * * * তুমি আমাকে এমন-কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।" দামিনী শচীশকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেষ্টা করেছে। জীবননির্ভর রসতত্ত্বের সাধনা তার 'রিয়েলিজম' চিন্তার প্রধান দিক। অন্যদিকে শচীশের 'আইডিয়ালিজম' চিন্তাতে জীবন বিনির্ভরতা তার সকল সংশয় ও অশান্তির অন্যতম কারণ। শচীশের জীবনানুসন্ধান একটি নিশ্চিত বিশ্বাস ও স্থিতির প্রতি অনুসন্ধান এবং সেজন্যই তার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা শেষ পর্যন্ত অপরিপূর্ণ থেকেছে—স্থিতির শান্তিতীর্থে তাকে পেঁছে দেয় নি। শ্রীবিলাসের অনুভূতিতে এর পরিচয় পাই : "মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।"

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন যে জীবনসাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা, সমস্ত তত্ত্বের উপরে তার অবস্থিতি। মানুষের পরিচয় তার নৈর্ব্যক্তিক পরিচিতির মধ্যে, সে কোন তত্ত্বের অঙ্গীভূত বিষয় বা বস্তু নয়।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে আত্মকথার রূপায়ণে এবং দৃষ্টির অন্তর্মুখিতায় বিমলা-নিখিলেশ ও সন্দীপের জীবনকাহিনী বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ত্রয়ী চরিত্রের আত্মকথাতে অন্তরচারিতার যে উদাহরণ পাওয়া যায়, তা বাংলা উপন্যাসে এক অভিনব ব্যাপার। আখ্যানবস্তুকে ঘটনাবৈচিত্র্যময় করে নয়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নব বাস্তবতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূল সুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন : "মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাইরের এবং একের সঙ্গে অন্যের ঘাতপ্রতিঘাতে যে হাসিকান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে তারই বর্ণনা আছে।"[১২] "দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়েছে।"[১৩] আধুনিক মন ও আধুনিক কালের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত

স্বতীটিকেও আমাদের আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করতে পারি।

"...'ঘরে-বাইরে' হইতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের যে নূতন পর্যায় আরম্ভ হইল তাহাতে বাঙালীর বিশিষ্ট পরিচয় সার্বভৌম মানবিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বেশ অনুভব করি যে, বাঙালীর জীবনছন্দ ধীরে ধীরে বিশ্ব-জীবনের বৃহত্তর ছন্দের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বাঙালীর চেষ্টা-চিন্তা ক্রমশ ধর্মপ্রাণ ভক্তিবাদ ও প্রথানুগত্যের নিস্তরঙ্গ খাল অতিক্রম করিয়া ঝটিকাবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গোচ্ছ্বাসমত্ত রাজনৈতিক চেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহানদীতে প্রবেশোদ্যম করিয়াছে। এতদিন হৃদয়াবেগের যে গভীর স্তরের উপর শাস্ত্রানুশাসন ও সমাজ-নির্দেশের আবরণ ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া সেখানে সমুদ্র-মন্থনের পালা শুরু হইয়াছে। এই অনবগুণ্ঠিত প্রবৃত্তির অবিরত ঘর্ষণে যে অমৃত-গরল উঠিয়াছে, সাহিত্যপাত্রে তাহাই পরিবেশিত হইতে চলিয়াছে। অভিজাত-কুলবধূ বিমলা যে ভঙ্গীতে আত্মবিশ্লেষণ করিয়াছে, নিজের মোহ ও মোহভঙ্গের যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছে, তাহাতে বাঙালীর ঘরের ও মনের কথা এক অতলান্ত মহাসাগরের ঊর্মি-কোলাহলের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। আততায়ী বাহির হইতে আসিয়া ঘরকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে ও মনকে ঘরের সুরক্ষিত বেষ্টনী হইতে এক অজানা জগতের দিকে উধাও করিয়া দিয়াছে। সমস্যার তীক্ষ্ণতা বাঙলার পারিবারিক শান্তিকে দংশন করিয়া উহার সমস্ত অঙ্গে বিষজ্বালা ছড়াইয়াছে। তাহার রুচি, সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের প্রণালী, তাহার জীবনের কাম্যবস্তু ও সার্থকতাবোধ, তাহার অতৃপ্তি ও হাহাকার সমস্তই অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিংশ শতকে পদার্পণ করিয়া বাঙলা উপন্যাস জীবনের এক নূতন অধ্যায়-রচনায় মনোযোগী হইয়াছে।"[১৪]

বস্তুতঃ 'ঘরে-বাইরে'তে লেখকের সমগ্র দৃষ্টি ব্যক্তি-চরিত্রের স্বরূপের উপর নিবন্ধ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অখন্ড পরিচয় ও তার স্বরূপরহস্যের অনুসন্ধানই রবীন্দ্রনাথের 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত উপন্যাসগুলির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। সম-কালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাসের ত্রয়ী চরিত্রের মধ্যে যে ব্যক্তিদ্বৈধের (split personality) সংঘাত, সে দিকে বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন: "বিমলার struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের— সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করেছে—নিখিলেশও নিজের feeling-এর সঙ্গে নিজের কর্তব্যের adjustment-করেছে। অন্য কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধে এরা সাক্ষ্য দিচ্চে না। এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখচে।"[১৫] তাই বিমলার নিষিদ্ধ প্রেমকে প্রচলিত সতীত্বের

মাপকাঠিতে বিচার করতে আগ্রহী হন নি রবীন্দ্রনাথ। তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার মৌল স্বরূপের পরিচয় উদ্‌ঘাটন এবং প্রতিটি চরিত্রের আত্মসমীক্ষা ও আত্ম-বিচারই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে আছে। সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা নিছক গৌণ পটভূমি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ মানব চরিত্রের যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে, তাকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে বিচিত্র করে তুলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। "ঘটনা নানা আকারে নানা জায়গায় ঘটে, একই ঘটনা দুই জায়গায় ঠিক একই-রকম ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মানবচরিত্র আছে সে চিরকালই নিজেকে প্রকাশ করে এসেছে। এইজন্য সেই মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।"[১৬]

নারীকে প্রচলিত নীতিবোধ, পারিবারিক আদর্শ ও সতীত্বের পৌরাণিক অনু-ভাবনার বাইরে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে তার ব্যক্তিত্বের বিচার এবং প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন আধুনিক কালের যুগভাবনায় ধরা দিয়েছিল, তারই উজ্জ্বল বিকাশ 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসে কুমুদিনীর চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যেন এই উপন্যাসে নারীর প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে আধুনিক কালের ব্যক্তিত্বের জটিল দ্বন্দ্ব জীবনসমস্যা রূপে দেখাতে চেয়েছেন। কুমুদিনীর জীবনসংস্কারে লালিত সতীত্ববোধের সঙ্গে তার সদ্যোজাগ্রত ব্যক্তিসত্তার যে তীব্র সংঘাত কি রকম করুণ পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হতে পারে, তারই ট্র্যাজিক কাহিনী এই 'যোগাযোগ' উপন্যাস।

কুমুর চিন্তাদর্শ পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ফলে সতীধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল তার এই চিন্তারই অপর পরিণত রূপ। স্বামী সম্পর্কে তার ধারণা তাত্ত্বিক অথবা Idea প্রধান। স্বামী নির্বাচন নারীর জীবনে বিধিনির্বন্ধ উপায়েই ঘটে থাকে। এ বিষয়ে তার বিশ্বাস : "মা কি ছেলে বেছে নেয় ? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয়, সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চলবে কার ?" কুমদিনীর মন ও চিন্তা অতীতের পৌরাণিক ছাঁচে গড়ে এবং বেড়ে উঠেছিল। জাত-কুলের পবিত্রতা ছিল তার কাছে খুব বড় জিনিস। ফলে আধুনিকতার বাতাবরণ তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ রুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ কুমুর মানসিক কাঠামোর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : "...ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন তিনি আমার পরম গতি। * * * শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ। * * * অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন

আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন-ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন।" কিন্তু বিবাহের সূচনাকাল থেকেই শুরু হয়েছে তার চিত্তের সংঘাত। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রাচীন যুক্তিহীন বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক মননশীল চেতনা ও বুদ্ধিবাদী প্রত্যয়ের। কুমুর জীবনে যথার্থ সঙ্কট তার আত্মসুষুপ্তির বিভাবরীর অবসানে। নারীর ভাগ্য দেবতার কাছে সে প্রশ্ন করেছে: "আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি যে জন্যে আমার এত শাস্তি! আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস করে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছি।"

কুমুদিনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিশিখার মত। মধুসূদনের উগ্র প্রভুত্ববাদী মনোভাব তার কাছে বারবার পরাভূত হয়েছে। অথচ মনের মধ্যে আত্ম-অবমাননার ব্যথা তাকে অত্যন্ত চঞ্চল করে তুলেছিল: "···সকলের চেয়ে যে ব্যথাটা ওকে বাজছিল সে হচ্ছে নিজের কাছে নিজের অপমান। এতকাল ধরে ও যা-কিছু সংকল্প করে এসেছে ওর বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তার উল্টো দিকে চলে গেছে।" পরি-শেষে কুমুদিনীর পৌরাণিকী আত্মনিবেদন আধুনিক কালের আত্মসংরক্ষণের পথে অগ্রসর হয়ে কঠিন আকার ধারণ করেছে। বাইরে যেমন দাম্পত্য সংঘাত প্রবল হয়েছে, মনের ঘরেও আপন চিত্তের দুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও হয়েছে দ্রুত গতিতে। কুমুদিনীর আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসাতে যে মননের দীপ্তি, তাতে আধুনিকতার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। বাইরের সমস্ত কলহ-বিবাদকে সে আপন চিত্তে অন্তর্মুখী করে অপরিমেয় আত্মশক্তির নিয়ন্ত্রণে জীবনের মত ও পথ ঠিক করতে ব্রতী হয়েছে। তার মানসিকতা দেবনির্ভর হলেও, আত্মশক্তিতে আস্তিকাবাদী দেব-বিনির্ভরতারই প্রকাশ ঘটেছে। বিপ্রদাসের সঙ্গে বহিরঙ্গ বিচারে কুমুদিনীর পার্থক্য থাকলেও, আপন মত ও পথে দৃঢ়ভাবে স্থির থেকে যে আপোষহীনতা তা প্রত্যক্ষ-ভাবেই বিপ্রদাসের আস্তিকাবাদী জীবনদর্শনের ফলশ্রুতি। একদিকে আত্মসমর্পনের অক্ষমতার জন্য চিত্তবেদনাবোধ ও অপরদিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণে আত্মার অপমানগ্লানি কুমুদিনীকে ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং সে নিজের মধ্যে নিজের অন্তরাল খুঁজেছে। তার জীবনদ্বন্দ্ব নারীর আধুনিক কালের প্রত্যূষ লগ্নের মর্মবিদারী কাতরোক্তি: "জানি স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পনের গ্লানির কথা মনে করে।"

রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন চরিত্র রূপায়ণের মধ্যে চিরন্তন পুরুষতান্ত্রিক প্রভুত্বকামী সমাজকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আধুনিক কালে জাগ্রত নারী সমাজ যে এই

মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধে ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল, তারই প্রতিচ্ছবি 'যোগাযোগ' উপন্যাস। লেখকের এই মনোভঙ্গী একটি উক্তিতে দেখতে পাই ঃ "আমাদের পূর্ব-যুগে মেয়েরা ছিল পুরুষদের অন্তরায়। ···তাদের মনুষ্যত্বের যে স্বাতন্ত্র্যটি মোড়ক ছাড়িয়েও প্রকাশ পায় তা কখনো অস্বীকৃত, কখনও বা নিন্দিত। ···আজকাল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করেছে। জননার্থং মহাভাগা বলে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তি-বিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য।"[১৭] কুমুদিনীর মধ্যে এই বক্তব্য আদর্শায়িত হয়েছে। তার বিদ্রোহ আধুনিক মানবধর্মের বিদ্রোহ। ব্যক্তি মর্যাদা ও মনুষ্যত্ববোধকে সে নারীর যে শ্রেষ্ঠ পরিচিতি 'জননার্থং মহাভাগা', তার উপরেও স্থান দিয়েছে। প্রাচীন সংস্কার, তত্ত্বচিন্তা ও 'আইডিয়া' ভাবনাকে সে অস্বীকার করে দৃপ্তভাবে বলেছে ঃ "এমন-কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না * * * মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। *** আমি মুক্তি চাই। ***একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব ; *** মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়ো বউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই ?" প্রকৃতির অমোঘ অনুশাসনের প্রতি কুমুদিনীর যে আত্মসমর্পণ, তাতে তার বিদ্রোহিণী ব্যক্তিসত্তার পরাজয় ঘটেনি ; বরং একটি স্বতন্ত্র জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে যে মাতৃত্বের চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিমর্যাদার মধ্যে মানবতাবোধ অথবা মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিতে এই কথাই সমর্থিত হয়েছে ঃ "এত বড়ো অপমানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য—এ যেন দেবতার অবমাননা—নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পঙ্কে বিলুণ্ঠিত করা। কুমুর এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধা হলো।"[১৮] কুমুদিনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও চিত্তমুক্তির প্রতিষ্ঠা আকাংখা মনে হয় 'স্ত্রীর পত্র' ছোট গল্পের মৃণালের চেয়েও অধিক পরিমাণে স্বাধিকার-প্রমত্ত। মৃণালকে মাতৃত্বের গুরুভার বহন করতে হয়নি আপন ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ ঘোষণা পর্বে। সেই দিক দিয়ে পরবর্তীকালের কুমুদিনী আরও অধিক পরিমাণে আধুনিকা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী। "এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না" বাংলা সাহিত্যে কোন সন্তানবতী জননী পূর্বে একথা বলে নি।

'শেষের কবিতা' (১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম আধুনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য বহন করে বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিস্ময়ের চিরস্থায়ী প্রতীক হয়ে আছে। সমাজ-নিরপেক্ষ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় প্রেম ও ব্যক্তিজীবনের চিত্তসংঘর্ষ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কুলিশকঠোর দ্বন্দ্ব এবং আত্মজিজ্ঞাসা যে ভাবে তাঁর উপন্যাসগুলিতে রূপায়িত হয়েছে, 'শেষের কবিতা' সেদিক থেকে ব্যতিক্রম সৃষ্টি। সমকালে আধুনিক

সাহিত্যে তরুণদের মধ্যে প্রেমের অবন্ধন রূপ ও পারিবারিক জীবনে বিবাহ ও প্রেমের পরিণতি নিয়ে এক সমীক্ষা শুরু হয়েছিল। 'কলাকৈবল্যবাদ' তত্ত্বের (Art for Art's sake) মধ্যে সাহিত্য ও জীবনকে প্রত্যায়িত করবার এক চেষ্টাও ছিল সমানভাবে। জিজ্ঞাসা, সংশয় ও সন্দেহে যখন আধুনিক মন চঞ্চল, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে 'নিরঞ্জনরূপে', 'বাইরের রেখা বাইরের ছায়া' পড়ার স্বতন্ত্র জগতে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেমের নতুন মূল্যায়ন করলেন। রুদ্ধ তোয়ে আবদ্ধ চিত্তের সংশয়- বিহ্বলতা মুক্তি পেল। রবীন্দ্রবিরোধীরা উপলব্ধি করলেন যে, তাঁদের পক্ষে অসম্ভব রবীন্দ্রনাথকে উত্তরণ এবং অনিবার্য রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ।

'শেষের কবিতা'র মূল সুর—'প্রেম বিবাহের চেয়ে বড়'। অমিত ও লাবণ্য এই মন্ময় চেতনার রূপকার। আধুনিক চিন্তায় প্রেম নৈর্ব্যক্তিক—অবন্ধন গ্রন্থি। বিবাহের সংস্কারে প্রেমকে বাঁধতে গেলে, তার মাধুর্য ও বিশালতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়। অমিতের চরিত্রে এই জীবনচিন্তা বৈশিষ্ট্যই সুষমামণ্ডিত। তার সদাচঞ্চল, প্রথা-বন্ধনমুক্ত প্রাণহিল্লোলের তরঙ্গধারায় চিরপুরাতন 'পদাতিক' জীবনযাত্রার যান্ত্রিক গতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার চিন্তা ও আচরণের এই বৈপরীত্য যেন আধুনিকতার নব পদসঞ্চার। তাই অমিতের আধুনিক মন কখনও প্রেমকে জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের সামগ্রী করে তোলে নি, বিকি-কিনির হাটে কড়ি দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করে নি। এমন কি তার বিবাহ অভিলাষও ছিল : "জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে" ; এবং যে জীবন শুধু 'মনে নেওয়া,' 'মেনে নেওয়া নয়।' অমিতের উপলব্ধি হয়েছিল যে, একই নারীর মধ্যে প্রেমিকা ও বিবাহিতা রূপের অনুসন্ধান করতে গেলে জটিলতা ও অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভালবাসা নিঃসীম আকাশে পক্ষবিহার, আত্মপ্রকাশের সঞ্জীবনী শক্তি ;—একে উপলব্ধি করা যায়, ধরতে গেলে মাধুর্যহীন হয়ে পড়ে এবং শ্রান্তিতে দেহমন ভরে উঠে। অমিত পরিশেষে উপলব্ধি করেছে : "ভালবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।" যদিও কেতকী মিত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনকে সে কোনদিন অস্বীকার করে নি ; রোম্যান্টিক মনের স্পর্শ দিয়ে দৈনন্দিনের ক্লান্তির গুরুভারকে লঘু করে নিয়েছে। তার কথায় : "যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই। * * * আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে-স্থলেও উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। * * * কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই ; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা

সে রইল দিঘি ; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" অপর দিকে প্রেম ও বিবাহের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষা করে দৃঢ়ভাবে জীবনতরী বাওয়া লাবণ্যর পক্ষে সম্ভব হয় নি। প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতায় ও তুচ্ছতায় সাংসারিক জীবনে তার প্রেম নিরঞ্জন থাকে নি। বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাকে মলিন করে তুলেছে। লাবণ্যর ব্যাকুল প্রেমের ক্রন্দন আত্মমুক্তির বাণীতে উচ্চকিত হয়ে ঘোষণা করেছে তার মনের পাষাণভার বেদনাকে : "হেথা মোর তিলে তিলে দান, / করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান / হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।"

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আধুনিকতার বিচারে সবসময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি কোনদিন প্রেম ও মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সমাজের সংকীর্ণ নীতিবোধ নিয়ে চিন্তা করেন নি। ব্যক্তিজীবনের অন্তর্গূঢ় পিপাসাই তাঁর উপন্যাসে ও ছোট-গল্পে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি উপন্যাসে নারীর গৃহিণী ও প্রণয়িনী রূপের সামঞ্জস্য বিধান চলেছে এবং তাঁর আধুনিক মন নারীর প্রেমসত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই কথাসাহিত্যের নায়িকাদের জীবনদ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ এবং দ্বিমুখী জীবনপিপাসা এত গভীর। আত্মানুসন্ধানের নিবিড় প্রয়াসের মধ্যে আধুনিক মনের যন্ত্রণা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। এই যন্ত্রণাই রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনমুক্তির বিদ্রোহ। 'শেষের কবিতা'-য় লাবণ্য চরিত্রে তার বন্দী আত্মার ক্রন্দন শোনা গেছে অমিতকে লেখা শেষের কবিতায়।

নারীমনের inner reality-র অনুসন্ধানই আধুনিকতার বড় কথা নয়; পুরুষের প্রণয় চিন্তা ও ভোগাকাঙ্ক্ষার স্পৃহাতে নারীর গৃহিণী সত্তা এবং প্রণয়িনী সত্তা যুগ্মভাবে চরিতার্থ হবার ব্যাকুলতায় যে প্রহর গোণে, অথচ দুই বিপরীত জীবনতত্ত্ব কোনদিন একই সঙ্গে একটি বিশেষ রমণীর মধ্যে পাওয়া যায় না ; উপরন্তু নারীর অনুভূতিবোধে সংঘাতের তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে সংসার ও জীবনকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়,—তারই কথাচিত্র রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'। একটি অপরটির পরিপূরক। নারীমনের বাস্তবতা নয়,পুরুষের জীবন-চিন্তার গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ স্বাভাবিক ঘটনা ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের সংস্কারে যে নারী পত্নীরূপে জীবনে বাঁধা থাকে, তার উপরে পুরুষের কর্তব্যের দায়ভাগ বর্তমান থাকে মাত্র, জীবনের পূর্ণ বিকাশ খর্ব হয় নিত্য জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার গুরুভারে। পুরুষের কাজ পালানো উড়ো মন প্রেমের সহজ সাবলীল বিকাশের মধ্যে লঘু পাখা মেলতে চায়। তাই বিবাহ পুরুষ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও একমাত্র বিষয় নয়। ফলে, পুরুষের পরকীয়া প্রেম কোন লজ্জা, হীনমন্যতা বা অগৌরবের ভার বয়ে আনে না। নারী,

বিবাহোত্তর পর্বে কর্ম ও কর্তব্যের ক্ষুদ্র বেড়াজালে পুরুষকেআবদ্ধ করে তার মনের সীমাকে খর্ব করতে চায়। সংসারের মধ্যেই তার সাধ ও সাধনার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু পুরুষের চিত্ত সেই সময়ে মুক্তি চায় অনন্ত প্রসারতার মধ্যে, বাধা-বন্ধনহীন আনন্দের উল্লাস মুখরতায়। নারী, স্ত্রী হিসাবে এখানে ব্যর্থ হয়। তার গৃহিণী সত্তা নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে আবদ্ধ থাকতে ভালবাসে। পুরুষ তখন অন্য সাথী খোঁজে যেখানে পাওয়া যায় অসীমের লীলাচঞ্চল অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোন' কাহিনীতে শশাঙ্কমৌলীর কামনাতরঙ্গের মধ্যে এই তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন : "···ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ রক্ত থেকে এখনো কিছুতেই থামতে চায়না। সংসারের সমস্ত দাবি, সমস্ত ভয় লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।"

এছাড়া রমণীর গৃহিনী সত্তার মধ্যে দেবী রূপের যে বিভূতিচ্ছটা আরোপিত করা হয়ে থাকে, তাতে নারীর পৌরাণিক মনোভাব পরিতৃপ্ত হলেও পুরুষের কোন কাজে আসে না। মনে হয় পুরুষের মধ্যে একটা সদা চঞ্চল অস্থির বাসনা থাকে, যেখানে স্বপ্নরঞ্জিন রোম্যান্টিক অনুভাবনাই প্রবল। স্থিতি অথবা পৌরাণিক গরিমা বড় কথা নয়, গতি চাপল্যেই থাকে প্রধান অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ পুরুষ চিত্তের এই অস্থির দিকটিকে শশাঙ্কমৌলীর ঊর্মিমালার প্রতি উক্তিতে প্রকাশ করেছেন : "তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।" মানবীর কবোষ্ণ স্পর্শ-টুকু পুরুষের ভোগাকাঙ্খার পরিতৃপ্তির পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজন—পুরুষচিত্তের কামনাতুরতার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সেই অসীম রহস্যকে প্রকাশ করতে হয়েছেন উদ্যোগী।

পুরুষের পরকীয়া প্রেমের প্রতি নিবিড় আসক্তির স্বীকৃতি এবং আত্মনিবেদন 'মালঞ্চ' উপন্যাসে আদিত্যের জবানবন্দীতেও প্রকাশিত হয়েছে। সে দ্বিধাহীন চিত্তে মৃত্যু পথযাত্রিণী স্ত্রীকে জানিয়েছে : " আমার সঙ্গে ওর (সরলার) সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয়, সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি।" পুরুষ চিত্তের প্রণয় রহস্যের বিকাশ 'দুই বোন' কাহিনীর চেয়ে 'মালঞ্চে' আরও অধিক প্রত্যক্ষ পরিমাণে ঘটেছে। আদিত্য প্রকাশ্যভাবে আপন অনুরাগের কথা ঘোষণা করে সরলাকে বলেছে : "তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়। *** অন্তরে অন্তরে বুঝেছি, তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। * * * ভালোবাসি তোমাকে এ কথা

আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি, এতে আমার বুক ভরে উঠেছে * * *
আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম। মনের অতলচারী অনুভাবনার অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্লেষণ করা আধুনিক সাহিত্য ভাবনার অন্যতম লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ এই কঠিন কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। মানুষের অন্তঃকরণের জটিলতা ও সংস্কারমুক্ত জীবনপিপাসার অক্ষয় অব্যয় ভোগতৃষ্ণার বোধকে কোন নিরালম্ব বৈরাগ্য চিন্তা অথবা ধর্মীয় অনুভাবনায় নয়—মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে একান্ত সত্য করে প্রতিপন্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সরলার কারাগার থেকে মুক্তি সংবাদ, আদিত্যকে যেভাবে উল্লসিত করেছে, তাতে মানুষের মনের অবচেতন স্তরের একটি গোপন দিক খোলা-খুলিভাবে হয়েছে ব্যক্ত। লেখকের লিপিতে এই মনশ্চারণার অভিব্যক্তি : "আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস।" কারণ আদিত্য ইতিপূর্বে উপলব্ধি করেছিল : "যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিতায়, সেই নীরবতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে—ওর কাজ পর্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।"

সাংসারিক জীবনে নর-নারীর মনস্তত্ত্বের পার্থক্য বিশ্লেষণ, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গভীরে করেছেন। প্রেম ও বিবাহ, নারীর প্রণয়িনী সত্তা ও গৃহিণী সত্তা দুইয়ের পার্থক্য ও ব্যবধান দুই মেরুর - সামঞ্জস্য কোনক্রমেই আনা যায় না। নারীর হৃদয়ে এই উপলব্ধি অত্যন্ত মর্মান্তিক। পুরুষকে সংস্কারের নিগড়ে বাঁধতে গিয়ে সে মাটি ও আকাশ উভয়কে হারায়। জীবনতত্ত্বের এই করুণতম দিকটিও রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' কাহিনীভাগের মধ্যে প্রকাশ করেছেন শর্মিলা এবং নীরজার অব্যক্ত বেদনাময় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে। শর্মিলা উপলব্ধি করেছে : "মরবার আগে ওই কথাটুকু বুঝে গেলুম ; আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারিনি। * * * আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও (ঊর্মিমালা) চলে গেলে সব শূন্য হবে।" অপর দিকে নীরজার অন্তিম আর্তনাদের মধ্যে সেই করুণ অভিজ্ঞতারই যেন বহিঃপ্রকাশ : "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না! আমি থাকব, থাকব, থাকব! * * * পালা পালা পালা এখনি! নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে—শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত!" সংসার জীবনপিপাসা এই উভয় নারীর ভিতর যতই থাক, বিবাহ যে প্রেমের চেয়ে বড় নয়, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বারবার বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর অপরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ভঙ্গীতে।

দুই বিপরীতমুখী প্রেমের তীব্রতা এবং আর্তির প্রকাশ 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)

উপন্যাসের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়ঃ "...বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। • যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালবাসা।"[১৯] এলা ও অতীন্দ্রের ভালবাসা অপূর্ণ থেকেছে তাদের পরস্পর ব্যক্তিত্বের বিপরীতমুখী অভিযানের জন্য। বিপ্লববাদের যতই মহিমা থাক, ক্ষেত্র বিশেষে এর সনাতন নীতি-নিষ্ঠা ও সংস্কারের নিষ্ঠুর রূপ কিভাবে ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্য ও মনুষ্যত্বের মহিমাকে বিনষ্ট করে দেয়, তাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে সঙ্কুচিত হন নি। মনে রাখতে হবে যে লেখকের সাধনা জীবনরসের ও জীবননিষ্ঠার সাধনা। ব্যক্তিত্ববোধ, প্রেম এবং মানবতাবাদের গৌরবের উপর এর আসন পাতা। সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানুষের প্রেম ও ব্যক্তিত্বের গরিমাকে প্রতিষ্ঠিত করাই আধুনিকতার বড় ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে একটি সংস্কারকে কেন্দ্র করে চিত্ত-আবদ্ধতার মধ্যে দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও পরস্পরের স্বভাবের উপায়হীন আত্ম-হত্যাকে দেখিয়েছেন। বাইরের বিপ্লব কিভাবে জীবনে ঝড় তোলে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে এবং মনের প্রকৃতির স্বাধীন প্রসারকে রুদ্ধ ও প্রতিহত করে দেয়, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়ে জীবনের নীতিবোধকে ভূমিসাৎ করে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ আধু-নিকতার বিচারে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নায়িকা এলার আত্মজাগরণের মধ্যে। এলার সঙ্কোচহীন আত্মনিবেদনে সিংহাসনচ্যুত প্রেমকে হৃদয়াসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার আর্তিতেই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উগ্র আদর্শবাদ ও অন্ধ সংস্কারের আবর্তে ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু ঘটে। জীবনের দিক থেকে এই বিলুপ্তি অত্যন্ত করুণ এবং অসহনীয়। অতীন্দ্র স্বভাবহত্যার গ্লানিতে নিরন্তর দগ্ধ হয়েছে। সে এলাকে বলেছেঃ "স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে।" জীবন-বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শবাদের মিলন চাই—এইটেই রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের বড় কথা।

• সাহিত্যরচনার প্রকৃতিধর্ম বিচারে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি আধুনিক বিশ্ব সাহিত্য মতাদর্শের অনুগামী হয়েছে। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার জটিল সমস্যাকে ব্যক্ত করতে আগ্রহী হয়েছেন। ফলে, ঘটনার ঘনঘটায় কিংবা পরিস্থিতির সংঘাতে মানস প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করার পরিবর্তে ব্যক্তিসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে আত্মান্বেষণ ও যন্ত্রণাবিদ্ধ কাতর অশ্রুজলের মধ্যে মননের বর্ণালীরূপের প্রতিফলন এবং প্রতীকের রূপকল্পের

মাধ্যমে অবচেতন মনের অপার রহস্যময়তার প্রতিলিপি রচনা—সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক জীবনচিন্তার অনুলিপি।

'সবুজপত্র' নবরূপে আত্মপ্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতীচ্য জগৎ পর্যটন করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যে নবরূপত্বের—বিশেষ ভাবে চেতনাপ্রবাহ ভাববৈশিষ্ট্যে অবলম্বিত সাহিত্য রচনার প্রয়াস সম্পর্কে পরিচিত হন। সমকালীন বিশ্বের বায়ু পরিমণ্ডলে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতির মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল, যা সমস্ত বিশ্বের উপন্যাসে কোন না কোন উপায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।* ফলে, রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে আধুনিকতার পদক্ষেপ যে বিশ্বচিন্তার পটভূমিতেই ঘটেছিল, এ সম্পর্কে আমরা অনুমান করতে পারি। হেনরী জেমস, হাক্সলী, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ও জেমস জয়েস—উপন্যাসের প্রাচীন ধারা ও রীতির পরিবর্তে নতুন প্রকরণচিন্তায় সাহিত্যে বাস্তবতাকে নবরূপে গ্রহণ করতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁদের বিদ্রোহের মূল কথা ছিলঃ কথাকোবিদের দৃষ্টি বহির্জগৎ থেকে অন্তর্মুখী করে তোলা। হেনরী জেমস্ পরিষ্কারভাবে Bennett, Wells ও Galsworthy—প্রভৃতি বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বললেন, 'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা / আর চলিবে না। / বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, / ফুরায় সত্যের যত পুঁজি' — অর্থাৎ (১) তথাকথিত বাস্তববাদী উপন্যাসে বাস্তবমার্গীরা জীবনের খুঁটিনাটি জোগাড় করে মানব জীবনের প্রকৃত পরিচয় দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেন—কিন্তু এ প্রচেষ্টা কেবল আবর্জনাই বৃদ্ধি করে, মানব জীবনের প্রকৃত পরিচয় অথবা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে ব্যর্থ হয়। (২) বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকরা বাইরে থেকে মনুষ্য চরিত্র আঁকেন। তাঁদের কাহিনীর কাঠামোতে রূপনির্মিতির যে কৌশল আছে তা একান্তভাবেই বিকৃত ও বাইরের আবর্জনা বা 'mere notations or signs of life'। মানবচেতনার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন আলো-আঁধারের খেলা চলছে, যে সূক্ষ্ম অনুভূতির লীলাচাঞ্চল্যে মানবচেতনা চিরমুখর, তার কোন নিদর্শনই তাঁরা দিতে

*"We shall have to admit that there are times when ideas are in the air, when they seem common property, and when the attribution to any one man of the paternity of any particular idea is well-nigh impossible."

—The Correspondence of Jefferson and DuPont de Nemours : ed by Gilbert Chinard. 1931, p. 112.

পারেন না। বহির্জীবনের নির্মোক তৈরীতেই তাঁরা ব্যস্ত, বহিরাবরণ ভেদ করে মানবমনের অন্দরমহলের কোন খোঁজ তাঁরা রাখেন না।[২০] রবীন্দ্রনাথের নব্য চিন্তা এই পথেই অগ্রসর হয়েছিল। তিনি পুরানো ধারাকে বর্জন করে, পুরানো আঙ্গিককে দূরে সরিয়ে মননচেতনা ও কাব্যানুভূতির সংমিশ্রণে নব সাহিত্য সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার এই সুরটি অনুরণিত হয়েছে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত ছোট গল্পগুলিতেও। এই গল্পগুলির মূল সুর ছিল—যৌবনের আহ্বান ও নারীর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা।[২১] 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস দুটির কথা স্মরণে রেখে, তাঁর একই ধর্মাবলম্বী অপর তিনখানি গ্রন্থকে এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি—'বলাকা', 'ফাল্গুনী' ও 'পলাতকা'। যৌবনের পূজারতি ও নারীত্বের মূল্যবোধ আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাঁর এই তিনখানি গ্রন্থে সমানে চলেছে। যে যৌবনের উচ্ছল জলধিতরঙ্গকে তিনি 'চল্লিশের ঘাট' থেকে বিদায় দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাকেই আবার তিনি নবরূপে, নবরসে লাভ করলেন—'ফাল্গুনী'তে। 'বলাকা' কাব্যে এই যৌবনরূপকে জীবনতত্ত্বরূপে আহ্বান করলেন 'সবুজের অভিযান' কবিতাতে এবং 'পলাতকা' কাব্যে অনন্যনির্ভর হয়ে নারীর পূর্ণ মূল্য প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯১৪ সাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পূর্ব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। যে যৌবনের আহ্বান ও নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃপ্ত প্রকাশ তাঁর 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের মধ্যে অপূর্ব বৈভবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার বীজটি পোঁতা হয়েছিল 'চোখের বালি' উপন্যাস ও 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ পূর্বেকার সমস্ত সংস্কার-বেড়ি ভাঙতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস সাময়িকভাবে ছিল স্থগিত। মনে হয় তিনি চিত্তদ্বন্দ্ব থেকে সে সময়ে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পান নি। 'চোখের বালি' উপন্যাস ও 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ যে পরিচয় রেখেছেন, তাতে এই ধারণা দৃঢ়তর হয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবে।*

---

* "উর্বশীতে নারীর এক রূপ দেখিয়াছি, যে 'নহ বধূ, নহ মাতা, নহ কন্যা'; সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, কিন্তু সে সংসারের কেহ নয়। মানসসুন্দরীতে নারীর আর এক রূপ, সে-ও সংসারের কেহ নয়। মানসসুন্দরী যদি হয় গৃহকোণের দীপ, উর্বশী আকাশের শশিকলা। রবীন্দ্রনাথের নারীর ধারণা পরিণতি লাভ করিয়াছে 'দুই নারী'-তত্ত্বে, যেখানে নারী এক রূপে উর্বশী আর এক রূপে লক্ষ্মী, অর্থাৎ এক রূপে প্রেয়সী ও অন্য রূপে জননী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গল্পে

উনিশ শতকের শেষার্ধে আমরা ইতোমধ্যে বিশ্বসাহিত্যের আবহ পরিমণ্ডলের যে তত্ত্ব অনুসন্ধান করেছি, তাতে এই প্রত্যয় আমাদের দৃঢ়ীভূত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে যে বিশ্বপরিক্রমা করেছিলেন, তাতেই তাঁর চিত্তের সমস্ত দ্বিধা মন থেকে সরে গিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে (১৮৮৮) হেনরী জেমস তাঁর 'Partial Portraits' গ্রন্থে সাহিত্যে শিল্পাদর্শ ও রচনা রীতি সম্পর্কে নতুন তথ্যের অবতারণা করে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, তার অনেক আগেই ইউরোপীয় সাহিত্যে নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ ঘটেছিল নরওয়ের সাহিত্যিক ইবসেনের হাতে। ইবসেন ছিলেন প্রথম বিদ্রোহী নেতা, যিনি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্ত স্থবিরতাতে আঘাত হেনে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'A Doll's House' ছিল জীবনের সমস্ত অচলায়তন ভাঙার প্রভাতী সঙ্গীত। বিশ্বের নারী জাগৃতীর আগমনী গীতি ইবসেনের এই নাটকে ধ্বনিত হয়েছিল দেশ-দেশান্তরে। নোরা বিশ্বের প্রথম আধুনিক বিদ্রোহিণী নারী*। এ ছাড়াও সমকালে ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল

নারীর মাতৃমূর্তিরই প্রকাশ উজ্জ্বলতর। অবশ্য চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর মতো চরিত্রে প্রেয়সী মূর্তিই অধিকতর দীপ্যমান, কিন্তু তাহাদের পৌরাণিক পরিবেশের দূরত্ব হেতু এই দীপ্তি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া বাস্তব সংসারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাস্তবচারিণী বিনোদিনীর রূপে প্রেয়সীর শিখাটি উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কবি যেন তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাই তাহাকে বাস্তবভাবে সংসার-ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিয়াছেন। নষ্ট-নীড়ের চারুলতার সম্বন্ধেও একথা অংশত প্রযোজ্য। সংসার হইতে সে অপসারিত হয় নাই বটে, তবে প্রদীপে যে তৈল জোগাইয়া আসিতেছিল সেই অমল দূরে প্রস্থিত হইয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাসমণি ও আনন্দময়ীর মাতৃমূর্তির স্নিগ্ধ গৃহদীপটিই বেশি করিয়া নজরে পড়ে।"—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : প্রমথ নাথ বিশী : পৃ. ৫৪।

*"Because of this play (A Doll's House) Ibsen was depicted as a man who had attached the sancity both of home and marriage. The boldness of his championship of women's right to be respected as human being with minds, souls, destinies of their own, apart from their role as wives,···Nevertheless, the reverberation of the door Nora slams at the end of the play re-echoed all over the

ফ্রান্সের (১৮৪৪—১৯২৪) নিরীশ্বর চিন্তাসম্বলিত মানবহিতবাদী মতবাদ ও ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির (১৮৪৮—১৯২৮) নারীজীবন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক মর্যাদার বেদিতে স্থাপন করবার ব্যাকুল আর্তি ও দুঃখবাদ ছিল সাহিত্য-চিন্তার প্রধান প্রচলিত নিয়মনীতি*। আমরা জানি যে, রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের অনুকূল হাওয়ায় সর্বদা পাল তুলে দিত। বিশ্বপরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন যুগের বাণীটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে মৌলিক চিন্তা ও অনুভূতিতে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুললেন। 'সবুজপত্রে' তাঁর নবরূপে আত্মপ্রকাশ—এই মানস জাগৃতির আনন্দঘন রূপ। এর ফলে, ১৯১৪ সাল থেকে তাঁর সাহিত্যে চলেছে কেবলমাত্র দুটি সুরের আলাপন—একদিকে নারীকে পূর্ণ মূল্যদানের প্রচেষ্টা ও অপর দিকে যৌবনের পূজা-বন্দনা। এ কালের ছোট গল্পগুলিতে বাস্তবচারিণী নারীর প্রেয়সী রূপ, যা আমাদের দৈনন্দিন সংসারে নিত্য তুচ্ছতার মধ্যে বহ্নিদীপ্ত নিয়েও ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে আছে, তাকে সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন। 'সবুজপত্র' পর্বের গল্পগুলিতে নারী চরিত্রগুলি আমাদের কন্যা-গৃহিণী-মাতা—ত্রয়ী নিয়মরীতিতে আবদ্ধ নয় অথবা গার্হস্থ্য জীবনধর্মের চিরাচরিত পরিচিতির মধ্যে মূল্য অর্জন করতে আদৌ আগ্রহী নয়—মনে হয় নারীর পূর্ণ মূল্য ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে সার্থকতা অর্জনই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪, শ্রাবণ) কোন সুশীলা, সর্বংসহা নারীর স্বামীপ্রেম ও অনুরাগ ভিক্ষার বর্ণলিপি নয়, সমস্ত পুরুষ জাতির কাছে আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নারীর চির লাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বের প্রতিবাদ মুখরিত 'চার্টার'।

---

civilised world for decades thereafter. Probably so single work did more to speed the political and economic emancipation of women than 'A Doll's House".

—Essentials of World Literature: (Vol. 2): Hopper and Grebanier; p. 591.

* আনাতোল ফ্রান্স ও টমাস হার্ডির সাহিত্য সৃষ্টিতে মহৎ অবদানের কথা স্মরণ রেখেও নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথকে যে পুরস্কৃত করেছিলেন, তাতে বিশ্ব সাহিত্যের অপর গতি-প্রকৃতির চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

"The Nobel Committee is a conservative body, and the scepticism of Anatole France and the pessimism of Hardy are too unorthodox

মৃণালের পত্রটিকে পরিবার ও সমাজ-সম্পর্ক নিরপেক্ষ রমণীর পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি শাশ্বত প্রতিবাদ বলে মনে করলে বোধহয় কোন ভুল হবে না। এই চিঠি কোন স্ত্রীর স্বামীর কাছে আত্মাভিমানের অনুলিপি নয়। মৃণাল তার স্বামীকে লিখেছে: "আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।"

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণালের মননশীলতা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ব্যক্তিমানসের গভীর উপলব্ধি। তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বৈভব বিকশিত হয় নারীত্বে—পত্নীত্বের চিরন্তন সংস্কারবন্ধনে নয়। পত্নীত্বের মধ্যে নারীত্বের খণ্ডাংশ মাত্র প্রতিফলিত; পূর্ণতার সাধনাই নারী জীবনের প্রকৃত সাধনা। মৃণালের গৃহত্যাগের শক্তি—যৌবনের শক্তি। তার ব্যক্তিত্বের শতদল 'নারীত্ববোধের মুক্ত আকাশে' পক্ষবিহার করেছে। মৃণাল তার স্বামীকে লিখেছে: "...আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। *** সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয় যে কী তা আমি পেয়েছি। *** কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া। কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে। ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল।*** আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভাল লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।*** আমি বাঁচলুম।"

রবীন্দ্রনাথ এই ছোটগল্পে যৌবনশক্তির centrifugal force-এর সঙ্গে নারীর

---

to find favour. Within the limits of choice they allow themselves, they have made a fine and bold selection. They have shown that art knows no East and West forever sundered by mutual unintelligibility."—Daily News and Leader; November 14, 1913.

জীবনের নব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মৃণালের বিদ্রোহিণী সত্তার ভিতরে। মৃণালের পত্র যেন নারী জাগরণের প্রভাতী ভৈরবী।

'সবুজপত্রে'র প্রথম ছোটগল্প 'হালদারগোষ্ঠী'তে (১৯১৪, বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথ যৌবনের বাধাবন্ধনহীন অনিয়মতান্ত্রিক ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন। বনোয়ারিলালের চিত্তের মুক্তিপিপাসা প্রকৃতপক্ষে যৌবনের অসহনীয় জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সংসারের সবাই যখন বিধিবদ্ধ নিয়মনীতির অনুশাসনে জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ বিচারে আগ্রহী ও ব্যগ্র, তখন সে বংশ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ঔদ্ধত্যভরে সবকিছুকে অস্বীকার করে ঘরের বাইরে পাড়ি জমিয়েছে। তার যৌবনদীপ্ত বাধাবন্ধনহীন মন ভেবেছে : "একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনাআপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো—তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।" তাই পরিশেষে, বনোয়ারিলাল চাকরি খুঁজতে বের হয়ে পড়ল বংশ ও পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 'হৈমন্তী' (১৩২১, জ্যৈষ্ঠ) গল্পের নাম চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ নারী হৃদয়ের-অন্তস্তলে নিঃসীম নিস্তব্ধতার সীমাহীন ব্যাপ্তি নিয়ে কিভাবে বিপরীত পরিবেশে মৃত্যুর পরিমণ্ডল গড়ে তোলে, তারই বিবরণ রেখেছেন মৌনতার অন্তরালে। 'হৈমন্তী' গল্পটি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের সূচনা। মৃণালের প্রকাশ্য বিদ্রোহ যেন তার পূর্বসূরী হৈমন্তীর নীরব সহ্যশক্তি ও আত্মক্ষয়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করেছে। মৃণালের বিদ্রোহিণীরূপ ও হৈমন্তীর নিঃশব্দ প্রতিবাদ, দুই নারী ব্যক্তিত্বের চিরন্তন মানসিকতার প্রতিলিপি। 'হালদারগোষ্ঠী'র বনোয়ারিলাল যেখানে দম্ভভরে সমস্ত কিছুকে দূরে নিক্ষেপ করেছে, সেখানে 'হৈমন্তী'র নায়ক আপন মনের বিদ্রোহকে ব্যর্থতার গ্লানিতে প্রকাশ করে বলেছে : "বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।"—এও যেন সেই চিরন্তন দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত-চিন্তার অনুলিপি। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ 'নারীকে আপন ভাগ্য জয়' করবার যে মন্ত্র শিখিয়েছেন, তার অপর প্রকাশ 'অপরিচিতা' ছোটগল্পটি। কল্যাণী অপর এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী রমণী, যে মনুষ্যত্ব অর্জন ও প্রতিষ্ঠাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে গতানুগতিকতার অচলায়তনকে ভাঙতে উন্মুখ হয়েছে। চৈতন্যপ্রবাহের অন্তরালে মানুষের জীবনকে প্রকৃষ্টভাবে উজ্জ্বল করে তোলার

প্রয়াস দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'তপস্বিনী' ছোটগল্পে। নারী স্বামী পরিত্যক্তা হলে জীবনে নিষ্ঠুর কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ঊষরতাকে বরণ করাই দেশ ও সমাজের অমোঘ অনুশাসন। অথচ জীবনের ধারাপাত শাস্ত্রের অনুশাসনকে মানে না। সামাজিক বিধানকে অস্বীকার করা এবং প্রতিবাদে বিদ্রোহ করাই যেন মানুষের মন ও জীবনের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ ষোড়শী চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনের অবচেতন গহনস্তরে ডুব দিয়ে এই জীবনসত্যটি প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্মুখী পদচারণাতে অন্তরের প্রবৃত্তির যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও সংঘাত বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাঁর অতীতের আনুগত্য ত্যাগের সঙ্গে আধুনিকতার শুভ উন্মেষণ প্রত্যক্ষ করতে পারি। এর সঙ্গে তিনি কৌতুকভরে আঘাত করেছেন সমাজের বাহ্য আচরণকে, যা আপাতভাবে অসংগতিময় বলে বোধ হলেও অত্যন্ত নিষ্করুণ। ধর্মের নির্মোকে ব্যক্তিলালসা চরিতার্থ করবার যে নীতি সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘদিন প্রচলিত, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী নারী 'বোষ্টমী' নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্দীপিত হয়ে বাহ্যধর্মকে অস্বীকার করে প্রকৃত ধর্মের পায়ে আত্মনিবেদন করেছে। মনে হয়, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণাল যেন বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর বিচ্ছিন্ন দেহের মত বহু অংশে বিভক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির নায়িকা চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'পয়লা নম্বর' গল্পের নায়িকা অনিলা সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যেতে পারে। তার স্বামীত্যাগ ও রূপগুণমুগ্ধ সিতাংশুমৌলিকে অস্বীকার দুই-ই একই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুক্তি পিপাসায় চিহ্নিত।

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কথাসাহিত্যে যে আধুনিকতার সুরটি ভোরের পাখীর কাকলির মত মুখর হয়ে উঠেছিল, তার প্রধান স্বরূপটি যে নারীর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও যৌবন বন্দনাতে অভিষিক্ত ছিল, তা আমরা তাঁর সমকালের রচনা থেকেই উপলব্ধি করি। কারণ রচনাতেই লেখকের মানসচিন্তার অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। যৌবনের পূর্ণতা অসম্পূর্ণ থাকলে প্রেমের শক্তি অস্ফুট থাকে। জীবন দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ একথা গভীরে বিশ্বাস করতেন। অপরিণত মিলন জীবনের ভারকে অসহ্য করে তোলে, আর প্রেমহীন সংসার হয় পাণ্ডুর ও পাংশু। মনের পূর্ণ জাগরণেই প্রেমের পূজারতি ও জীবনের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের প্রকৃত মিলনেই এই জাগরণ সফল হয়। 'পয়লা নম্বরে'র অনিলা ও 'শেষের রাত্রি'র যতীনের জীবন-ট্র্যাজেডির প্রকৃত তথ্য এই সত্যের মধ্যে কূটস্থ হয়ে আছে। সিতাংশুমৌলি অনিলার মনকে জাগিয়ে তুলেছিল; কিন্তু অনিলার এই জাগরণ ছিল মর্মান্তিক আত্মবেদনার। একদিকে চিত্ত জাগানিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ, অপরদিকে প্রেমপিপাসিত হৃদয়ে স্বামীর উপেক্ষা সহ্য করা—

উভয়ই ছিল অনিলার কাছে দুঃসহ। এরই জন্য সে গৃহত্যাগ করেছিল উভয়কে একই ভাষায় পত্র লিখে। জীবন-যৌবনকে উপেক্ষা করা অনিলার পক্ষে সম্ভব হয়নি, অথচ পরিতৃপ্তির পথটিও মুক্ত ছিল না তার কাছে। উন্মুক্ত বিশালতার প্রান্তরে তাই সে শান্তি পাবার চেষ্টা করেছিল মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক চিন্তার বিকাশ জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত নব নব রূপে ও নব চিন্তাকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক সাহিত্যচিন্তার মননশিল্পী বুদ্ধদেব বসু। তাঁর কথায়ঃ "সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশে কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র, সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড় করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।"[২২] 'তিন সঙ্গী' গল্প সংকলনের দিকে তাকিয়ে বিচার করলে সমালোচকের বক্তব্যের যাথার্থ উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। সত্যই জীবনের অন্তিমপর্বে রবীন্দ্রনাথ কোন সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা পড়েন নি, উপরন্তু নীতির চেয়ে সত্যকে ও রীতির চেয়ে জীবনকে বড় করে দেখেছেন। 'তিন সঙ্গী' গল্প সংকলনে (রবিবার, শেষ কথা ও ল্যাবরেটরি) 'সবুজপত্র' যুগের খাঁচাভাঙার চিত্তভাবনাই অনুসৃত হয়েছে। এই তিনটি গল্পের মূল সুরে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে'র সংস্কারমুক্ত, মননদীপ্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর অম্লান রেখেছেন।

'রবিবার' (১৩৪৬, শারদীয়া সংখ্যা ঃ আনন্দবাজার) গল্পের নায়ক অভীক উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তার প্রতিনিধি। তার চিন্তায় সমাজ, গোষ্ঠী ও পরিবারধর্ম শুধু অস্বীকৃত নয়—পূর্ণ মাত্রায় উপেক্ষিত। অভীকের চিত্তকল্পনা বাধাবন্ধনহীন সীমার মধ্যে মুক্তিপিপাসু। বিভার প্রতি তার ব্যক্তিপ্রেম, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নাস্তিকতা—সবই যেন তৎকালীন যুগধর্মের পরিচয়। সমাজ ও গৃহ-পরিবারের ঐতিহ্যবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সে সর্বদা আগ্রহী। অভীকের জীবনসমস্যা প্রকৃত পক্ষে আধুনিক মানুষের জীবনের জটিল সমস্যা ও যার পরিণতিতে বর্তমান সংকট ও সংঘর্ষের অব্যর্থ রূপায়ণ। এছাড়া গল্পের পরিশেষে বিলাতগামী নায়ক অভীকের নায়িকা বিভাকে লেখা চিঠিতে আধুনিক অব্যবস্থিত চিত্ত ও সংশয়বাদী দিশেহারা মানুষের মনশ্চারণার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অভীকের বোহেমীয় আচরণ এবং কথা-বার্তার মধ্যে অধুনাকালের মানুষের অবিশ্বাসী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও

বৃহত্তর স্বার্থের অন্বেষণে তার খণ্ডিত আত্মা আস্তিক্যবাদকে বরণ করে নিয়েছে।

'শেষ কথা' ছোটগল্পে আধুনিকতার মননদীপ্ত বিশ্লেষণ হয়েছে দুই নর-নারীর প্রণয়াকর্ষণের নৈর্ব্যক্তিক অভিধার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে রোম্যান্টিকতার কোন মোহঘোর রাখেন নি। তাঁর নিজের কথায়ঃ "গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চম-সুরে বাঁধতে চাইনে।" তবে অরণ্যের আদিম প্রকৃতি জীবনের প্যাশনকে কিভাবে সঞ্জীবিত করে তোলে, তার পরিচয়টুকু তিনি নর ও নারীর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্যাশনের মোহঘোর এই গল্পের বড় কথা নয়, 'আইডিয়ালিজমে'র মধ্যে জীবনাদর্শের প্রসার এবং 'রিয়েলিজমে'র সঙ্গে সংঘাত 'শেষ কথা' কাহিনীর অভ্যন্তরে আধুনিকতার পদসঞ্চার ঘটিয়েছে। জীবনাদর্শ ও প্রেমের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারে যে দুটি তত্ত্ব এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তার একটি নারীর 'ইম্পার্সোনাল' প্রেমের প্রতি অনুরাগ, যাকে সে সতীত্বের চরম বিকাশ বলে মনে করে এবং অপরটি 'আইডিয়ালিজমে'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ। নায়িকা অচিরার জীবনের যে সংঘাত, তার পশ্চাতে আছে দুই বিপরীত আদর্শের দ্বন্দ্ব—'প্যাশন' বা প্রবৃত্তির সঙ্গে 'আইডিয়ালিজমে'র সংঘাত ও পরিশেষে 'আইডিয়ালিজমে'র জয়লাভ। অবশ্য এর সঙ্গে আধুনিক নারীর গার্হস্থ্য জীবনপিপাসার আদর্শটিও হয়েছে উপেক্ষিত। নারীর খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব যা পুরুষের জীবনসাফল্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাতে অচিরার আধুনিক মন ব্যথিত হয়েছে ও নবীনমাধবকে সে কর্তব্য এবং কর্মের মধ্যে দিয়েছে মুক্তি। 'ইম্পার্সোনাল' প্রেমের প্রকৃতি পরিচয় দিতে গিয়ে অচিরা নবীনমাধবকে বলেছেঃ "ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পুজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পুজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না। * * * আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা-কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়—তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।" অচিরার সতীত্ববোধের পিছনে ছিল মানুষের তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আরণ্যক পরিবেশের আদিম প্রবৃত্তি-রাক্ষস অচিরা ও নবীনমাধবকে যে তাদের জীবনাদর্শ থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল, প্যাশনের দুর্নিবার মোহে পরস্পর পরস্পরের কাছে কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে দণ্ডিত হয়ে উঠছিল, অচিরার অনুভূতিতেই তা প্রথম ধরা পড়ে। 'আইডিয়ালিজম' থেকে সরে আসার ব্যথা তাকে বিক্ষত করেছিল

আত্মপ্লানির অভিশাপে। নারীত্বের প্রতিষ্ঠা তার চিন্তায় ছিল কর্তব্যবেদীর উপরে। অচিরার আধুনিক মন ব্যক্তি স্বার্থের খণ্ডিত ভালবাসায় পূর্ণতা লাভ করে নি। সে তার নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসা ব্যক্ত করে নবীনমাধবকে বলেছে : "আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে বসে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। * * * বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনও দেখি নি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি। * * * আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে!" অথচ 'চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে', তা অচিরাকে প্রতিনিয়ত আত্মবিলুপ্তির পথে আকর্ষণ করেছে. জৈব কামনার অভিলাষে করেছে অধীর। এই প্যাশন থেকে মুক্তির সংঘাতই তার জীবন ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন। সে নিজের সাধনাভঙ্গের কাহিনী বিবৃত করে বলেছে : "আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি—যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে-মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে. একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।" প্রবৃত্তি-চেতনার আকারগ্রাসী, পরিণামগ্রামী বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামই অচিরার জীবনস্পন্দের মূল ইতিহাস। পরিশেষে তার 'আইডিয়ালিজমে'-র কাছে চিরন্তন কামনার 'রিয়েলিজমে'র পরাজয় ঘটেছে। এরই ফলে অচিরা কেবল নিজেকে নৈর্ব্যক্তিকতার বিশালতায় মুক্তি দেয় নি, সে অধ্যাপক বৃদ্ধ দাদু অনিলকুমার সরকার এবং বৈজ্ঞানিক নবীনমাধবকেও অখণ্ডতার মধ্যে প্রসারিত করেছে। 'ইম্পার্সোনাল' ভালবাসার প্রকৃতি বিষাদচেতনার মধ্য দিয়ে নবীনমাধব উপলব্ধি করেছে অচিরার আধারহীন নৈর্ব্যক্তিক ভালবাসার মাধুর্য ও সাধনবেগের প্রকৃতিতে। "বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।"

রবীন্দ্রনাথ 'শেষ কথা' গল্পে নায়িকা অচিরার মধ্যে যা অসম্পূর্ণ অপরিস্ফুট

রেখেছেন, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নায়িকা সোহিনী যেন সেই পূর্ব ভাবচিন্তার সম্পূর্ণ মানসপ্রতিমা। এখানেও 'আইডিয়ালিজমে'র মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে আধুনিক মনন ও চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে। সোহিনীর চরিত্র ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন : "সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম্‌, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজ্‌মই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।"[২৩] এই গল্পের নায়ক-নায়িকা নন্দকিশোর ও সোহিনী তীব্র স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের অনির্বাণ শিখায় সমস্ত জীবনব্যাপী প্রজ্বলিত থেকেছে। তাদের চিন্তা ও কর্ম-ভাবনা যেন অগ্নিগর্ভ জীবনযন্ত্রণার মাঝখান থেকে উঠে আসা দাহিকা শক্তির দগ্ধ রূপ। নন্দকিশোর ও সোহিনীকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগচিন্তার সর্বসংস্কার-মুক্ত, অতীতের সকল বন্ধন ও সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন চিরন্তন মানব ও শাশ্বতী মানবী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক পরিভাষায় তাদের পরিচিতি শয়তানের ভক্ত চেলা। নন্দকিশোর ও সোহিনী নতুন জীবন প্রত্যয়াভিলাষী ও উৎকেন্দ্রিকতার অনুপন্থী। তাই তাদের বিবাহ সবর্ণে ও ধর্মীয় অনুশাসনে বিধিবদ্ধ না হলেও অসবর্ণ অথবা অপবিত্র নয়। তাদের সংজ্ঞার্থে অসবর্ণের অর্থ দুই বিপরীত মতাদর্শের মিলন; মানসিক দূরত্বই অপবিত্রতা। নন্দকিশোর তার অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে মত ব্যক্ত করে বলেছে : "স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়াবাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।" অতএব ব্রত অথবা আদর্শের মিলনই স্বামী ও স্ত্রীর আধুনিককালে রাজযোটক মিল—আত্মার অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা। এখানেই নন্দকিশোর ও সোহিনী অন্বয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। নন্দকিশোর সোহিনীর জীবনকাহিনী ও চর্যাপদ বিশুদ্ধ না জেনেও স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হন নি। তার দাম্পত্য জীবনাচরণ ও প্রেমে কোন ফাঁকি ছিল না, তা সম্পূর্ণ ছিল গভীর আন্তরিকতার নিবিড় সৌহার্দ্যে। বন্ধুদের নন্দকিশোর তাই বলতে দ্বিধা করে নি : "বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমত।" এবং আন্তরিকতার কথা সোহিনীও প্রকাশ করেছে অধ্যাপক চৌধুরীর কাছে। সোহিনী নন্দকিশোরকে কোন পৌরাণিক স্বামীভক্তির একনিষ্ঠ আদর্শে পূজা করে নি, তাঁর সত্যনিষ্ঠ আদর্শ ও বিজ্ঞানসাধনাকে সে ভালবেসেছিল ও তার কাছেই করেছিল আত্মসমর্পণ। নন্দকিশোরের সারস্বত সাধনা সোহিনীকে উদ্ধার করেছিল সকল রকম তুচ্ছতা ও জৈব পঙ্কিলতার আকর্ষণ থেকে, প্রতিষ্ঠিত করেছিল নির্মল

'আইডিয়ালিজমে'র গ্রাণাইট প্রস্তরের সুউচ্চ বেদীতে। আদর্শ ও নিষ্ঠা ব্যক্তিকে বহুদূর অতিক্রম করেছিল বলে সোহিনী ল্যাবরেটরিকেই স্বামীভক্তির একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আপন জীবনমুক্তির ইতিহাস ও কলঙ্কবিজড়িত জীবনের কথা প্রকাশ করে সোহিনী অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছে : "মন যে লোভী—মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি*** ছেলেবেলা থেকে ভালো-মন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না।*** তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।***

আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না।*** আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।" অপরের আন্তরসত্যের প্রতি এই বিশ্বস্ততা, বেইমানি করতে না পারার প্রতিশ্রুতি পালন অর্থাৎ মনের দৃঢ়তায় 'আইডিয়ালিজম'-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সবই সোহিনীর প্রকৃত পরিচয়, তার সতীত্ববোধের উপাদান ও উপচার। সতীত্ববোধ সোহিনীর কাছে কেবলমাত্র 'আইডিয়া' ছিল না, ছিল তার নারীত্বের পূর্ণ পরিচয়, জীবনসাধনার সাধনপীঠ। নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরির মান-মর্যাদা রক্ষাকে তার সকল চিন্তার শ্রেষ্ঠ চিন্তা বলে সোহিনী ব্রত নিয়েছিল। সে অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছে : "একে (ল্যাবরেটরি) যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে।*** আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসি নি।" ফলে, সোহিনীর চরিত্রের বিচার ও পূর্ণ পরিচয় নিহিত রয়েছে তার নারীত্বের মধ্যে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বহ্নিশিখার উজ্জ্বল দীপ্তিতে। নন্দকিশোরের প্রতি তার জীবনানুগত্য 'আইডিয়ালিজম' মনোভাবনার ফলশ্রুতি। সে কখনও এর উপর শ্রদ্ধা হারায় নি। সোহিনী সমস্ত নারীধর্ম বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র শাণিত ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করেছে। এই আদর্শের প্রতি আনুগত্যই তার সতীধর্ম—যেখানে আধুনিকতার ভিত্তি নারী মনোধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার সোহিনীর যে আদর্শনিষ্ঠা, যাকে আমরা বার বার সতীধর্মের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছি, তার পটভূমিতে দেব-বিনির্ভর মানবধর্মের মহান্ বাণীটি যেন সোহিনীর কণ্ঠে ব্যাকুল সুরে বেজেছে।

সে অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছে : "আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুর-দেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও-সব কিছুই বিশ্বাস করিনে। *** মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

আধুনিক জীবন ও চরিত্রের প্রাকৃত ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ সোহিনীর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। নৈর্ব্যক্তিক ব্যাক্তিত্ববাদই আধুনিক মানসচিন্তার বৈশিষ্ট্য ও জীবনের পরিচিতি। তাই সোহিনীকে আমরা দেখি সে কখনও নিজেকে প্রেয়সীরূপে কিংবা জননীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নি। নন্দকিশোরের প্রতি তার আকর্ষণ প্রেমের ছলনায় ছিল না; উভয়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনিবার্য পরিণতির প্রয়োজনেই ঘটেছিল তাদের পরিণয়। সে নন্দকিশোরের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলেছিল : "বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।" সোহিনীর চরিত্রের এই প্রত্যক্ষতাই তার 'ক্যারেক্‌টরের তেজ' তার শাণিত ব্যক্তিত্বের প্রতিশ্রুতি। নন্দকিশোর তাকে চিনেছিল। লেখকের কথায় : "কষ্টিপাথর আছে ওঁর (নন্দকিশোরের) মনে, তার উপরে দাগ পড়ল, একটা দামি ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্‌টরের তেজ—বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।"

'ক্যারেক্‌টরের তেজ' সোহিনীকে কোন সংস্কারে বাঁধা পড়তে দেয় নি। এমন কি জননী-সংস্কারও তাকে অভিভূত করেনি। মাতৃরূপের অমৃতময় ভাণ্ডে রমণীর ব্যক্তিত্ব বিলুপ্তির যে চিরাচরিত মাহাত্ম্য শাস্ত্রীয় ভারতবাক্যে উচ্চারিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃপ্তময়ী রমণী নারীত্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার পিয়াসী আধুনিকা সোহিনী তাকে বহু দূরে অতিক্রম করেছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনীর মধ্যে আমরা এর পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছি। সোহিনীর আপন কন্যা নীলিমা ওরফে নীলার উপর যে আচরণ, তাতে নৈর্ব্যক্তিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, নিরাসক্ত, সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় মনের অধিকারিণী এক রমণীর আদর্শবাদী চিত্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধ শুকতারার দীপ্তিতে এই রমণীহৃদয় স্নিগ্ধ নয়। নন্দ-কিশোরের ল্যাবরেটরির মর্যাদা রক্ষা করতে সোহিনী যখন রেবতীভূষণ ভট্টাচার্যকে দরকার মনে করেছে, তখন সুন্দরী যুবতী কন্যা নীলিমাকে চার হিসাবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে নি। আবার যখন নীলা ব্যক্তিপ্রেমকে চরিতার্থ করবার উদ্দেশে

রেবতীভূষণকে আকর্ষণ ও নন্দকিশোরের সম্পত্তি গ্রহণ করবার জন্য প্রয়াসী হয়েছে, তখন সোহিনীর আদর্শবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তীক্ষ্ম ছুরির ফলার মতো ঝলসে উঠেছে। কন্যা নীলিমাকে সতর্ক করে দিয়ে সে বলেছে : "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়।" সোহিনীর এই আদর্শবাদিতা বা আইডিয়ালিজমের অভিব্যক্তি কোন রকমেই আকস্মিক নয়। এই অনুভূতি তার জীবনের রস ও রক্ত। প্রাণ-বায়ুকে অস্বীকার করা যেমন প্রাণীদেহের পক্ষে অসম্ভব, তেমনি অপরিহার্য সোহিনীর নন্দকিশোরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা : "দেখব,যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে।" সে একথা পরবর্তীকালে অধ্যাপক চৌধুরীকেও বলেছে : "মানুব না আপনার অদৃষ্ট, মানুব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাই-পদেরও উমেদার হোক। * * * ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।" ভালবাসার দৃপ্ত মহিমার ব্যক্তিগৌরবেই সে অস্বীকার করেছে আপন কায়িক সতীত্ব। সোহিনীর জীবনে নন্দকিশোরের প্রতি যে ভাল-বাসা, তা প্রতিশ্রুতি রক্ষার আন্তরিক শপথ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সোহিনীর পরিচয়, তার চরিত্র—নন্দকিশোরের প্রতি বিশ্বস্ততা। এই নিষ্ঠাই তাকে করেছে আপোষহীন এবং আন্তরিক ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একনিষ্ঠ আদর্শবতী স্ত্রীর মর্যাদায়। তাই প্রচলিত তত্ত্বে সতীত্ব আদর্শকে সে অবহেলা করতে দ্বিধা করে নি ; বরং নির্ভীকভাবে কন্যা নীলিমা ও সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে বলেছে : "কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস ? এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না। * * * তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন আজও পাবেন তা, আর-কিছু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।" ক্যারেক্টরের এই তেজ সোহিনীকে শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী করে নি, তাকে অকৃত্রিম করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্প সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে আধুনিক কালের মানুষের রূপান্তরিত এবং পরিবর্তিত জীবনবিশ্বাসের প্রতি তাঁর যে সমর্থন, তাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন আন্তর শক্তিতে আপন জীবনের অন্তিম পর্বে। তিনি বলেছিলেন : "আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কিরকম, তার মনের জোর, তার লয়াল্‌টি, এই হল আসলে বড়ো কথা—তার দেহের

কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাত সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি।"[২৪]

'তিন সঙ্গী'র রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপর্বে হলেও 'সবুজপত্র' পর্ব অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে মানুষের জীবনবোধ ও সমাজ চিন্তার অনুভূতিতে যে রূপান্তরের পালা চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকেই সাহিত্যচিন্তার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেন যে আমাদের চির প্রাচীন সমাজ, পরিণামহীন অতলস্পর্শ শূন্যতার উপান্তে এসে পৌঁচেছে। এরই ফলে প্রবাহমান নীতিবোধ, আদর্শচিন্তা, দাম্পত্য সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন-ধর্ম, এমন কি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের আনুগত্যবোধ, সমস্ত কিছুর মধ্যে পালা বদলের ঝড় বইতে শুরু করেছে দ্রুত তালে ও লয়ে। তাই বর্তমান যুগের জীবন-দর্শন অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বিচ্ছিন্ন। বিশেষভাবে সাম্প্রতিক দাম্পত্য জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমি দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সহনশীলতা ও পূর্ণ মর্যাদার অধিকার দাবিতে। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নমূল উৎকেন্দ্রিক জীবনধারা ও জীবনানুভূতির ভিতরে স্থিতিস্থাপকতা কোথায়, তারই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। আধুনিক কালের বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষের যে চিন্তামুক্তি ঘটেছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ জীবন সম্পর্কে কোন ক্রমেই আশাহত হননি। যদিও শঙ্কিত হৃদয় নিয়ে আপন চিত্ত-জিজ্ঞাসার অনুসন্ধান তিনি অন্তিমকাল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন।

'ল্যাবরেটরি' গল্পে তিনি সোহিনীর মুখে যে ইমানদারির কথা শুনিয়েছেন, তাতে মনে হয়, সেখানেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন নতুন যুগের নব মানুষের পরস্পরের প্রতি জীবন ও চিন্তার ভিত্তিতে আন্তরিক হয়ে থাকার অঙ্গীকার বা শপথ। 'ইম্পার্সোনাল' ভালবাসা ও 'আইডিয়ালিজমে'র প্রতি উচ্চ অনুরক্তি মানুষকে নতুন সমাজ ও জীবন গঠনে শক্তি জোগাবে। শাস্ত্রনীতি নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত জীবনবিশ্বাস, মানবতাবাদ এবং আত্মিক ধর্ম নতুন দেশ ও জাতির পক্ষে হবে সমস্ত চিন্তা ও কর্মব্রত উদ্‌যাপনের মহামন্ত্র।

এই রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত চিন্তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছোটগল্প 'বদনামে'-র সৌদামিনী চরিত্রে আমরা লক্ষ্য করি। মনে হয় লেখক যেন বাধা-বন্ধনহীন জীবনসত্তাকে অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির একটি বিশেষ রূপ তিনি নায়িকা সৌদামিনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন,—যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তৎকালীন বাঙালী যুগমানসের পরিপ্রেক্ষিতে

একান্ত বাস্তব। 'বদনাম' গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন: "প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বলি। *** তার পরে আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"[২৫] 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল ও 'বদনামে'র সৌদামিনী নারী মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দুই রূপ। দুজনেই বিদ্রোহিণী—একজনের বিদ্রোহ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনড় অধিকারের বিরুদ্ধে, অপরজনের দাবি চিরন্তন সমাজনীতির বিপক্ষে, যেখানে নারীকে গৃহকোণে আবদ্ধ করে বাইরের কর্মমুখর বৃহত্তর জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে গতানুগতিক সংসারের স্থূল প্রয়োজনের চাকায় বেঁধে রাখা হয়েছে। সৌদামিনী মৃণালের মত গৃহত্যাগ করে নি, গৃহের অভ্যন্তরে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে পূর্ণ মর্যাদায় ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়েছে। তাই মনে হয়, সৌদামিনী মৃণালের চেয়েও অধিক পরিণামে বিদ্রোহিণী। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। নারীর স্বকীয় অধিকার দাবির প্রতিষ্ঠার জন্য শাশ্বতভাবে গৃহত্যাগের যে পরিকল্পনা বা উদাহরণ এই গল্পে দেখা দিয়েছিল, তাতে তৎকালীন প্রাচীন ও গোঁড়া বাঙালী সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ 'বদনাম' গল্পে সৌদামিনীর চরিত্রচিত্রণে গৃহের অভ্যন্তরে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছিলেন। সে, স্বামী পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার বিজয়বাবুর কাছে দাবি করেছে, সংসারের বাইরে মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চলেছে, তাতে অংশ গ্রহণ করবার। বাইরের জগতের ঢেউ যে নারীর চিত্তভূমিকে উদ্বেল করতে পারে, কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমান ভূমিকা নিতে পারে, নারী-পুরুষের যুগল সাধনায় সকল সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি,—তৎকালে রবীন্দ্রনাথ এ ধারণাটিও তুলে ধরেন আধুনিকতার প্রবল বাসনাতে। সৌদামিনী বলেছে: "এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যারা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা-কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা.........। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দস্যাল মেয়ে। এই কলঙ্কের-তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সদুর কপালে ...।" সৌদামিনির বন্ধনমুক্তি আকাঙ্ক্ষাতে আদর্শবাদ বা 'আইডিয়ালিজমে'র প্রতি এক গভীর আকর্ষণ আছে। এই আদর্শ স্পৃহাই আধুনিক নারীর সতীত্ববোধ,—তার

মর্মজগতের প্রকৃত পরিচয়। ফলে, প্রচলিত শাস্ত্রনীতিকে সে করেছে অস্বীকার। 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী যেমন শাস্ত্রবাক্য বা ধর্মীয় অনুশাসন মানে নি, সৌদামিনীও যেন তাকেই অনুসরণ করে বলেছে : "আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।" তার সামাজিকতা, স্বামীপ্রেম, সংসারধর্ম পালনে আনুগত্য—সমস্ত কিছুতে স্বাতন্ত্র্যের রূপটি আচ্ছন্ন হয়নি, বরং প্রদীপ শিখার নিবাত নিষ্কম্প দীপ্তিতে সমস্ত দিক স্নিগ্ধ করেছে। সৌদামিনী চিত্তের ভক্তিবাদকে স্থাপিত করেছে যুক্তি বা মননশীলতার বেদীতে, যেখানে তার নারীধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বকীয় মহিমায়, অনন্য সত্য-নিষ্ঠার পটভূমিতে। সিদ্ধেশ্বরীতলার জীর্ণ দেবদেউলে ঘন অন্ধকার রাত্রে সৌদামিনী স্বামী বিজয়বাবুকে যা বলেছিল, তাতে নারীর গৃহকোণ বিবর্জিত যে একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে, এবং তা নারীর ব্যক্তি পরিচয়ের বিশেষ দিক, তাকে রবীন্দ্র-নাথ মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। নারীর জীবনদেবতা স্বামী হলেও, আদর্শ দেবতা রূপে সে ভিন্ন ব্যক্তি বা পুরুষকে পূজা করতে পারে, এতে তার অথবা সংসারের কোন অন্যায় বা অকল্যাণ নেই। দাম্পত্যের সত্য হল কর্তব্য-সত্য, কিন্তু আদর্শের সত্য জীবন-সত্য। তাই সৌদামিনী স্বাধীনতা সংগ্রামী অনিলকে ভালবাসার মধ্যে কোন অন্যায় পাপ বা অসতীত্ব দেখতে পায় নি। রবীন্দ্রনাথ অন্তিম পর্বে আধু-নিকতার বিচারে সতীত্বের যে সংজ্ঞার্থ করেছিলেন, তাকেই এখানে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। সৌদামিনী পূর্ণ মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের দাবিতে বিজয়বাবুকে বলেছে : "এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। * * * দু দিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী রকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব। * * * প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম।" দাম্পত্য প্রেম ও কর্তব্যবোধ সমার্থক নয়; সৌদামিনী কোন দিকেই বেইমানি করেনি। কিন্তু প্রয়োজনবোধে জীবনে যে 'আইডিয়ালিজম্'কে সে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে, তাতেই সে অনুরক্ত থেকেছে—এর জন্য সমাজ নিন্দাকে গ্রাহ্য করেনি। আপন জীবনাদর্শের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকাই আধুনিকতার প্রাণধর্ম, আধুনিক নর-নারীর জীবন-অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি।

'সবুজপত্রে'র সূচনাকাল থেকে 'তিন সঙ্গী' ও তৎপরবর্তী কালের রচনার অন্তিম পর্ব পর্যন্ত বাঙালীর চিন্তা ও চেতনায় যে নতুন জীবনবোধ ও অভীপ্সা চলমান জীবনের অশান্ত ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আত্ম-জিজ্ঞাসা ও বিশেষ আদর্শের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হবার প্রত্যয় নিয়ে আত্মচেতনাতে স্থিতধী হবার চেষ্টা করছিল, তাকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মনুষ্যত্বের আশ্রয়

চেতনাকে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হলেও, সমকালীন মানুষের চিত্তসংকট ও মর্ম যাতনাকে কখনই উপেক্ষা করেন নি। তিনি নিজেও যুগ-সংশয়ের শৈলতটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কবির মানস যন্ত্রণার পরিচয় সমকালের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে বাণীবন্ধ হয়েছে। তবুও তিনি অপরিসীম বিশ্বাস ও অমলিন দৃষ্টি দিয়ে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবনের অন্তরালে যে যন্ত্রণা আত্মগোপন করে আছে, তাকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর গতিশীল অভিব্যক্তিবাদ, প্রাচীন সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে—সামাজিক বিধি-বন্ধনকে গ্রহণ বা দায়ভুক্ত করেনি। উপন্যাস ও ছোট গল্পের চরিত্রে 'কন্‌ভেনস্‌ন্‌' ভাঙার প্রগাঢ় পিপাসা থাকলেও, কুশীলবদের অনুভূতিতে চিরন্তন মানবতাবোধ ও আদর্শ প্রেম অথবা কর্তব্যের উদ্দেশ্যে নিবিড় আগ্রহ আত্মগোপন করে আছে। ফলে, সমকালের অন্য আধুনিক লেখকেরা যেখানে যুগচিন্তার গুরুভারে মন্থর, জীবনের আদর্শহানিতে অবসাদগ্রস্ত, আত্মধর্ম ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে ছন্নছাড়া, সেখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনের আদর্শে বিশ্বাসী, ইমানদারিতে অটল। আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের ছিল এখানেই প্রকাশ্য অভিযোগ যে বিবর্তনবাদী জগৎ ও জীবনধারা রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক প্রত্যয়ের গভীরে কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 'কল্লোল' পত্রিকায় ভবানী ভট্টাচার্য লিখেছিলেন : "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা ; এমন কি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই।"[২৬] কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের অনুগামীরা রবীন্দ্র-বিরোধিতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে আধুনিকোত্তম বলে যে স্বীকার করেছিলেন, তার পরিচয়টি আমরা বুদ্ধদেব বসুর উক্তিতে গ্রহণ করেছি। এ কথা নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য যে পরবর্তীকালে তাঁর যৌবনবন্দনা আরও উদ্দামতার সঙ্গে অনুশীলিত হয়েছিল। উত্তরকালের সাহিত্যিকেরা, যাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে নতুন মার্গে বাংলা কথাসাহিত্যকে পরিচালনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের বাধা-বন্ধনহীন চিন্তাভাবনাতে রবীন্দ্রনাথই জন্মলাভ করেন নতুন রূপে এবং নতুন প্রাণে।

॥ রক্ষণশীল ধারা ও আধুনিকতা ॥

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার যে লক্ষণ নির্ণয় করেছিলেন, তা হ'ল—ব্যক্তির কাছে আপন মনোজগত এবং বিশ্বের যেটুকু অংশ প্রতিভাত হবে, তাকেই তিনি প্রকৃত সত্য বলে গ্রহণ করবেন এবং চিন্তা ও কর্মে করবেন প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান-মনস্কতা ও তীক্ষ্ণ মননশীলতা থেকে জাগ্রত হবে তাঁর আচরণবিধি ও কর্তব্য-চিন্তার প্রকৃত মূল্যবোধ। শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য-ভাবনার পরিবর্তে স্থাপিত হবে ব্যক্তির পৃথিবী এবং রূপায়িত হবে ব্যক্তিগত চিন্তা ও জীবনানুভাবনার মন্থনজাত বিষামৃতের কথা ও কাহিনী।[১]

এই আধুনিক ভাবধারার পাশে পুরানো জগতের প্রাচীন স্রোতধারা আপন স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা নিয়ে বেশ কিছুকাল অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। অবশেষে শরৎ-সঙ্গমে প্রাচীন-নবীন দুই ধারার যুগ্ম বেণীবন্ধন ঘটলেও পরবর্তীকালে কল-মন্দ্র মুখরিত পৃথিবীর নব জাগৃতির তরঙ্গমালার মধ্যে প্রাচীনত্বের বিলুপ্তি ঘটেছিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। আধুনিক সাহিত্যমানস পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রাচীন চিন্তারীতি এবং আদর্শের যে অনুশীলন প্রচেষ্টা, তার স্বরূপ অনুসন্ধান বিশেষ আবশ্যক।

উনিশ শতকের বাঙালী জীবনে বিভিন্ন সংঘাত দেখা দিয়েছিল। এই সংঘাত ছিল মূলতঃ বাঙালীর সনাতন জীবন প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও সর্ব সংস্কারমুক্ত চেতনার। এই সংঘর্ষের ফলশ্রুতি বাংলা সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখাতে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে—কখনো সমর্থন আবার কখনো প্রতিবাদের উগ্র ভঙ্গিমাতে। গত শতকের শেষার্ধে Neo-Hinduism বা নব্য হিন্দুত্বের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার হয়েছিল। এরই ফলে চির পুরাতন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের রীতিবদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধ বাঙালীর জীবনচর্যা ও চিন্তাতে নতুন আকারে রূপায়িত হ'তে শুরু করে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এই নব্য হিন্দুত্বের প্রথম প্রচার হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় চিন্তা ও মতবাদ বাঙালীর কাছে হিন্দু-ধর্মের বিশালতার দিকটি তুলে ধরেছিল। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের শাশ্বত বাণী স্বামী বিবেকানন্দের সাধনায় এবং প্রচারে বিশ্বমুখী ও বিশ্বপ্রসারী হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতি শাখা নব্য হিন্দুত্বের বৈভবে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অত্যধিক আবেগ ও তন্ময়তার ফলে এক প্রকার অন্ধ আনুগত্য সমস্ত কর্ম ও

চিন্তাতে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবণতা দেখা দেয়। এই অকারণ ভাব-বিহ্বলতা প্রমত্ততার রূপ নিয়ে জীবনের সত্য পথ অনুসন্ধানের প্রয়াস ও মননশীল কর্ম-চিন্তাকে বহুলাংশে রুদ্ধ করে দেয়। একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামী মনোভাব, সর্ব সংস্কারমুক্ত চেতনা ও বুদ্ধিবাদী বিচারালোকে জগৎ ও জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়াস এবং অন্যদিকে প্রাচীন বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা ও নীতির কণ্ডূয়ন—দুই বিরোধী মতবাদের সংঘর্ষে বাংলা সাহিত্যের আঙিনা উতরোল হয়ে ওঠে। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের সূচনা পর্বে আধুনিকতার নান্দীকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিম-অনুগামী শিষ্যদের যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল তা ছিল বহুলাংশে ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ ও পরিণতি।

বিংশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর অতীত ও প্রাচীন জীবনাদর্শ পুনরায় আগ্রহভরে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশীয়ানার উগ্র আদর্শবাদ প্রচারে আমাদের ধর্ম-সমাজ ও পরিবারে পৌরাণিক মতবাদগুলি আবার দেখা দিতে শুরু করে। সংরক্ষণ-শীলতাই সমস্ত কিছু আচরণ ও গ্রহণের মধ্যে প্রধানভাবে স্বীকৃতি পেতে থাকে। শিল্প ও সাহিত্যের দরবারেও সংকীর্ণতার ছোঁয়া লাগে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যেটুকু সত্যকার প্রাণ আছে, তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ ও সমর্থন করে উত্তেজনার অহেতুক আতিশয্যকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি কোনদিন রক্ষণশীলতাকে সমর্থন বা প্রচার করেন নি। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে তিনি নিজের মনোভাব নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস এবং সমকালীন নানা ছোট গল্পে যখন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রগতিবাদী মতবাদ ও দুঃসাহসিক কর্মের ইঙ্গিত দেখাতে শুরু করলেন, তখন 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি তাঁর সমালোচনাতে মুখর হয়ে উঠল এবং প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলল অত্যন্ত দৃঢ় শক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মতবাদ ও সবুজের অভিযান প্রসঙ্গে সমালোচনা করে 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন : "সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথের খাসমহল, তাই ইহাতে রবীন্দ্রনাথের খাস খোস-খেয়ালের এত ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ আজকাল প্রহেলিকায় সিদ্ধ হইয়াছেন। যা লেখেন, তাই প্রায় হেঁয়ালী হইয়া যায়। সর্বত্রই এই রূপ, কিন্তু খাসমহলের হেঁয়ালী সকলের সেরা। * * * রবীন্দ্রনাথের ভাবের দৈন্য, ভাষার দৈন্য, রচনার কষ্ট-কল্পনার প্রাচুর্য দেখিয়া দুঃখ হয়। * * * স্টেশনে দুইখানি ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। একখানি চলিল। নিশ্চল স্থবির ট্রেনের যাত্রী ভাবে, আমরা.

চলিতেছি, চলন্ত ট্রেনই দাঁড়াইয়া আছে! রবীন্দ্রনাথেরও সেই অবস্থা। তিনি 'স্বদেশী' হাটে গলদ্‌ঘর্ম ও জব্দ হইয়া, ঘরে ফিরিয়া, ভাল মানুষ হইয়া বসিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, তাঁহাদের অচল আয়তনই চলিতেছে, আর সচল আয়তন দাঁড়াইয়া আছে।"[২]

এছাড়াও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের রচনার বিরূপ সমালোচনা করে 'বিজাতীয়', 'দুর্নীতি-মূলক', 'অবাস্তব' প্রভৃতি বিশেষণে অভিযুক্ত করেন। অবশ্য এ সব আক্রমণাত্মক সমালোচনায় সাহিত্যের প্রকৃত প্রসাদ গুণ ও রস মাধুর্য ছিল না; রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে ব্যক্তি আক্রোশই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

রক্ষণশীলতার ধারা সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করে কেবল রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্যে সীমায়িত হয়নি; এই পর্বে বাংলা সাহিত্যে এক গোষ্ঠী অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে প্রাচীন সংস্কৃতির অনুশীলন করেছিলেন এবং তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলা সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের ভাণ্ডার অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছিল।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাচীন ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমকালীন কয়েকটি সাময়িক পত্র বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বঙ্গবাণী' ইত্যাদি। এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ছিল, দেশ-সমাজ ও পরিবারের প্রচলিত রক্ষণশীলতাকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে জীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অন্বয় সাধন করা। বিষয়বস্তু চয়ন, সংলাপ রচনা ও চরিত্র বিশ্লেষণে একটা পুরানো রীতি ও আঙ্গিকের সঙ্গে সর্বদা ধর্ম ও নৈতিক বিশ্বাসের জয় ঘোষিত হত। ধর্ম বি-নির্ভরতার কোন ঠাঁই ছিল না। এই সমস্ত কথা ও কাহিনীতে 'Poetic Justice' অর্থাৎ পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়, সতীত্বের মহিমা, কৃচ্ছ্রতা সাধনের অনন্ত গৌরব এবং সর্বোপরি পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দানের গরিমা প্রভৃতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত হ'ত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃঢ়তায় যে আত্মানুসন্ধান ও আত্মসমীক্ষা থাকে, চিন্তা ও অনুভূতির তন্তুজাল বয়নে মনের গভীর অবচেতন স্তরের দুর্গম রহস্যালোকে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, সূক্ষ্ম অনুভূতির লীলাচাঞ্চল্যে জীবনের রূপ-নির্মিতির কাঠামো অন্দরমহলের দ্বারকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়—তার কোন প্রকাশ রক্ষণশীল সাহিত্যিকদের বোধ ও বোধি চিন্তাতে ধরা পড়ে নি। 'সাহিত্য' পত্রিকা তাঁদের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে লেখে: "যাহাতে সত্যের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে সমাজের বা সাহিত্যের উপকার আশা করা যায়, সাধারণের অপ্রীতিকর বা আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, তাহার প্রচার করিতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হইব

না।"[৩] অর্থাৎ 'সাহিত্য' পত্রিকা সর্বদা একটি সংরক্ষণশীল মানধর্ম' প্রতিপালনের ব্রত গ্রহণ করেছিল। রক্ষণশীল মনোভাবকে সুরেশচন্দ্র কোনদিন দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ,—প্রেম ও পূর্ব-রাগের বিভিন্ন সমাজগর্হিত চিত্র অঙ্কনে বাঙালীর নৈতিক মান ও মূল্যবোধের অবলুপ্তির অফুরন্ত প্রয়াস। এ বিষয়ে তিনি 'প্রাইভেট টিউটার' গল্পের নায়কের মুখে নিজের মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত করে লিখেছেন ঃ "আমি কখনো এমন কথা বলি না যে প্রেম পাগলামি। আমার বক্তব্য এই যে, ভালবাসা নিয়ে অত নাড়াচাড়া কেন? এই যে কাগজে সব দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে পলিত কেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত নানাবিধ কবির রকমারি প্রেমের খেয়াল পড়া যায়, সে সব কবিতা, সে সব সেণ্টিমেণ্ট্যাল জিনিস জগতে ছড়িয়ে লাভ কী?" সুরেশচন্দ্র ন্যূনাধিক তেরটি গল্প লেখেন। 'সাজি' নামে গল্পসংকলন গ্রন্থে গল্পগুলি সংগৃহীত হয়েছে। কোন গল্পেই সমাজ বিগর্হিত অথবা অবৈধ প্রেমের চিত্র নেই—সর্বত্রই রক্ষণশীল ধারার গতিপ্রবাহ।

'সাহিত্য' পত্রিকায় কেউ কোনখানে আধুনিকতার ক্ষীণ ঢেউ পর্যন্ত তোলেন নি। বিখ্যাত লেখক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'সাহিত্য' সম্পাদকের মত একই পথের পথিক হয়েছেন। তাঁর 'প্রেম মরীচিকা' (১৯০৯) 'হৃদয় শ্মশান' (১৯১৯) গল্পগুলি রক্ষণশীল আদর্শের জন্য বৈচিত্র্যহীন। তাঁর প্রতিভা মূলতঃ সাংবাদিক প্রতিভা। তবে 'সাহিত্য' পত্রিকার বরেণ্য লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯) লেখনীতে আধুনিকতার তরঙ্গ প্রবাহিত না করলেও মানুষের তুচ্ছ অথচ চিরন্তন বৃত্তি ও প্রবৃত্তিসমূহকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি ও চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে জীবনলিপি রচনার মধ্যে তিনি তার অসারত্বের দিকটিকেই প্রস্ফুটিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ দিক থেকে বিচার করলে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আধুনিকতার অনুগামী হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

'নারায়ণ' পত্রিকাতে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হত, তা প্রায় অধিকাংশই ধর্ম এবং ঈশ্বরতত্ত্বজাত। "নমস্তে নারায়ণ! তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসিঅশ্রুময় জীবন, সুখে-দুঃখে পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি। * * * সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি, আর যাহা কিছু সব ত উপলক্ষ্য। * * * নায়ক-নায়িকার যে মাধুর্য রস তাহাও তোমারি পানে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়ক-নায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমো-

মিলন ধন্য হয়। তাহারা হাসি অশ্রুজলে, চুম্বনে পরশে তোমারই মাধুর্য রসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে।"[৪] 'নারায়ণ' পত্রিকার এই স্তবে, জীবন ও জগৎকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার ও বিচার করবার যে প্রবণতা আছে, তাতে ঈশ্বরতত্ত্বের মহনীয় মাধুর্য প্রকাশিত হলেও, ক্ষত লাঞ্ছিত শত অশ্রুধারার বিধৌত রুধিরাক্ত জীবনের চালচিত্র রচনার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। মনে হয়, দৈবী অনুভাবনার মধ্যে একটি পলায়নী মানসিকতা আত্মগোপন করে আছে অথবা স্তব-স্তোত্র মালার মধ্যে জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অস্বীকার করবার চেষ্টা আছে। অবশ্য সম্পাদক (চিত্তরঞ্জন দাশ) তনয়া অপর্ণা দেবী স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'মানুষ চিত্তরঞ্জনে' 'নারায়ণ' পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন: "বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নেবার ও দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে তখন বাংলা সংস্কৃতির আদর ছিল না। বিশেষ করে দেশের সংস্কৃতির দিকে এ সমাজের তেমন দৃষ্টি ছিল না বললেও চলে। তাই বাবা নারায়ণ পত্রিকা বার করে সমাজের এ অংশটিকে সচেতন করার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে একটা নূতন রূপ দিয়ে তার হৃতমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এই পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক-কাব্য, ধর্ম-সংগীত, চারুকলা, সংস্কৃতি, অনুবাদ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্য জাতির সামনে এক নূতন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য রূপকে আবেগহীন অথচ দৃঢ় ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে।"

'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা রবীন্দ্র অনুগামী হলেও দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল: "যতদিন না দেশে শিক্ষার প্রসার বর্ধিত হয় ততদিন সাধারণের মুখ চাহিয়া সাধারণকে আনন্দ ও তৃপ্তি দিবার জন্য, তাহাদের কর্ম-ক্লিষ্ট অবসাদগ্রস্ত প্রাণে সাহিত্যের সজীব সরসতা ঢালিয়া দিবার জন্য সহজবোধ্য ভাষায় কাজের কথা লিখিতে হইবে।...দেশবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্রোন্নতি, অবস্থার উৎকর্ষ সাধন, দারিদ্র্য নিবারণ, অভাব মোচন ও আনন্দ বিধানের জন্য লিখিতে হইবে।...ভাবুকতা চাই বাস্তবের কারণ নির্দেশ করিবার জন্য—ভাবুকতা চাই কর্ম করিবার জন্য। শুধু বাস্তবতা বা শুধু ভাবুকতাকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না; বাস্তবের পূজা করিয়া অতি সুন্দর দেশ পাশ্চাত্য জগতে কি ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ডের সূচনা করিয়াছে তাহা কে না জানে। আবার প্রাচ্য জগতে চীন ও ভারতবর্ষ ভাবুকতার মাদকতায় বিভোর থাকিয়া উন্নতির কতদূর নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা আর কাহাকেও কি বলিয়া দিতে হইবে?

ভাবুকতা ও বাস্তবতার অপূর্ব সম্মিলনে বঙ্গ সাহিত্যে নব প্রয়াগের সৃষ্টি হউক।"[৫] 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা প্রাচীন ও আধুনিক দুই ধারার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিল এবং এই রীতি বহুলাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের মানবহিতবাদী নীতি ও প্রয়োগ কল্পনাকে আশ্রয় করেছিল; যদিও লেখকেরা জানতেন নব জীবনের গানে নতুন যৌবন শক্তিকে বরণ করে নিতেই হবে।

তবে এই প্রাচীন রক্ষণশীল পত্রিকাগুলিতে আধুনিকতার বোধন যে একেবারেই হয় নি তা ঠিক নয়। অনেকেই হয়ত অনাগত কালতরঙ্গ গণনা করতে পারেন নি; অথবা ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে অতীতকে আবেগভরে ধরে রাখতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আধুনিকতার ঢেউ 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকাগুলির তটে আঘাতের মৃদু কম্পন তুলেছিল। সংস্কারমুক্ত বন্ধনহীন জীবনপ্রত্যয়ের আলোকরেখা এই সব রক্ষণশীল পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি গল্পের মধ্যে বিলসিত হতে দেখি। 'নারায়ণ' পত্রিকা যখন প্রগতিশীল 'সবুজপত্র'কে আক্রমণ করে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করছে; বিশেষভাবে অন্যতম লেখক বিপিন চন্দ্র পাল স্বনামে ও ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'র প্যারডি 'মৃণালের কথা' ও 'কল্যাণী' গল্প রচনা করে এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্য গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর' ছোটগল্পের ব্যঙ্গ অনুকৃতি 'দোসরা নম্বর' লিখে হিন্দু রক্ষণশীলতার জয়গান ও জীবনাদর্শ গ্রহণের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছেন, সেই সময়ে "সবুজপত্রের শত্রু সনাতনীদের অস্ত্র নারায়ণের পৃষ্ঠাতেই ঈষৎ পরবর্তী কালের আভাস দেখা দিল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নারায়ণেই প্রথম দেখা দিয়াছিলেন।"[৬] তাঁর 'ঠানদিদি' (১৯১৮) গল্পটির 'নারায়ণ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ একটি চমকপ্রদ ঘটনা। এ ছাড়াও 'নারায়ণে' প্রকাশিত কয়েকটি গল্পে আধুনিকতার সুর বিশেষভাবে অনুরণিত হতে দেখি। প্রচলিত সামাজিক নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের সীমা অতিক্রমণের প্রয়াস 'মরণে জয়' (১৩২২) ও 'হাসির দাম' (১৩২২) কথানাট্যগুলিতে এবং 'ডালিম' (১৩২১), 'আঁধার ঘরে' (১৩২২), 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' (১৩২২) প্রভৃতি ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি গল্পের লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। পরবর্তীকালে অতি আধুনিক সম্প্রদায়ের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অশেষ। সজনীকান্ত দাস এ বিষয়ে বলেছেন: "সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ছিলেন, জগদীশ গুপ্ত, যুবনাশ্ব, অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বসুর পূর্বগামী।"[৭] 'মরণে জয়' কথানাট্যে নারীর পতিতারূপের অন্তরালে গৃহ-প্রেম পিয়াসী চিরন্তন মানবী রূপটি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার মধ্যে ধরা পড়েছে লেখকের কল্পনার তুলিতে।

বারাঙ্গনা আজুর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুস্থ পারিবারিক জীবনে নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বারাঙ্গনা জীবনের কৃত্রিম হাসিকান্নার অভিনয়, অথচ অন্তরে অন্তরে এই জীবনাচরণের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা—সমস্ত কিছু একযোগে কথানাট্যটিকে নিষ্করুণ ট্র্যাজেডির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লেখক সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত এও দেখিয়েছেন, অত্যধিক মদ্যপান ও বারাঙ্গনা আসক্তির ফলে শান্তশ্রী পরিমণ্ডিত গৃহকোণ ও লক্ষ্মীশ্রী পরিমণ্ডিত গৃহবধূর আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে উষর মরুর সর্বগ্রাসী পরিণামের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তাঁর 'হাসির দাম' কথানাট্যতেও নারীর গার্হস্থ্য জীবনপিপাসা ও পারিবারিক স্নেহের প্রতি ব্যাকুল আকুতি ফুটে উঠেছে।

'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডালিম' গল্পটিতে বারাঙ্গনা রমণীর প্রেমকে ত্যাগের মধ্যে মহীয়ান্ করে দেখাবার চেষ্টা আছে। এই গল্পে চিরন্তন নীতি ও সামাজিক বিধানের যূপকাষ্ঠে জীবন-বলিদানের যে যন্ত্রণা নারীর জীবনকে আত্ম-নিগ্রহ ও নিষ্করুণ মর্মপ্রদাহের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দেয়, অথচ মনের মণিকোঠায় সুস্থ জীবন ও চিরন্তন প্রেমের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা নিঃশব্দে নীরবে জাগ্রত থেকে সীমাহীন হতাশার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তার করুণ কাহিনী অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে লেখক তুলে ধরেছেন। 'দরদিয়া' (১৩২২, ভাদ্র) গল্পে তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় নারীমুক্তির কামনাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। হিন্দু বিধবার জীবনে অপরিমিত লাঞ্ছনার মধ্যেও নারীত্বের বিকাশ আত্মোপলব্ধির চেতনাতে যে সম্ভব, তার চিত্র এখানে আছে। "আমি রমণী, আমি মানুষ। এই দুইকে কি আমার বৈধব্য একা বাধা দিতে পারে? আমার সকল বাঁধন দূর হইয়া গেল। আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।" নারী ব্যক্তিত্বের এই জাগৃতি আধুনিকতার বোধন, সমাজ ও সাহিত্যের উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ চিন্তার মৃত্যুহীন বাণী। 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত আধুনিক জীবন-চিন্তাসমৃদ্ধ যে সমস্ত গল্প প্রকাশিত হয়েছে, তাতে প্রায় প্রত্যেক নায়িকাই প্রকারান্তরে অত্যন্ত সৎ ও সাধ্বী রমণী। জীবনের ভাগ্যবিপর্যয়ে এবং সামাজিক বিধানের রূঢ়চাপে তারা অনন্যোপায় হয়ে বারাঙ্গনার নিন্দনীয় জীবিকা গ্রহণ করলেও তাদের অন্তর সর্বদাই নির্মল ও স্বচ্ছ। কোন মলিনতার ছোঁয়া তাতে নেই। মনে হয় সেকালে জীবন সম্পর্কে যে নতুন convention সমাজের বুকে জেগে উঠেছিল, তাকে অস্বীকার করা সংরক্ষণপন্থী 'নারায়ণ' পত্রিকার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যদিও 'ডালিম', 'মরণে জয়', 'হাসির দাম', 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রভৃতি গল্প ও কথানাট্যগুলিকে আক্রমণ করে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওই পত্রিকায় 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।[৮]

এ ছাড়া আমরা 'নারায়ণ' পত্রিকাতে আধুনিক চিন্তাবৈশিষ্ট্যের প্রগতিশীল অনুভাব ও শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টির প্রয়াস ফুটে উঠতে দেখতে পাই। 'বাঁশুরিয়া' (১৩২২) গল্পে সাধারণ বংশীবাদক যুবকের সঙ্গে রাজকন্যার যে প্রেম-চিত্রণ, তা অনুরূপভাবের রূপ ও রূপায়ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। 'নারায়ণ' পত্রিকার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রবিরোধিতা ফুটে উঠলেও, নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি, সামাজিক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সর্বভূতে মানবপ্রেমের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আধুনিক চিন্তাগুলি মাঝে মাঝে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

এখন বাংলা কথাসাহিত্যে যে রক্ষণশীল ধারা আধুনিকতার থেকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘ প্রচলিত বিশ্বাস, সামাজিক নীতিবোধ ও হিন্দুধর্মের সনাতন আদর্শে দেশবাসীর জীবনচিন্তায় বাঁধ দিয়ে সমস্ত রকম প্লাবন থেকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছিল, তার স্বল্প পরিচয় নেওয়া যাক।

সমকালে প্রচলিত নীতিবোধ ও সমাজ আনুগত্যের প্রতি প্রীতি এবং আন্তরিকতার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২)। ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও* তিনি দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীনতা তথা রক্ষণশীলতার অনুপন্থী ছিলেন। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা রবীন্দ্রানুরাগী হলেও সংরক্ষণশীল মনোভাবকে পরিত্যাগ করতে পারে নি এবং এই গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক প্রভাতকুমারও চিন্তা ও মননশীলতায় বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বরণ করে নিয়েছিলেন। বিংশ শতকের ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকেই বিশ্বসাহিত্যে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, তীক্ষ্ণ মননশীলতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য বিচিন্তাতে নতুন সুরের যে আলাপন উঠেছিল, প্রভাতকুমারের শিল্পী ব্যক্তিত্বের উপর তার কোন প্রভাব বিশেষভাবে পড়েনি। তিনি কোন সংস্কার ছিন্ন করে নতুন করে জীবনসত্যের অনুসন্ধান করেন নি। সমাজস্থিতির প্রতি আনুগত্যই প্রভাতকুমারের শিল্পী জীবনের প্রধান পরিচয়।

---

* "রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদয়বাঁধে একটু ছিদ্র থাকে সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড়, আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর যাহার হৃদয় বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোন ল্যাঠাই নাই; তাহার ভিতর এক ফোঁটাও জল প্রবেশ করিতে পারে না, এমন লোকে তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা ত করিবেই।"

দাসী: মে, ১৮৯৬।

যুগের জীবনযন্ত্রণা বা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘর্ষ প্রভাত-সাহিত্যে না থাকায়, তাঁর শ্লেষ চাবুকে পরিণত না হয়ে জীবনের লঘু অংশকেই প্রধানভাবে আশ্রয় করে শরৎকালীন আকাশের শুভ্র খণ্ড খণ্ড মেঘপুঞ্জের মতো ভেসে ভেসে নানা বর্ণালীর বিচিত্রতা সৃষ্টি করেছে। তাই প্রভাতকুমারের কথাসাহিত্য যেকোন মানুষের পক্ষে চিত্ত বিনোদনের অতি উপাদেয় উপকরণ। তাঁর কৌতুকরস নির্মল হাসির উপচার, তাঁর কারুণ্য পাঠকের হৃদয়ের উপর ক্ষণিকের মেঘচ্ছন্ন ছায়া।৯ প্রভাতকুমারের জীবনানুভূতি ও সাহিত্যচিন্তার প্রধান কথা—'সহজ সুরে সহজ কথা' বলবার আন্তরিক প্রবণতা। এই দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা সাহিত্যের সমকালীন হতাশা, সমস্যা ও সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। অতীতের বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারাতে রোম্যান্সের পাল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে পারাপার করেছে তাঁর সাহিত্য-তরণী।

প্রভাতকুমার বঙ্কিমচন্দ্রের মত দৃষ্টিভঙ্গীতে রোম্যান্টিক ছিলেন। পটভূমি গ্রহণ, রচনা রীতি এবং বিন্যাস প্রভৃতিতে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের পার্থক্য থাকলেও, প্রভাতকুমারের সাহিত্যচিন্তা বাস্তব ও রোম্যান্সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অগ্রসর হয়েছে, কোথাও কোন বিরোধ বাধে নি। বিষয়বস্তু চয়নে একান্তভাবে তিনি ইতিহাস নিরপেক্ষতার পরিচয় দিলেও, তাঁর উপন্যাসে রোম্যান্সের ছায়াপাত ঘটেছে আকস্মিক ঘটনা সংঘটনে, কৌতুককর পরিস্থিতি রচনায় এবং রমণীয় পরিসমাপ্তির মাধ্যমে। তাই মনে হয় তাঁর সাহিত্য দৃষ্টি প্রধানতঃ "সহজ আনন্দ ও কৌতুকরস স্নিগ্ধ দৃষ্টি—সে দৃষ্টির সম্মুখে যে জীবন প্রসারিত, সেখানে সমস্যা নেই এমন নয়, কিন্তু তা কখনও :আয়ত্তের অতীত নয়। রূপকথার কিংবা মধ্যযুগীয় দৈবনির্ভর আখ্যানকাব্যের কাহিনী-পরিণামের মত সেখানেও দৈবকৃপায় অপ্রত্যাশিত-ভাবে সকল সমস্যার অতি সহজ সমাধান হয়ে যায়।"১০

বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ ছিলেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'চোখের বালি' (১৯০২) উপন্যাস ঘটনানির্ভর না হয়ে বিশ্লেষণাত্মক রীতি গ্রহণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের কথা স্মৃতিপটে রেখেও এ সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের রূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থায়ী সূচনা করেছিল। আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক শরৎচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন আলো এসে যেন চোখে পড়লো।...কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।"১১ সমকালে প্রায় সমস্ত প্রগতিবাদী শিল্পীরা 'চোখের বালি' উপন্যাস

থেকে আধুনিকতার দীক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রভাত-কুমার এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ বোধ করেন নি। তাঁর কোন রচনাতে এর প্রভাব নেই—বরং 'চোখের বালি'র ঘটনা বিন্যাশগত অবাস্তবতা ও অসঙ্গতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল অধিক পরিমাণে। প্রভাতকুমারের রক্ষণশীল মনোভাব ও আধুনিক বিমুখতার উদাহরণ হিসাবে নিম্নের পত্রখানির কিয়দংশ উধৃতি নেওয়া আবশ্যক।

"........বিনোদিনীর বয়স একটু বাড়ানো আবশ্যক বটে। বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে যেরূপভাবে মেলামেশা করিতেছে, তাহা হিন্দু পরিবারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কচি বউদিদিরা বয়েস বেশী বড় দেবরের সঙ্গে যদিও কথাবার্তা কয় তাহা একান্ত সংকুচিতভাবে। বিবাহের পূর্ব হইতেই মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনো-দিনীর আলাপ ছিল করিলে কেমন হয়? তাহা হইলে বিনোদিনীর 'বিনোদত্ব'ও বজায় থাকে। ......আর একটা কথা। কাশীতে আশাকে বিরহবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ত্বরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য মহিম যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার মাসিমা সে পত্র দেখিলেন কেমন করিয়া? আশা লজ্জায় জড়সড়, মাসিমাকে গিয়া থোড়াই সে চিঠিখানা দেখাইয়াছে!

নাইট ডিউটির খাতিরে বাক্স পেঁটরা বিছানাপত্র লইয়া মেডিকেল কলেজের ছাত্রের হাসপাতালে গিয়া বাসা বাঁধা সম্ভব কিনা একবার সংবাদ লইলে ভাল হয়। কোনও ছাত্র যে হাসপাতালে ডেরাডান্ডা করে এরূপ শুনি নাই। সে রকম কোনও বন্দোবস্ত আছে কিনা সন্দেহ।"[১২] প্রভাতকুমার ঘটনাপরম্পরার মধ্যে চরিত্র ও কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে উৎসুক ছিলেন বলে objectivity-র মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাহিনীবিন্যাসের ত্রুটি অনুসন্ধান করেছেন—অন্তরের গভীরতার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ও জীবনের বিকাশ খোঁজেন নি। প্রভাতকুমার উপলব্ধি করেননি যে, "সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।"[১৩]

প্রভাতকুমার কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে বঙ্কিমের 'অনুগামী দাস' ছিলেন। তাঁর প্লট-পরিকল্পনা, সংলাপ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি জীবনদৃষ্টি ভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত সচেতনভাবে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন একনিষ্ঠ পূজারীর মত। তাঁর 'সিন্দুর-কৌটা'(১৯১৯) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। নায়িকা বকুরাণীর চরিত্রটিতে সূর্যমুখীর ছায়াপাত ঘটেছে। এছাড়া 'সতীর পতি' (১৯২৮) ও 'গরীব স্বামী' (১৯৩৮) উপন্যাসগুলিতে যথাক্রমে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) ও 'দেবীচৌধুরানী'র (১৮৮৫) প্রভাবও দুর্লভ নয়। সংলাপের ক্ষেত্রেও

প্রভাতকুমার তাঁর 'মনের মানুষ' (১৯২১) ও 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারা অনুসরণ করেছেন। প্রভাতকুমারের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা বঙ্কিমী চিন্তায় ঋদ্ধ, কথায় কথায় বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্ধৃতি হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেন। তাঁর নারী চরিত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবাহিতা নারী চরিত্রগুলির মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। কুমারী চরিত্রগুলির মধ্যে স্বামী নির্বাচন বিষয়ে স্বাধীন মতামত গ্রহণের পরিচয় দেখা যায়। প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তাঁর কোন উপন্যাসে নেই। প্রভাতকুমারের পারিবারিক জীবনচিন্তা গার্হস্থ্য বেদীমূলে আসন পেতেছিল এবং সংসারধর্মের নানা কর্তব্যকর্মের অন্তরালে নারীর আত্মবিলুপ্তিকেই তিনি নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করতেন। হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কল্যাণব্রত প্রতিপালনই নারীর আবশ্যিক কর্তব্য —এই ভারত বাক্যে স্থির বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাঁর প্রত্যেক নারী চরিত্র বিবাহোত্তর কালে স্বামীর সংসারে অবগুণ্ঠিতা সর্বংসহা গৃহবধূতে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, "হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুশাস্ত্র তাদের যা শিক্ষা দিয়ে এসেছে, তা কি দুখানা আধুনিক নভেল আর মাসিক পত্রে ইবসেনের দুটো বদ তর্জমা পড়েই বদলে যাবে!" (সিঁদুর-কোটা)

আধুনিক সাহিত্যের প্রতি কটাক্ষপাত প্রভাতকুমারের ছোটগল্পেও প্রতিফলিত হয়েছে সমানভাবে। 'বিনোদিনীর আত্মকথা' গল্পে প্রভাতমানসের অভ্রান্ত নির্দেশ পাই: "আজকালকার বড় বড় লেখকদের মতে, বঙ্কিমবাবু নিতান্তই সেকেলে লেখক। প্রাণ যাহাকে চায়, যাহাকে লাভ করিতে পারিলেই নারীর 'নারীত্ব' সফল হয়, সকল যুবতীরই এই বিষয়ে যত্নবতী হওয়া উচিত। নবযুগের নবীন আলোক আমদানীকারক এই ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে কাহারও হস্তে যদি 'চন্দ্রশেখর' সংশোধনের ভার থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই গভীর জলে সন্তরণকালে প্রতাপকে দিয়া শৈবলিনীকে ওরূপ দারুণ শপথ করাইতেন না। তাহাদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়া কোনও নিভৃত কুটীরে স্থাপন করিয়া আর্টের নন্দচিত্র আঁকিয়া অর্ধশিক্ষিত যুবক বোধহয় বিদ্যাবতী যুবতীগণকে মোহিত করিয়া দিতেন।"

অথবা,

"আমি কয়েকখানি আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়িয়াছি, তাহাতে লেখকগণ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিলেই যথার্থ বিবাহ হয় না, পরস্পরের প্রেম থাকিলেই তাহাই আসল বিবাহ। যে নরনারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, কেবলমাত্র লৌকিক বিবাহ বন্ধনই যাহাদের একমাত্র বন্ধন, তাহাদের

পারস্পরিক সাহচর্যকে একটা অতি কদর্য আখ্যা দিয়াছেন। প্রেমের মিলনটাই তাঁহারা যথার্থ মিলন বলিয়া মনে করেন।" (হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প)

কিংবা,

"প্রেমহীন বিবাহে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও সতীত্ব রক্ষার প্রবৃত্তি নারী চিত্তের সেকেলে অন্ধ সংস্কার মাত্র।" (তদেব)

মনুস্মৃতি অনুশাসিত ভারতবর্ষ নারীর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে কোনদিন কল্যাণকর মনে করে নি। প্রভাতকুমারও এই প্রাচীন আদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রম ও দাম্পত্য জীবনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। "আমাদের ধর্ম, আমাদের শাস্ত্র বহু শতাব্দী ধরিয়া উপদেশ ও অনুশাসনের ধারায় হিন্দু রমণীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বটুকু লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন······ কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিলে নগেন্দ্রনাথ সুখী হইবেন সুতরাং সূর্যমুখী নিজেই তাহার উদ্যোগিনী হইলেন। আপনার সুখ-দুঃখ গণনার মধ্যেই আনিলেন না। তিনি স্বামীকে বলিলেন না, তুমি আমায় অপমান করিতেছ। যেখানে আমিই নাই, সেখানে মানই বা কি, অপমানই বা কি? আমাদের দেশে সকল স্ত্রী সূর্যমুখী তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু আদর্শ তাহাই।" (ইংরাজ রমণী)

বঙ্কিমচন্দ্রকে দোহাই দিয়ে সর্বত্র হিন্দু সনাতন আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্যে প্রভাতমানসের স্বরূপ ব্যক্ত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার রূপ ও প্রকৃতি যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হয়নি তাঁর ধ্যান ও ধারণাতে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যচিন্তাতে আদর্শবাদকে গ্রহণ করেছিলেন সত্য; নীতিজ্ঞানের প্রাধান্য বিস্তার করে ও সাহিত্যের মধ্যে সংযমের রাশ পরিয়ে তিনি জীবনের নানা উন্মার্গ-গামিতাকে শাসন করে হিন্দুধর্ম ও তার পারিবারিক নিয়মকে দৃঢ়ভাবে সংসার মূলে প্রতিষ্ঠিত করেলেও, কোথাও জীবনকে অস্বীকার করেন নি। মনে হয়, অন্ধ অনুকরণপন্থীরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবোধ ও বোধির কোন পরিচয় রাখেন নি। তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্যে যে গভীর সহানুভূতি,প্রেম ও প্রত্যয়নিষ্ঠ অনুভাবনা এবং জীবন-রসরসিকতা বর্তমান আছে, তার দিকে দৃষ্টি না রেখে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার অনুবর্তন দিকটিকেই তৎকালীন প্রাচীনতার অনুগামী ও সমালোচকেরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু জীবনের কণ্টকলাঞ্ছিত ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে সমাজের অনড় নিয়ম ও স্থির অনুশাসন নীতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন, তারই চিত্র তাঁর উপন্যাসগুলি। রূঢ় সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তনে আবদ্ধ জীবনের করুণ ক্রন্দনকে মেঘ মেদুরতায় সিক্ত করে অনন্ত আকাশের বিশাল সীমানায় ছড়িয়ে দিয়ে সকল সমস্যা সমাধানের যে উত্তর তিনি

খ‌ুঁজেছিলেন, তার কোন খবর সে সময় কেউ রাখেন নি। সমাজ বড় না জীবন শ্রেষ্ঠ—এর কোন সমাধান বিশ্লেষণ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—দুইয়ের সংঘাতে জীবনের আর্তিকে শোনা ও প্রকাশ করাই তাঁর প্রয়াস ছিল। নারী জাতির যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রভাতকুমার বঙ্কিমাদর্শে উপেক্ষা করেছেন, তার স্থায়ী নিদর্শন বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। অরণ্যকন্যা কপালকুণ্ডলা বলেছেন, "যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তাতে সর্বদাই একটি মঙ্গলময় আদর্শ বর্তমান থাকত। মঙ্গলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি সাহিত্যসৃষ্টিকে অপরাধ বলে গণ্য করতেন। কিন্তু মঙ্গলচিন্তা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি জীবনকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি সমাজধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে সঙ্গতি, সমন্বয় বা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্রতী ছিলেন। তাঁর সাহিত্য বিচিন্তাতে আদর্শবাদের যে বিকাশ আছে, তার পটভূমিতে রয়েছে বৃহত্তর জীবনবোধ। এই বৃহত্তর জীবনকে সার্থক করে তোলবার জন্য প্রেমের একাধিপত্য ও একক দাবি বর্জন করা যে একান্ত প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র এই লোকহিতাদর্শে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। "নিরন্তর ত্যাগের পুটপাকেই প্রেমের বিশুদ্ধি। যে প্রেমের লক্ষ্য শুধু আত্মসুখ, প্রাচীর ঘেরা একটি সংকীর্ণতম পরিধিতে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে থাকে যাহার আবর্ত, সে প্রেম যে শুধু জগতের মঙ্গলের অন্তরায় তাহা নহে, তাহা আত্মজীবনের সুখ ও মঙ্গলেরও অন্তরায়। ত্যাগের অনলে পড়িয়া যে প্রেম মঙ্গলের ঔজ্জ্বল্য লাভ করে নাই, সে প্রেম কখনও বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করে নাই। দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রেও তিনি প্রেমের এই আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। * * *

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ভিতরেও দেখিতে পাই, প্রেম যেখানে ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির সহিত অবিরোধে চলিতে নারাজ, সেখানে সে বৃহত্তর জীবনের মঙ্গলেরও একান্ত পরিপন্থী, সেখানে তিনি তাহাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিম মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়ধর্মকে কোনদিন অস্বীকার করেন নাই,—নিষ্ঠুর বিচারকের ন্যায় তাহার শিরোদেশে পাপের শিরোনামাও আঁটিয়া দেন নাই।··হৃদয়ধর্মের দুর্বলতার প্রতি তাঁহার ছিল অসীম সহানুভূতি,—যেটুকু উপালম্ভ আমরা দেখিতে পাই, তাহা সহবেদনে অশ্রুসিক্ত।"[১৪] ফলে, প্রভাতকুমারের 'বিনোদিনীর আত্মকথা' ছোটগল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র যে সমীক্ষা দেখতে পাই, তা বহুলাংশে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার প্রতিফলন। বিনোদিনীর কথায়ঃ "এই সময় 'চন্দ্রশেখর' পুস্তকখানি আমার হাতে

পড়িল। ··বইখানি পড়িয়া দেখিলাম, আমার অবস্থার সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়। কপালদোষে বিবাহের পূর্বেই কোন মেয়ের যদি অন্য পুরুষের প্রতি মন গিয়া থাকে, তবে বিবাহের পর তাহার কর্তব্য কি, তাহা চন্দ্রশেখর পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম। অধিকাংশ হিন্দু মেয়েই পতিভক্তি বিনা সাধনায় লাভ করিয়া থাকে বটে. কিন্তু আমার মত দুর্ভাগিনী যাহারা, তাহাদের ঐ বস্তুটি লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনায় রত হইতে হইবে,—হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ইহাই চন্দ্রশেখরের উপদেশ বলিয়া বুঝিলাম এবং তদনুসারেই নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিব স্থির করিলাম।” কিন্তু প্রভাতকুমারের এই ব্যাখ্যা জীবন ও সাহিত্যের রসবিচার নয়—নীতি-অনুশাসিত শাস্ত্রবিশ্বাসে বিশ্বাসী রক্ষণশীল ভাবনার আত্মতুষ্টির মনঃবিশ্লেষণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই জীবননীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। যদিও বৃহত্তর জীবনাদর্শের প্রয়োজনের জন্য তিনি নীতিধর্মের জয়গান গেয়েছিলেন। বিবাহিতা রমণীর প্রেম বৃহত্তর জীবনের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া প্রয়োজন। স্বামী ও সংসার তারই উপচার। যদি কোনও কারণে পূর্বপ্রেম চিত্তে জাগরূক থাকে, তাকে সংযমের শাসনে আবদ্ধ করে অন্তর্মুখী করা একান্ত দরকার। প্রেম বহির্মুখী হলে বাধে ভীষণ দ্বন্দ্ব—তাতে স্বামীও যায়, সংসারও যায়, সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে—পারিবারিক ধর্মের অধঃপতন ও অপমৃত্যু ঘটে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক জীবনের পুণ্য বেদীতলেই তাঁর সাহিত্য সাধনার আসনখানি বিছিয়েছিলেন, কোন কারণেই এর পবিত্রতা ক্ষুন্ন করতে চাইতেন না। তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান, তা এই ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সমাজ ও পারিবারিক জীবনের প্রকাশ্য নিয়ম-নীতির কঠোরতার অন্তরালে হৃদয়ধর্মের যে বিশালতা শত নিষ্করুণ অত্যাচারে অম্লান ও অপরাজেয়, তাকেও তিনি সহানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করে তার কপালে অমরত্বের জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছেন। অপরিপূর্ণ ভালবাসার ব্যাকুল কামনা তীব্র গতিবেগে কিভাবে নারীর জীবনকে ছন্নাকার করে দেয়, জীবনের একূল-ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে টেনে নিয়ে যায়,তারই চিত্র—শৈবলিনী। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমকে জীবনের অসঙ্গত দাবির উপর মাথা তুলতে দেননি। শৈবলিনী ত্যাগাদর্শে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য প্রেমকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি, তাই তার পরিণতি এত ভয়াবহ, এত করুণ। বঙ্কিমচন্দ্র আরও একদিক থেকে দেখিয়েছেন যে শৈবলিনীর জীবনের যে পরিণতি, তার বীজ তার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন আত্মসংযম ও একনিষ্ঠা—সর্বোপরি বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আত্মত্যাগ। শৈবলিনী প্রতাপের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগিণী হলেও তার সদাসতর্ক

মনোভাব, দ্বিধাচঞ্চল চিত্ত, অন্যায় কৌতূহলের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এবং গৃহত্যাগ,—সমস্ত কিছু একযোগে তার পতনের কাহিনীকে ত্বরান্বিত করে তুলেছে। জীবনাচরণে সংশয়বাদিতাই তার জীবনবিমুখতার একমাত্র কারণ বলে মনে হয়। বিবাহোত্তর জীবনে সে পূর্ব প্রেমকে বিস্মৃত অথবা অন্তর্মুখী করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। এ ছাড়াও শৈবলিনীর চরিত্রে 'বোহেমিনিজমে'র বীজও ছিল আংশিকভাবে—জীবনের বহির্মুখ ভাবনার প্রতি অনুরাগ তার চরিত্রের প্রাকৃত দিক হওয়ার জন্য দুর্ঘটনা সর্বদাই সহচর হয়ে পাশে পাশে ফিরেছে। প্রভাতকুমার এবং সমকালীন প্রাচীন সংরক্ষণ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনানুভূতির এই শৈল্পিক দিকটি বুঝতে পারেন নি। বঙ্কিম-সাহিত্যের বহিরঙ্গের মৃন্ময়ী-মূর্তিকেই তাঁরা চিন্ময়ী মূর্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি জীবনকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে মৃন্ময়ী মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চিরন্তন কালের যে শাশ্বত প্রতিমা নির্মাণ করে গেছেন, তাকে উপলব্ধি করার মত মন ও প্রবণতা তাঁদের বোধ হয় ছিল না।

প্রভাতকুমার কোন জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে চাননি। হিন্দু সমাজের ও পরিবারের প্রচলিত মূল্যবোধগুলিকে তিনি সহজে মেনে অথবা স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই, কোথাও কোন চিন্তার উর্ণনাভ সমস্যার জটিল তন্তুজাল বয়ন করতে পারে নি। তবে তিনি কোন কোন গল্পে অন্ধ বিশ্বাস ও নৈতিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবনার পরিচয় রেখেছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'দেবী' ও 'কাশী বাসিনী' গল্পগুলির উল্লেখ করতে পারি। প্রভাতকুমারের রক্ষণশীল মনোভাব এখানে বিদ্রোহী হয়েছে। এই গল্পদুটিতে প্রভাতকুমারের মানবপ্রীতির অকুণ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। পতিতা নারীর অন্তর্বেদনার মধ্যে যে মাধুর্য ও পবিত্রতা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচারক' (১৩০১) গল্পে প্রথম দেখান। প্রভাতকুমার সেই ধারারই অনুসরণ করেন। "কাশীবাসিনীতে শরৎ সাহিত্যের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।"[১৫] সমালোচকের এই মন্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। 'দেবী' ছোট গল্পটি মনে হয় প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গল্পের উপাদান ও পরিকল্পনা তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।* "প্রভাতকুমার সহজ পথের যাত্রী—তাঁর কল্পনা বস্তুনির্ভর। কিন্তু এই গল্পটির সমস্যা কবি মননজাত এমন একটি

---

*"'দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে দান করিয়াছিলেন। এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই, এখন করিলাম।"—নব কথা (২য় সংস্করণ) : ভূমিকা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঊর্ধ্বগামী কল্পনাকে আশ্রয় করেছে—যা থেকে 'মহামায়া' জাতীয় গল্পের উদ্ভব সম্ভব।"[১৬] তাঁর 'অলকা' গল্পেও সংস্কারমুক্ত মনের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রভাতকুমারের সাহিত্যে সমাজের রক্ষণশীলতার উপরে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিজয় ঘোষণার চিত্র যে খুবই বলিষ্ঠ অথবা তীব্র গতিবেগ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন কথা বলা চলে না। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ ঘটছে, সমাজের দৃঢ় অচলায়তনকে ভেঙ্গে মানুষের মনকে বিশ্বপ্রসারী করে তোলবার প্রচেষ্টা সমস্ত জগৎ জুড়ে শুরু হয়েছে,—বোধকরি প্রভাতকুমার একথাও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যে একেবারে পরিবর্তন-পিয়াসী ছিলেন না তা নয়, তবে এই পরিমার্জন ধীরে ধীরে সমাজের কাঠামোকে ধূলিসাৎ না করে আসুক, এই ছিল তাঁর কামনা। প্রভাতকুমারের ব্যাপক অন্বেষা ও জীবনপ্রীতির মূল তত্ত্ব তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে, তীক্ষ্ন বিশ্লেষণী আলোকে আমাদের তা উপলব্ধি করে নিতে হবে।

এসব সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন চিন্তা ও নিয়মনীতির পুচ্ছগ্রাহিতা করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য রচনার ভাস্বর লগ্নেই নব্যপন্থীরা সাহিত্যের মধ্যে যে গতানুগতিকতা ও প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তেজষ্ক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রতি তিনি কোন আকর্ষণ অনুভব করেন নি। নতুন কালের ভেরী তাঁকে চঞ্চল করে তোলে নি। এমন কি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাতে জীবনের যে পরিচয় নতুনকালের সাহিত্যিকেরা চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন, প্রভাতকুমার সে বিষয়েও পূর্ণ সফলকাম হন নি। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, স্বদেশী আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক অথবা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তাঁর কাহিনীর উপকরণ ও উপচার সরবরাহ করলেও, কোথাও প্রভাত-কুমারের আধুনিক মনটি চিত্রিত হয় নি। সর্বত্রই সেই রক্ষণশীল মনোচেতনার অবাধ কণ্ডুয়ন। উদাহরণ হিসাবে আমরা তাঁর 'খালাস', 'মাদুলী', 'বি-এ পাস কয়েদী' প্রভৃতির নাম করতে পারি। তবে 'হীরালাল' ও 'পোষ্টমাস্টার' ছোটগল্পে বিবাহিতা নারীর পরকীয় প্রেম ও বিধবা নারীর সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম বর্ণনাতে আধুনিকতার ছাপ অস্পষ্ট আকারে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে 'হীরালাল' গল্পে বিবাহিতা রমণীর পদস্খলনের চিত্র বর্ণনা, স্বামীর জীবননাশের জন্য বিষ সংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্যে ফরাসী সাহিত্যের 'naturalism'-এর বহিঃপ্রকাশ আছে।

প্রভাতকুমারের রচনাতে নীতিবোধ অর্থাৎ পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয়, সতীত্ব-বোধের মাহাত্ম্য ঘোষণা প্রভৃতি আদর্শবাদী চিন্তার প্রাধান্য থাকলেও মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসায় তাঁর শিল্পীমন ছিল ভরপুর। বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের

সংস্পর্শে এসে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন। মানুষের বাস্তব দুঃখ, অসঙ্গতিপূর্ণ নানা ক্রিয়া বৈচিত্র্য, জীবনের দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা তাঁর চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। সুগভীর বাস্তব অভিজ্ঞতার তুলিতে তাঁর কথাসাহিত্য কখনো কল্পনার উচ্চাকাশে পক্ষবিহার করেনি। এ কারণেই প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসে ঘটনার আধিক্য অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

কিন্তু প্রভাতকুমারের শিল্পীমানস মানবিক সমবেদনা ও প্রীতিরসে জারিত হলেও রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের মতো মানুষের হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে চরিত্র রহস্যের অনুসন্ধান করতে পারে নি। তিনি যেন জীবনচিন্তার উপরিতলে বিচরণ করেছেন। তবুও তাঁর গল্পগুলিতে এমন একটি বিশেষ জীবনতত্ত্ব আছে, যেখানে মানুষের বিকাশ নানা অসম্পূর্ণতা নিয়েও প্রাণোচ্ছল, সতেজ ও জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ। এ কারণেই প্রভাতকুমারের কৌতুকরস সহানুভূতির সমবেদনাতে স্নিগ্ধ. হাসি-কান্নার দোল-দোলানোতে সরস ও শ্রীমণ্ডিত। এ ছাড়াও তাঁর ছোট গল্প-গুলিতে যে অসাধারণ সংযম ও সংহতিবোধের পরিচয় পাই.তাতেই তাঁর শিল্পকলার ঐশ্বর্যরূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। জীবনের কথা তিনি সহজভাবে সহজ সুরে বলেছিলেন বলেই আধুনিক লেখকেরা তাঁকে কখনও অশ্রদ্ধা করে দূরে ঠেলে দিতে পারেন নি। "তাঁহার গল্পগুলিতে যে শান্ত শ্রী ও সরসতা আছে তাহা চিরকালের রসগ্রাহীর উপভোগ্য হইয়া থাকিবে।"[১৭]—জগদীশ গুপ্তের এই স্বীকৃতি প্রভাত-কুমারের আধুনিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বড় পাওনা বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রাচীনতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রক্ষণশীলতার অনুবর্তন মহিলা ঔপন্যা-সিকদের মধ্যেও দেখতে পাই। অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) ও নিরূপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১) কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে পুরানো সমাজচিন্তা ও নীতিনিষ্ঠ পারি-বারিক জীবনবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। এই দুই লেখিকার মধ্যে সর্বদা ভারতীয় চিন্তা ও কৃষ্টির ঐতিহ্যমণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ নারীর গার্হস্থ্য জীবনাদর্শকে পারিবারিক চিন্তার বেদীমূলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কর্তব্যনিষ্ঠ প্রেম-মধুর দাম্পত্য জীবনানু-ভাবনাকে তাঁরা মর্যাদার সঙ্গে নর-নারীর চিন্তায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। ফলে, তাঁদের উপন্যাসের প্রতি ক্ষেত্রেই আদর্শবতী, ত্যাগপূত মহিমময়ী নারী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অনুরূপা দেবী তাঁর সাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পরিষ্কারভাবে লিখেছেন ঃ "মেয়েরাই এতকাল পারিবারিক জীবনক্ষেত্রে

ধর্ম-বীজ বপন ও ধর্ম-বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করে সযত্নে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, বর্তমানে নারীর পুরুষের সঙ্গে সমশিক্ষা এবং পরানুভূতির মোহ প্রবল রূপ ধারণ করায় সেই ধর্ম-তরুর মূলোচ্ছেদ হবার উপক্রম করেছে।"[১৮]

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির অভিঘাত থেকে হিন্দু পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করতে আপ্রাণ প্রয়াসী হয়েছিলেন অনুরূপা দেবী। তাঁর 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১), 'বাগদত্তা' (১৯১৪), 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০) এবং নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১৩), 'দিদি' (১৯১৫), 'বিধিলিপি' (১৯১৭), 'শ্যামলী' (১৯১৮) প্রভৃতিতে সর্বত্রই হিন্দু নারীর আদর্শময় জীবনের মহিমান্বিত বিকাশ। প্রতি ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধ ও স্নেহ-প্রেমের উচ্চ চিন্তার বাতাবরণ খচিত হয়েছে। অনুরূপা দেবী এবং নিরুপমা দেবীর রচনাতে সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র নেই; সমাজ নিবিদ্ধ প্রণয় সম্পর্কের কোন কল্পনা তাঁদের চিত্তে স্থান পায় নি। প্রেমের রূপে ও বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে কোন দেহসম্পর্কজাত কামনা বা লালসার বহিঃপ্রকাশ নেই। এমন কি সমাজের স্থূল নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধেও তাঁদের নায়িকারা উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন পরিচয় চিহ্নিত করতে চায় নি। এই দুই মহিলা ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি জায়া ও জননীরূপে নিজের পরিচিতি সীমায়িত করে রেখেছে। পত্নীর প্রগাঢ় পতিপ্রেমের সঙ্গে ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠা, ধৈর্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এই লেখিকাদের চিন্তাতে যেমন লোকোত্তর মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি মাতৃরূপের গরীয়সী মহিমাকেও তাঁরা উচ্চকিত করেছেন অতুল বৈভবে। অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসে নায়িকা ব্রজরানীর নারীত্বের যে মহিমময় বিকাশ, তা মাতৃত্বের সরণী বেয়েই এসেছে। এ সম্পর্কে লেখিকা নিজেই বলেছেন: "মা হবার আগ্রহ বা মাতৃত্বের ক্ষুধা নারীকে কত উচ্চে নিয়ে যেতে পারে, ব্রজরানী চরিত্রে তা সুপ্রকট।"[১৯] তবে প্রাচীন রীতি ও নীতিবাদ অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর রচনাতে উচ্চারিত হলেও, তাঁদের সমাজবোধ ও নিবিড় পারিবারিক জ্ঞান এবং স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি রচনাসম্ভারকে চিরন্তনত্ব দান করেছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সূচনা কাল থেকেই নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সতীত্বের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ, ফ্রয়েডের অবচেতন মনের বিকৃত ক্ষুধার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, হ্যাভলক এলিসের অবাধ কামতৃষ্ণার যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ প্রভৃতি বাংলা কথাসাহিত্যে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার প্রতি অনুরূপা দেবী কোন আকর্ষণবোধ না করলেও, যুগচিন্তা ও চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারেন নি। তিনি নারী স্বাধীনতার অর্থে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার চেয়েছিলেন। নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তিনি রক্ষণশীল মনোভাবে সমর্থন

করতে পারেন নি বলে 'ডাইভোর্স বিল' সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।[২০] তবে আন্তঃপ্রাদেশিক ভিত্তিতে সবর্ণে বিবাহ প্রথা প্রচলনে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর প্রাচীন রক্ষণশীল মনোভাব এই বিষয়ে একটু উদার হয়েছিল মাত্র।[২১] অবশ্য অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর রচনাই ছিল প্রগতিবাদী চিন্তার সর্বাপেক্ষা আধুনিক রূপ।[২২]

এই প্রাচীন আদর্শ, প্রচলিত সমাজনীতি এবং পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশের পাশে নতুন জীবনচেতনালব্ধ ব্যক্তি-মনের বিদ্রোহ, যাবতীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নারীর স্বীয় মর্যাদা ও অধিকার কায়েম কামনাও দুর্লক্ষ্য নয়। বিংশ শতকের ঊষালগ্নে সামাজিক-পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের যে পট পরিবর্তনের পালা বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে সুরু হয়েছিল, তাতে আমাদের চির স্নেহ-শান্ত অন্তঃপুর নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকতে পারেনি। প্রতীচ্যের আধুনিক প্রগতিবাদী ও পরিবর্তনশীল মন বাঙালী নারী চিত্তকে এক নতুন চেতনা ও প্রেরণাতে পরিচালিত করতে শুরু করেছিল। পালাবদলের এই ঢেউ বাঙালী মহিলা সাহিত্যিকদেরও গভীর ভাবস্পন্দে আন্দোলিত করে। আত্ম-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী, মনের নতুন অভাব ও দাবি সম্বন্ধে সচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃপ্ত প্রকাশ—সমস্ত কিছু ধীরে ধীরে দেখা দিতে শুরু করে এঁদের লেখায়। ধৈর্য-ক্লান্ত প্রত্যাশায় দৈবয়াত্ত দিনের জন্য অপেক্ষা ও আগ্রহ কমে গিয়ে ক্রমশঃ প্রয়োজনীয় জীবনের রুক্ষ কর্কশতাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করবার প্রবণতা মহিলা সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর রূপকার ছিলেন শান্তাদেবী (১৮৯৩) ও সীতাদেবী (১৮৯৬)।

এই দুই সহোদরা বিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বাইরে সংস্কারমুক্ত চেতনার উদার পরিমণ্ডলে তাঁদের মানস চিন্তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে শিক্ষিতা নারীর চিত্তে যে পরিবর্তন ও রূপান্তর আগ্রহ এবং আশাহীনতার মধ্যে সাধিত হচ্ছিল, সেই জীবন-সমস্যাকে এই দুই ভগ্নী তাঁদের সাহিত্যে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর নারী চরিত্রগুলি কেউই দেহ সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে অথবা 'স্তব স্তুতির অতিরঞ্জনের' গুরুভারে নমিত নয়। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার দুর্নিবার আগ্রহ এই নায়িকাদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। জীবনের ভালবাসাকে তারা মদির আবেশ বলে মনে করেন নি, সংসার যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের হিমশীতল প্রলেপ অথবা গুরুভারে বিপর্যস্ত জীবনকে সংগ্রামী করে রাখবার অবলম্বন হিসাবে তারা প্রণয়কে গ্রহণ করেছে।

তাদের প্রেমে কোন 'রোম্যাণ্টিক' ঐশ্বর্য অথবা সোনালী কল্পনার প্রাচুর্য নেই ; বিরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার এক অন্তর্গূঢ় আবেগ সংকুচিত আত্মনিবেদনের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই রিক্ত দীন জীবনসংগ্রামের ধূলিধূসর প্রণয়চিত্র অংকনই শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়।[২৩] এই দুই ভগ্নীর রচনার মধ্যে কোন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই। উভয়ের জীবনবোধ অভিন্ন ও চিন্তা একই ধারায় প্রবাহিত।

শান্তা দেবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চিরন্তনী'(১৯২১) ও সীতা দেবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'রজনীগন্ধা' (১৯২১)। এই উপন্যাসদ্বয়ের নায়িকা করুণা ও কণিকা আত্মমর্যাদায় গভীরভাবে সচেতন। দেহসৌন্দর্যহীন ও সাধারণ পরিবারের বধূ হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে সংগ্রাম করেছে। সমাজশাসনে তারা বাক্যহীনা না হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে ঐকান্তিক প্রয়াসী হয়েছে। ব্যক্তি হিসেবেই তারা সমাজের কাজে নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরতে উন্মুখ। কর্কশ বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক চাহিদায় বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করবার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের কঠোর সংগ্রাম কিভাবে পুরানো আদর্শ ও বিশ্বাসকে নষ্ট করে দিয়ে দিকে দিকে বিক্ষোভ-বিহ্বলতা সৃষ্টি করছে,—তারই কথাকোবিদ হচ্ছেন এই দুই সহোদরা। "রামায়ণ-মহাভারতের সীতা সাবিত্রী বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজে অচল। বাইশ-পঁচিশ-আঠাশ বছরের মেয়ে চাকুরেরা সেকালের সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী মাফিক জীবন চালাতে পারে না। * * * বঙ্গসমাজে এ এক বিপুল যুগান্তর।"[২৪] সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদের ভাষাতে সমাজ পরিবর্তনের যে চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে,—শান্তাদেবী ও সীতাদেবী তাকেই জীবনরস সম্পৃক্ত করে বাংলা কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জীবন-অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম ও ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন স্ফুরণের প্রবল ব্যাকুলতার মধ্যেও নারী জীবন প্রেমকে আশ্রয় করে কিভাবে সার্থক হবার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠে, অথচ নানা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিষবাষ্পে সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিলীন হয়ে যায় এবং একটি প্রদাহকর অনুভূতি নিত্যসঙ্গী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট মাধুর্যকে গ্রাস করতে তৎপর হয়ে ওঠে, তারই বাণীচিত্র শান্তাদেবী ও সীতাদেবীর সৃষ্ট চরিত্রে অত্যন্ত রোদনভরা অশ্রুধারায় অনুলিখিত। এই দুই লেখিকার রচনার মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের Bronte ভগিনীদের উপন্যাসের নায়িকাদের চরিত্র সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ নারীজীবনের শান্ত সংযত রূপের অন্তরালে তীব্র অন্তর্বিদ্রোহের অগ্নি কিভাবে আচ্ছন্ন থাকে, তারই চিত্রলিপি হচ্ছে শান্তাদেবী ও সীতাদেবীর সৃষ্ট চরিত্রগুলি। এই বিচারে তাঁরা বাংলা নারীসাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ।

বিংশ শতকের সূচনা কাল থেকে বিশেষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আধুনিক চিন্তার ঢেউ বাঙালীর চিত্তমানসে যে তরঙ্গোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে প্রাচীন রক্ষণশীল দল অথবা মধ্যপন্থীরা কেউ-ই রেহাই পান নি। 'সাহিত্য', 'নারায়ণ,' 'মানসী ও মর্মবাণী' সনাতন নীতি ও চিন্তার অনুবর্তন করলেও সমকালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে অস্বীকার করতে পারে নি। ফলে, এইসব প্রাচীনপন্থী সাময়িক পত্রগুলিতেও মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে আধুনিকতার ছায়াপাত ঘটেছে। বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় সাহিত্য বিচিন্তাতে মধ্যমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রসার, জীবনের প্রতিটি কর্তব্যকর্মে নারীর পূর্ণ সহায়তা ও উত্থান তাঁর কাম্য হলেও নারীকে তিনি 'নারী প্রকৃতির সমুদয় সদ্গুণে ভূষিত' দেখতেই চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন 'পুরুষ যেমন আত্মা, নারীও তেমনি আত্মা।' 'স্বাবলম্বন অভ্যাস নারীদের পক্ষে মঙ্গলজনক'[২৫]—এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তার আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা সম্পর্কে কোন স্থির মন্তব্য করেন নি। তবে নবযুগের বাণীকে তিনি কখনও অস্বীকার করবার চেষ্টা করেন নি। তাই তাঁর পত্রিকাতে প্রাচীন সংরক্ষণশীল দলের রচনার পাশেই আধুনিক জীবনবীক্ষা সমন্বিত নানা বিতর্কবাদী লেখাও প্রকাশিত হত। তাঁর দুই আত্মজা শান্তা দেবী ও সীতাদেবীর আধুনিক মননচিন্তাসম্মত লেখা 'প্রবাসী' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এছাড়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও নিরুপমা দেবীর হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যবাদের প্রতি অনুরাগ এবং রক্ষণশীল চেতনাবৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন গল্পের পাশে গোকুলচন্দ্র নাগ [২৬] এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের * আধুনিকমনস্ক গল্পের ঠাঁই হয়েছিল সমান মর্যাদায়। 'প্রবাসী' পত্রিকা আধুনিক লেখকদের আত্মমুক্তির স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করেছিল। তবে আধুনিকতার বিস্তারে 'প্রবাসী' পত্রিকার বৃহত্তর আহ্বানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হলেও এই পত্রিকা যে সর্বদা নতুন শক্তিকে অভিনন্দিত করেছে তা নয়, অনেক সময়ে বিরূপও হয়েছে। অবশ্য কালিদাস নাগের প্রচেষ্টায় তার সমাধানও হয়েছে অচিরে। সাহিত্য জীবনের প্রত্যুষ পর্বের কথা-কাহিনীর কথা বলতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে এই সমস্যা ও

---

* "প্রেমেনের তখন দুটি গল্প বেরিয়ে গেছে 'প্রবাসী'তে—'শুধু কেরাণী' আর 'গোপনচারিণী'। আর, সেই গল্পদুটি বাংলা সাহিত্যের গুমোটে সজীব বসন্তের হাওয়া এনে দিয়েছে। এক গল্পেই প্রেমেনকে তখন একবাক্যে চিনে ফেলার মত।"
—কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ; পৃঃ ২৫।

সমাধানের চিত্র অংকন করেছেন। "তখনকার দিনে 'প্রবাসী'ই বাংলা সাহিত্যের কুলীন পত্রিকা, তাতে জায়গা পাওয়া মানেই জাতে ওঠা, সঙ্গে-সঙ্গে কিছু বা দক্ষিণার খুদকণা। আমাদের তখন কলাবেচার চেয়ে রথ দেখাই বড় কাম্য। কিন্তু দেখা গেল রথের বাহকেরা আমাদের উপর ভারি খাপ্পা। কিন্তু কালিদাসবাবু দমলেন না—একেবারে রথের উপরে বসিয়ে ছাড়লেন।"[২৭]

এই পর্বে স্থবিরের শাসন-নাশনে আধুনিকতার নবীন চেতনা ও বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে অপর একদল সাহিত্যগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছিল। নিবিড় নিগড়ে আবদ্ধ সংস্কার, প্রথা এবং জীর্ণ জীবনানুভাবনাকে যৌবনের প্রবল কলরোল ও উদ্দামতার উতরোলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যাঁরা বাংলা কথাসাহিত্যকে মুক্তি দিতে আগ্রহী ছিলেন অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে, তাঁরা অনেকেই ছিলেন 'ভারতী' সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবতা ও ব্যক্তিচেতনার ভেরী তাঁদের দ্বারাই হয়েছিল বিঘোষিত।

আধুনিকতার সম্ভাষণে 'ভারতী' গোষ্ঠী যে কয়েকটি সূত্র মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে: (ক) সাহিত্যদৃষ্টিতে গতানুগতিকতার ঠুলি পরিত্যাগ, (খ) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সাধারণ বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটানো এবং (গ) সমসাময়িক সমাজের গ্লানির প্রতি—বিশেষ করে পতিতা নারীর দুর্দশার প্রতি—গল্প-উপন্যাসের সমবেদনা আকর্ষণ করা।[২৮] প্রধানতঃ এই তিনটি 'সংঘ' সূত্রের প্রতি অনুরক্তি প্রকৃতপক্ষে রবি-প্রদক্ষিণের ফল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য ছিল এবং এই ভাব-ঐক্য বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দুতে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী' গোষ্ঠীর বিশাল বৈভবের কথা প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের প্রতি অতুলনীয় ভক্তিই ভারতীর দলের প্রত্যেককেই মাধ্যাকর্ষণের মতন একদিকে টেনে এনেছিল।"[২৯] রবীন্দ্রভক্ত অপর পত্রিকা 'মানসীর' সাহিত্য-চিন্তা পুরানো ধারাকেই অনুসরণ করেছিল। এই পত্রিকার গোষ্ঠীপতি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অন্যতম লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কেউই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মানসকে প্রত্যুদ্‌গমন করতে পারেন নি। 'ভারতী' গোষ্ঠী এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের লেখক সঙ্ঘের একক প্রতিভাতে বৃহৎ নক্ষত্রের দীপ্তি না থাকলেও, খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যেকে একত্রীভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের আকাশে যে ছায়াপথ নির্মাণ করেছিলেন, তাতেই আধুনিকতার শকট ধাবিত হয়েছিল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব এই যে তাঁরা রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ

তুলেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' সাহিত্য বিচিন্তাতে যে গতিধর্ম ও নবযৌবনের বন্দনাগান করেছিলেন, 'ভারতী' গোষ্ঠীর অধিবাসীরা তাকে সুদৃঢ় করতে ব্রতী হন। 'সবুজপত্রে'র স্বপ্নকে তাঁরা বাস্তবে রূপ দিতে সক্রিয় হয়েছিলেন। বাংলা আধুনিক কথাসাহিত্য বিচিন্তার ভূমি নির্মাণে তাঁদের ভূমিকা ছিল অনেকটা কর্ষক অথবা ক্ষেত্রপালের।

'ভারতী' গোষ্ঠীর পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংকুর আতর্থী প্রভৃতি খ্যাতনামা গল্পকার ও ঔপন্যাসিকবৃন্দ* । এঁরা যে গতানুগতিকতার রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে নতুন এক স্বতন্ত্র পথের অনুসন্ধান করেছিলেন, তার মূলে ছিল বিশ্ব সাহিত্য বা Continental Literature-এর দুর্নিবার প্রভাব। বিদেশী সাহিত্যের জীবনবোধ ও গভীর সঞ্চারী মনোবিকলন তত্ত্ব তাঁদের সাহিত্য চিন্তাতে এক পরিবর্তন এনেছিল। এরই ফলে, এই সাহিত্যগোষ্ঠীর লেখকেরা পরিচিত জীবন-পরিধি ও প্রচলিত সমাজ-বিধির মধ্যে জীবনের একটি স্বতন্ত্র মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বাস্তবানুভূতির মূল কথা ছিল—সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর ভিতরে এবং ব্যক্তির বহির্জীবনের বিক্ষোভ ও সংঘাতের ঊর্ধ্বে জীবনের আন্তর বাস্তবতার অনুসন্ধান। বিশ্বসাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগ, অকৃত্রিম মমত্ববোধ যেমন তাঁদের সাহিত্য বিচিন্তাতে পরিবর্তনের নতুন সুরের আলাপন তুলেছিল, তেমনি তাঁরা সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিকদের অমর রচনাবলীকে দেশের মানুষের মধ্যে প্রচার করতে। তারই ফলে 'ভারতী' পত্রিকাতে অনুবাদ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা গড়ে ওঠে।

এই পত্রিকাতে যে সমস্ত অনুবাদিত গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি সূচী তৈরী করা যেতে পারে ঃ

---

* "রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্‌বর্ষ জয়ন্তীর বছর হইতে ভারতীর পরিচালনায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, চারুচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ লেখক ও শিল্পীদের প্রভাব বাড়িতে থাকে, এবং তিন চার বছরের মধ্যেই পত্রিকাটির ভার সম্পূর্ণরূপে ইঁহাদের হাতে আসে। 'ভারতীর বৈঠক' এইভাবে শুরু হয়। এই বৈঠকের নায়ক হইলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।"

—দ্রঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ)
ডঃ সুকুমার সেন ; পৃ. ১৭২-১৭৩।

(ক) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদিত গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে জাপানী গল্পের অনুবাদ 'জাপানী ফানুস' (১৯০৯) ও 'কল্পকথা' (১৯০৯) যেমন ছিল, তেমনি ছিল রুশ গল্পের অনুবাদ, টুর্গেনিভের রচনা অবলম্বনে 'জলছবি' (১৯১৮) সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি অনবদ্য গল্পের নাম 'বাজপাখী', 'দানের তুলনা,' 'ক্রাইস্ট' এবং 'ফাঁশির দড়ি'। ওলন্দাজ লেখক লুই কুপার্সের একটি উপন্যাসেরও অনুবাদ করেন মণিলাল 'ভাগ্যচক্র' (১৯১১) নামে।

(খ) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনেক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর রচনা অধিকাংশই অনুবাদ—ভাবে এবং ভাষায়। বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে 'বন্দী' (উগো), 'মাতৃঋণ' ও 'নবাব' (দোদে), 'অবন্ধনা' ও 'নতুন আলো' (গোর্কী), 'অসাধারণ' (তুর্গেনিভ), 'জনৈকা' (মোপাসাঁ)। তাঁর 'পরদেশী' (১৯১০) গল্প সংকলন গ্রন্থটিও বিদেশী গল্পের অনুবাদ।

(গ) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস—আসলে বড়গল্প 'আগুনের ফুলকি' (প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৩২০) জার্মান কথাশিল্পী হাউফের গল্পের অনুবাদ। এ ছাড়াও 'যমুনা পুলিনের ভিখারিনী' (১৩১০), 'চোর কাঁটা' (১৩২৮), 'সর্বনাশের নেশা' (১৯২৩), 'জোড় বিজোড়' (১৯২৪), 'নোঙর ছেঁড়া নৌকা' (১৯২৪), 'অদর্শনা' (১৯২৫) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু বিদেশী। চারু-চন্দ্রের অপর উপন্যাস 'পঙ্কতিলক' (১৯১৯) ন্যাথনাল হথর্নের 'Scarlet Letters' উপন্যাসের ছায়ারূপ। চারুচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে 'প্রবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হলেও, 'ভারতী' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল গভীর এবং 'ভারতী' পত্রিকাতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হত।

(ঘ) এছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নরোয়ের লেখক য়োনাস লী-র 'লিভ্‌স্‌স্লাভেন্' উপন্যাস অবলম্বনে 'জন্মদুঃখী' (১৯১২) এবং সতীশচন্দ্র বাগচী মূল ফরাসী থেকে 'ফরাসী গল্প' (১৯১৫) নামে অনুবাদ কাহিনী প্রকাশ করেন।[৩০]

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের জীবনচিন্তার সঙ্গে পরিচয় সাধন করে জাতির চেতনা ও অনুভাবনাতে পরিবর্তন আনবার যে প্রয়াস, তা শুধু কথাসাহিত্যের অনুবাদমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, পাশ্চাত্য লেখকদের জীবন ও সাহিত্য চিন্তা নিয়েও অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ 'ভারতী' গোষ্ঠীর সভ্যরা রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রবন্ধ 'রুষিয়ার সাহিত্যিক' (ভারতী, ভাদ্র ; ১৩২৭) ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'রুশ লেখক সোলোগাব' (ভারতী, অগ্রহায়ণ ; ১৩২৭)।

বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের সাহিত্যচিন্তাতে কোন

মৌলিক রূপান্তর আনতে পারে নি। অধীত বিদ্যার প্রাবল্যে তাঁদের প্রত্যক্ষ জীবন থেকে সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জনের দৃষ্টি বহুলাংশে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের নতুন বাস্তব চেতনা, সাহিত্য রচনার রীতি ও প্রকৃতির বাইরের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, জীবনের গভীরতার অন্তঃস্থলে ডুব দিয়ে চিরন্তন প্রকৃতির সঙ্গে কোন সমন্বয় সাধন করতে পারে নি। সংস্কার মুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেতনার ভাবা-ন্দোলনে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে তাঁরা বহুদূরে সরে গিয়েছিলেন। অধীত বিদ্যার ঠুলিতে যাকে প্রকৃত বাস্তব ও জীবনসত্য বলে তাঁরা মনে করতেন, তার থেকে আসল জীবন ও বাস্তবতা ছিল অনেক দূরের সামগ্রী। সত্যকার ব্যক্তিস্বাধীনতা অথবা চিত্তমুক্তির বাণী লেখনীর মুখে তুলে ধরে সামাজিক জীবনে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবার শক্তি তাঁদের ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকারের মোহে তাঁরা তরল ও চঞ্চল মানসিকতার আবেশে জাতীয় tradition-কে উপেক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিশ্ব সাহিত্যের অনুসরণ অথবা অনুকরণ করে এবং সাহিত্য রচনার উপাদান ও উপকরণে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে খেয়ালী কল্পনার রোম্যান্টিক বর্ণালীতে মোহমুগ্ধ হয়ে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পরবর্তীকালের লেখকদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল।

'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা স্বাভাবিক জীবন ও সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁদের আধুনিকতা ছিল কেবলমাত্র কয়েকটি তত্ত্বের ও প্রশ্নের। বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে তত্ত্বকে গ্রহণ অথবা বর্জন কিংবা তুলে ধরার কোন প্রয়াস কেউ করেন নি। তবে বিশাল বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালীর চিত্তমানস বহুলাংশে সংকীর্ণতামুক্ত হয়েছিল। আর এখানেই ছিল 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের বিশ্ব সাহিত্যপ্রীতি ও প্রসারের সার্থকতা।

গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ এবং সংস্কারমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের প্রতি গূঢ় সমর্থন বাঙালীর কথাসাহিত্য চিন্তাতে পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল। এর ফলে লেখক এবং পাঠক সমাজে একটা উপলব্ধি এসেছিল যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলনই কেবল মাত্র সাহিত্যের স্থির উদ্দেশ্য নয়, মুক্ত দৃষ্টিতে জীবনের বিকাশ এবং চিন্তার প্রকাশ ঘটানও আবশ্যিক কর্ম ও কর্তব্য। এই নতুন মূল্যবোধ থেকে জীবন সম্পর্কে বাস্তবতার একটি স্বতন্ত্র চেতনা 'ভারতী' গোষ্ঠীর সঙ্ঘমিত্রদের চিন্তায় দেখা দিয়েছিল। কোন সুগভীর মনন ও মৌলিক প্রতিভার অধিকারী না হলেও নতুনত্বের আত্মপ্রকাশকে তাঁরা স্থির নিষ্ঠা ও সাধনা দিয়ে কর্মের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পূর্বেই 'ভারতী'র সঙ্ঘমিত্ররা সীমিত ক্ষমতা সম্বল করে আধুনিক

চিন্তা বিস্তারের যে অভিযান শুরু করেছিলেন, সেখানেই তাঁদের কর্মের ও চিন্তার স্বীকৃতি এবং ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা।

'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের আধুনিকতার চিন্তা ও মননের প্রথম প্রয়াস ছিল গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিষ্ঠা এবং মনুষ্যত্ববোধের উদ্ধার ও শ্রীবৃদ্ধি। মনে হয় পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিশেষভাবে রুশ দেশীয় লেখকদের উচ্চ মানবতাবাদী লেখা পাঠ করে তাঁরা এই অধিমানসের অধিকারী হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ ও নিম্নবিত্ত সমাজের ভীড় তাঁদের রচনাতে দেখা দিতে শুরু করে। এ ছাড়া সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দূর করবার প্রচেষ্টাও তাঁদের রচনাতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হেমেন্দ্র কুমার রায় ছিলেন এই বিষয়ের অগ্রণী কর্ণধার। তিনি আপন চিত্তের মনোবাসনাটিকে 'ঝড়ের যাত্রী' (১৩৩০) গল্পের নায়িকা ব্রাহ্মণ কন্যা মাধবীর মাধ্যমে প্রচার করেছেন : "নমঃশূদ্রের মনুষ্যত্বকে আমি তো কোন দিন ব্রাহ্মণের মনুষ্যত্বের চেয়ে খাটো বলে মনে করি নি"। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে হেমেন্দ্র কুমার রায়ের যে চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র ললিতের সঙ্গে ব্রাহ্মণ তনয়া মাধবীর বিবাহ প্রতিপাদনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখকের প্রগতিবাদী মনোভাবের সঙ্গে মনুষ্যত্ববোধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতে লেখকের আধুনিক মনোভাবনার রূপটি সুপরিস্ফুট :

"তোমরা সাবেকভাবে সমাজটিকে রাখতে চাও যে খাড়া
তা সে হবে কেন ?
তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখে তাড়া
তা সে হবে কেন ?"

'ভারতী' গোষ্ঠীর অপর লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'চাষার মেয়ে' (১৯২৪) উপন্যাস ও 'বাজীকর' (১৯২২) গল্পে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত নর-নারী চরিত্রের সমাবেশ দেখতে পাই। মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদার বিকাশও তাঁর হাতে ঘটেছে। বিশেষ ভাবে 'ঝড়ের পাখী' (১৩২৪) ও 'অচল পথের যাত্রী' (১৯৩২) গল্পে নতুন নৈতিক আদর্শের মানদণ্ডে ব্যক্তিনির্ভর মানবতাবাদের প্রকাশ ঘটেছে। 'ঝড়ের পাখী' গল্পের নায়িকা লীলার রহস্যাবৃত এবং নিন্দনীয় জন্মবৃত্তান্ত জানা সত্ত্বেও ধনী পিতার একমাত্র সন্তান, মানবতায় বিশ্বাসী অরুণ তাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে আহ্বান করে বলেছে : "পুরানো দিনের কথা ভুলে যাও···|···আজ আমাদের এই নতুন সূর্যোদয় হোলো, আবার নতুন করে আমরা জীবন আরম্ভ করব।"

কেবল মানবতাবাদ ও মনুষ্যত্ববোধের প্রচার নয়, এর অক্ষয় ও মৃত্যুহীন রূপটিও তাঁরা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মানব জীবনের বৃহত্তর জয়গানের মধ্যে। পাপের

কলঙ্ক মানুষের ভালে সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের পঙ্কতিলক। জীবনের অপ-মৃত্যু কোন কারণেই সংঘটিত হয় না, কারণ সমস্ত কিছু ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে জীবন নিজের বৈভব প্রকাশ করে থাকে। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে এই বাস্তবতাবোধ এবং নৈতিক বিদ্রোহচেতনার প্রকাশ ও পরিচয় ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাঁরা নেতিবাচক জীবনের পূজারী ছিলেন না। একটি সুগভীর জীবনপ্রত্যয় তাঁদের অনুভাবনা ও প্রমার মধ্যে আদর্শায়িত হয়েছিল বলেই তাঁরা সব সময়ে প্রচলিত নীতি জ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আদর্শের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন নি। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মানুষ কোনদিন কলুষিত হয় না। হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'কালবৈশাখী' (১৯২১) উপন্যাসে এর পরিচয় আমরা দেখতে পাই : "পাপীও মানুষ, মানুষ কখনও ঘৃণিত নয়—ঘৃণিত তার পাপ। সকল মানুষেরই মনের ভিতরে পাশাপাশি ভগবান আর শয়তানের বাস আছে।" চির শাশ্বত মানবতাবাদের কথা 'ভারতী' গোষ্ঠীর সঙ্ঘমিত্রদের চিন্তাতে নতুন আদর্শে রূপায়িত হতে শুরু করেছিল এভাবে।

মানবতাবাদ ও মনুষ্যত্ব মহিমার উচ্চ চিন্তাতে 'ভারতী'র সঙ্ঘমিত্রগণ অভিষিক্ত ছিলেন বলে, পতিতা নারীর জীবন ও চরিত্রের প্রতি তাঁরা সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিতা, সমাজ লাঞ্ছিতা ও লোক নিন্দিতা পতিতা নারীর প্রতি মমত্ববোধ ও সহানুভূতির প্রকাশ উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে দেখা দিতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ, পতিতা নারীর প্রতি সম-বেদনার স্বাক্ষর রেখেছেন 'বিচারক' (১৩০১) গল্পে। পরবর্তী সময়ে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'তমস্বিনী' (১৯০৩) উপন্যাসের পতিতা নারীর জীবন বিড়ম্বনাকে আন্তরিক-তার সঙ্গে চিত্রিত করেন।

কেবলমাত্র মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা নয়, সমাজের নিষ্ঠুর বিধান ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্পৃহাও 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে জেগেছিল। সমাজের নীতি বিগর্হিত অনুশাসনের উর্ধ্বে জীবনের দাবিকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে-ছিলেন। নারীর পতিতাবৃত্তি গ্রহণের মূলে থাকে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অবিচার, অসঙ্গতি এবং তাদের দেহ-যৌবনের প্রতি পুরুষের দুর্নিবার লালসা। পঙ্কিল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তার থাকে উপায়হীন আত্মসমর্পণ। আত্ম-অপমানের জ্বালা তাকে ক্লান্ত অথবা বিদ্রোহী করলেও জীবনমুক্তি থাকে সুদূরপরাহত। পীড়নধর্মী সমাজের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জীবনের অ-জরত্ব ও অ-মরত্ব প্রমাণ করে যায় স্বাভাবিক লোকচক্ষুর অন্তরালে। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা হৃদয় দিয়ে পতিতাদের নারীসত্তার ক্রন্দন ও দুঃখবোধের গভীর বেদনাকে উপলব্ধি

করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। আপাত মসীময় ঘৃণিত জীবনের অন্তরালে বিশুদ্ধ জীবনের জন্য যে কামনা নারীর হৃদয়ে পিপাসিত চিত্তের ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষা করে, অথচ নিষ্ঠুর সমাজনীতির দৃঢ় অচলায়তনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা গ্লানিময় উপেক্ষার চোরাবালির ঊষরতার মধ্যে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়— 'ভারতী'র সংঘমিত্রগণ মানবিক দৃষ্টিতে ও সহৃদয় সহানুভূতিতে তাকে কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য, সমকালে রক্ষণশীল পত্রিকা 'নারায়ণে'ও পতিতা রমণীর প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি ও মর্যাদাদানের পরিপ্রেক্ষিতে মানবহিত-বাদী চেতনা কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার খবর ইতোমধ্যে আমরা গ্রহণ করেছি।

পতিতাদের ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা জীবন নিয়ে 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল—সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'নির্ঝর' গল্প সংকলনের (১৯১১) অন্তর্গত 'অভিনেতা' ও 'পিয়াসী' (১৯২২), হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'সিঁদুর চুপড়ি' (১৩২৮) ও 'পায়ের ধুলো' (১৩২৮), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তি' (১৩২১) এবং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাট কোঠায়' (১৩২৮)। এই সমস্ত গল্পের প্রতিটি আখ্যানবস্তুতে প্রত্যেক পতিতা রমণী ঘৃণিত ও কলঙ্কিত জীবন থেকে গভীর আগ্রহে মুক্তি কামনা করেছে। দুর্বার জীবনপিপাসায় তাদের আর্তি সত্যই মর্মভেদী ও করুণ, কারণ তারা প্রত্যেকেই অন্তরে অমলিন ও নিষ্পাপ। সামাজিক অভিশাপের বিরুদ্ধে 'ভারতী' পত্রিকার লেখকগণ মানবহিতবাদের আদর্শের অনুগামী হলেও, তাঁরা যেন প্রত্যেকেই যুগ-সংকটের গভীর স্বন্দ্বে আবর্তিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁদের নায়িকারা জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বদা সংশয়ান্বিত ও দ্বিধায় জড়িত। ফলে, তাদের মুক্তি সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে না হয়ে জীবনমুক্তির কল্পনালোকে প্রসারিত হয়ে প্রশান্তি লাভ করেছে। ধর্মের নির্মোকে অথবা দেহোত্তীর্ণ বিশুদ্ধ প্রেমে তাঁদের ক্ষতলাঞ্ছিত জীবন স্বস্তি পেয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের দুই নায়িকা 'কুসুম' ও 'শিউলি' (সিঁদুর চুপড়ি) কিংবা 'রাধারাণী' (পায়ের ধুলো) অথবা সৌরীন্দ্র-মোহনের 'পিয়াসী' গল্পের নায়িকা 'পিয়ারী'—সকলেই আধিদৈবিক মনোভাবনার তীর্থসলিলে অবগাহন করে জীবনের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ অর্জন করেছে।

'ভারতী' পত্রিকার লেখকগণ নারীর জীবনবিচিন্তা ও মানসিক অন্বেষার ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন গভীর কৌতূহল নিয়ে। নারীর সমাজনিষিদ্ধ প্রেম, যৌন আবেগসঞ্জাত দেহকামনার প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ, মনের নির্জ্ঞান স্তরে চৈতন্য-প্রবাহের কুটিল গ্রন্থীরহস্য উন্মোচনে দেহলীর অন্তরালে জীবনের inner reality-র

অনুসন্ধান করবার প্রয়াসও তাঁদের লেখনীতে ধরা পড়েছিল। চারুচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের হাতে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সময়ে নর-নারীর দেহ সচেতন যৌনাবেগকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনার প্রয়াস তাঁর সাহিত্য-চিন্তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চারুচন্দ্রের 'দোটানা' (১৯২০) এবং 'স্রোতের ফুল' (১৩২১-২২) উপন্যাস দুটিতে দেহধর্মী যৌনরহস্য উন্মোচনের প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। 'দোটানা' উপন্যাসটি বিদেশী ভাবরসে সম্পৃক্ত হলেও লেখকের কাহিনীবিন্যাস ও শিল্পনৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসে বিধবার সমাজনিষিদ্ধ প্রেম, দৈহিক কামনার বেদীতে যৌনপিপাসার তীব্র উৎসার প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপায়িত করবার এক প্রচেষ্টা লেখক চারুচন্দ্র করেছেন। বাল্য-বিধবা হৈমবতীর সঙ্গে তরলের প্রণয়লীলাতে যৌন আবেদনের লক্ষণ আছে। অশিক্ষিত চিত্রকর গোবর্ধন ও প্রণয়ী তরলকে নিয়ে নায়িকা হৈমবতীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাতে লেখকের গভীর মনঃ বিশ্লেষণের ছাপ দেখা যায়। তবে যুগ সন্ধিক্ষণের সংশয় ও দ্বিধা এই উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত নয়। নায়িকা হৈমবতীর বিদ্রোহিণী নারীসত্তার দুঃসাহসিক বিকাশ আমরা দেখতে পাই না। দ্বিধাবিজড়িত শঙ্কিত চিত্তের ভীরুতা তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে এমন জটিল করেছে যে, আত্মহত্যার পথেই ঘটেছে তার সকল প্রশ্ন ও কামনার সমাধান।

তবে, চারুচন্দ্রের প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'স্রোতের ফুলে'র নায়িকা মালতী বহুলাংশে সংশয়মুক্ত বিদ্রোহিণী নারী। তার প্রতিবাদের ভাষা জোরালো হলেও দুঃসাহসের খরতায় দৃপ্ত নয়। এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সঙ্গে এর মিল থাকলেও কাহিনীর মধ্যে যৌন আবেদনের উপর বেশি ঝোঁক থাকায় উপন্যাসটি বহুলাংশে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়িকা মালতী, 'চতুরঙ্গে'র দামিনী চরিত্রের অনুরূপ হলেও একটি প্রকৃষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। মালতীর মধ্যে যে তেজস্বিনী সমাজ ও ধর্মের প্রচলিত নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী নারীসত্তা সুপ্ত ছিল, তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পাই অন্তিম অধ্যায়ে গুরু প্রেমানন্দের প্রতি তীব্র তিরস্কারে: "আমি সন্ন্যাসিনী নই! আমি চীৎকার করে বলছি, হাজার বার বলছি, আমি সন্ন্যাসিনী নই! আপনি আমাদের দূরে করে দিন আপনার আশ্রম থেকে।" তবে মালতীর এই আত্মস্বীকৃতিকে সমস্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণী-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে খুব জোরালো বলা চলে না। কেউ আবার এতে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন।[৩১] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোবিশ্লে-ষণের গভীরতা যে এই উপন্যাসে সুচিহ্নিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আধুনিক চিন্তার প্রসার এবং সমর্থনে 'ভারতী' পত্রিকা ছিল উদার মতবাদী। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতে যেমন চৈতন্যপ্রবাহের অন্তরালে জীবন রহস্যের অনুসন্ধান ও ব্যক্তির অন্তর্লোকের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সমকালের নতুন আদর্শ ও মানদণ্ডে স্বীকৃত জীবন কাহিনী এবং দেহধর্মী যৌন রহস্যের উন্মোচনে ব্যাপৃত কথাসাহিত্যও যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকার 'গ্রন্থসমালোচনা' অংশে আমরা এর নিদর্শন দেখতে পাই। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের যৌন আবেদনমূলক উপন্যাস 'শুভা' এবং 'পাপের ছাপ' এই পত্রিকাতে অভিনন্দিত হয়েছিল। "মামুলি একঘেয়ে প্লট আর প্রাণহীন আদর্শ রচনার যুগে বইখানি……স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া বহিয়া আনিবে"—'পাপের ছাপ' উপন্যাস সম্পর্কে ছিল 'ভারতী' গোষ্ঠীর সপ্রশংস উক্তি।[৩২]

তবে 'ভারতী'র সঙ্ঘমিত্রদের রচনাতে আধুনিক বাস্তবতাবোধের মধ্যে যে ইতি-বাচক রূপটি সমর্থনের মধ্যে প্রত্যায়িত হয়েছিল, তা ছিল বহুলাংশে আতিশয্যের ভারে অবনমিত। তাদের আদর্শবাদ বাস্তবের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কোন সমন্বয় সাধন করতে পারে নি। বাস্তবানুভূতি অভিজ্ঞতালব্ধ ধন না হওয়ার জন্য অস্বা-ভাবিক রোম্যান্টিক কল্পনার অতিরেক 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের কথাসাহিত্যকে বহুলাংশে তরল করে তুলেছে। জীবন-বিশ্লেষণের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে পাণ্ডুর এবং পাংশুল। ফলে,পতিতাদের জীবনকাহিনী নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনার উদ্যোগের পশ্চাতে বাস্তব জীবনের কোন প্রকৃষ্ট ছোঁয়া নেই ; রূঢ় বাস্তব-সমস্যা ও অশ্রুপ্লাবী জীবন-বিশ্লেষণের পরিবর্তে কেবল ঘটনার ঘনঘটা। একটি বহির্মুখী আদর্শ ও প্রতিবাদের মনোভাব তাঁদের সাহিত্য রচনার পশ্চাতে প্রেরণা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। জীবনের সুখ-দুঃখকে, রোম্যান্সের রসে সিক্ত করে দেখেছেন বলেই 'ভারতী'র সঙ্ঘমিত্রগণ ঘটনার মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি এবং সফল হননি জীবনের জটিল রহস্য উন্মোচনে ও দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধান ব্যাখ্যায়।* এ ছাড়াও তাঁরা যুগ সন্ধিক্ষণের অন্তর্দ্বন্দ্বে আবর্তিত হয়েছেন। তাই জীবনদৃষ্টি

---

* সৌরীন্দ্রমোহনের—'সাহসিকা,' 'পিয়াসী', 'পথের পথিক' 'পথ নির্জন' ; হেমেন্দ্রকুমার রায়ের—'জলের আল্পনা,' 'ধারা শ্রাবণ' এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের —'বায়ু বহে পুরবৈয়া' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসগুলির নাম করা যায়। কাব্যধর্মী ভাষা, ভাবাতিরেক ও কল্পনার আতিশয্য সমস্ত কিছু একযোগে জীবন-পরিবেশের ক্ষেত্রে যেমন অসংগতি সৃষ্টি করেছে, তেমনি কাহিনীগুলিকে করে তুলেছে তরল ও রোম্যান্সপক্ষবিহারী।

ও শিল্পনীতিতে কোন দুঃসাহসিকতা অথবা বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয়টি স্বাভাবিকভাবেই অপরিস্ফুট থেকে গেছে।

তবুও, আধুনিকতার শ্রীবৃদ্ধিতে 'ভারতী'র লেখকদের ভূমিকা আদৌ গৌণ নয়। রোম্যান্টিকতার মোহবিলাস এবং জীবনাভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও বাংলা কথাসাহিত্যের গতানুগতিক চিন্তা ও রক্ষণশীল দৃষ্টির মধ্যে তাঁরা পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত করেছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্য বিচিন্তাতে প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন নৈতিক মূল্যবোধের দাবি। এ ছাড়া মনোবিকলন তত্ত্বে জীবনরহস্যের অনুসন্ধানও ছিল তাঁদের বিদ্রোহী চেতনার অপর একটি বৃহৎ প্রয়াস। নারীর জীবনের অন্তর্নিহিত যৌন কামনা, দেহবাদিতার অতিরেক এবং সমাজনিষিদ্ধ প্রেমকে তাঁরা সাহিত্যভাবনাতে সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত করতে দ্বিধাচিত্ত হন নি। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা দুঃসাহসিক না হলেও পরবর্তীকালের আপোষহীন মনোভাবের বীজটি যে তাঁদের চিন্তার শ্রীক্ষেত্রে রোপিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার হেমেন্দ্রকুমার রায়, তাঁদের সকল প্রয়াসের সফল সমীক্ষা করে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "আজকাল যাঁরা অতি-আধুনিক সাহিত্যিক আখ্যা লাভ করেছেন, তাঁদের অনেকের মুখেই শুনতে পাই যে, এক সময়ে এই ভারতীর দল নাকি তাঁদের সাহিত্য সাধনার উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।"[৩৩]

'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের সুনিষ্ঠ কর্মচিন্তাতে যে পরিবর্তন সাধনের প্রয়াস ছিল, তা পরবর্তীকালে 'কল্লোল' গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এমন কি 'ভারতী'র সংঘমিত্রদের লেখাও 'কল্লোলে'র পাতাতে প্রকাশিত হত।* তবে 'ভারতী' ও 'কল্লোল' উভয়ে পরিবর্তন পিয়াসী হলেও 'ভারতী' কোনদিনই 'কল্লোলে'র মত মুষলপাণি হতে পারে নি। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের মূল্যায়ন করে অচিন্ত্য-কুমার মন্তব্য করেছিলেন: "কল্লোলে' ওঁদের লেখা প্রকাশিত হলেও ওঁদের লেখায় 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়নি।"[৩৪]

'ভারতী' ও 'কল্লোল' উভয়েই যুগের সৃষ্টি। একটিতে যুগের সংশয়ের দ্বিধা অপরটিতে সংশয়মুক্তির বিদ্রোহ। একে অপরের পরিপূরক।

* 'কল্লোলে' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেবের উপন্যাস, হেমেন্দ্র-কুমার রায়ের কবিতা এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর গল্প ছাপা হয়েছিল।

॥ শরৎচন্দ্র ও আধুনিকতা ॥

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ও রূপ-নির্মিতি, সমাজ-বাস্তবধর্মিতার বিচার, নারীর প্রেম-অভীপ্সার মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশ ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য মর্মবিদারী যন্ত্রণা এবং বিদ্রোহ, সমাজ ও ব্যক্তিমনের সংঘর্ষে ব্যক্তির পক্ষাবলম্বনে সংস্কারমুক্তির বিজয় ঘোষণা, গভীর জীবনাভিজ্ঞতার নিরিখে ঘটনাবৈচিত্র্যের অন্তরালে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—সমস্ত কিছু একত্রযোগে শরৎচন্দ্রের কথাশিল্প-বৈচিত্র্য ও সাহিত্যদর্শন গড়ে তুলেছে। অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুগসন্ধিক্ষণের জীবনচিন্তার দ্বিধার সঙ্গে মনন ও প্রতীতির নবমূল্যায়ন, যাকে আমরা দার্শনিক নীট্শের ভাষায়—'transvaluation of values' বা দরের হেরফের, অর্থাৎ অগৌরবের গৌরব অথবা নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা বলে চিহ্নিত করতে পারি।[১] যুগসন্ধিক্ষণের মানসদ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রকে প্রচলিত সমাজ অনুশাসনের প্রতি অনুরাগী করে তুললেও, তিনি কোনদিনই সামাজিক বিধান ও সমাজকে অনতিক্রম্য বা 'দেবতা' বলে স্বীকার করেন নি। তিনি কোনদিন মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী সমাজচিন্তাকে আশ্রয় করেন নি। সাধারণ মানুষ ও মানুষের হৃদয় ছিল তাঁর সাহিত্য রচনার শ্রীক্ষেত্র। উত্তরকালে বাংলা কথাসাহিত্যে বিবর্তনধারায় যে সাধারণ মানুষের চিত্ত-জিজ্ঞাসা, মনোবিকলন তত্ত্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ও কাহিনী বিশ্লেষিত হতে দেখি, তার গো-মুখ বা উৎস ছিল শরৎচন্দ্রের লেখনী। এ কালের অন্যতম কথাসাহিত্যিকের স্বীকৃতিতে এই আনুগত্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণঃ "শরৎচন্দ্রের তিরোধান হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বর্তমানে, তবুও বাঙালী জীবনের সাহিত্যের ভাবধারায় শরৎচন্দ্র-ই আমাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাবধারা।"[১ক]

আধুনিকতার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের প্রধানতম অবদান—সমাজবাস্তবতার প্রবর্তনা। তিনি গণতান্ত্রিক চেতনার প্রথম রূপকার। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে যে সমস্ত মানুষের ভীড়, তারা প্রায় সকলেই আমাদের সমাজের চিরপরিচিত মানুষ। অনেকেই আবার অবজ্ঞাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কি মধ্যবিত্ত, কি নিম্নবিত্ত কারোও মধ্যে কোন অলৌকিকত্বের বিভূতি নেই। মধ্যবিত্তদের মধ্যে অধিকাংশই চাকুরীজীবী, গ্রামের শিক্ষক, কুসীদজীবী অথবা ভূমিসৈনিক। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিম্নবিত্ত নিরন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসীবৃন্দ—হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী—ডোম, মুচি, দুলে ও

বাগ্‌দী সম্প্রদায়। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ', 'পরিণীতা', পণ্ডিতমশাই', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'নিষ্কৃতি', 'বামুনের মেয়ে', 'শুভদা', 'মামলার ফল', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতিতে সর্বত্রই সাধারণ অথবা নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভীড় ও তাদের জীবনচর্যার বিচিত্র কাহিনী। এমন কি তাঁর উপন্যাসে যেখানে উচ্চবিত্ত মানুষের আনাগোনা, যেমন 'নববিধান', 'দত্তা', 'বিপ্রদাস', 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' —সেখানে পাত্র-পাত্রীদের মানসিকতাও অনেকাংশে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মত। শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সাধারণের মধ্যে অ-সাধারণত্বের অনুসন্ধান এবং এই প্রয়াসের মধ্যেই তাঁর বৈপ্লবিক মানসিকতার স্বাক্ষর বর্তমান। তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যিক, যিনি নির্ভীকভাবে অতীতের সমস্ত প্রবাহমান ঐতিহ্যকে (tradition) উপেক্ষা করে, সমাজের ভ্রূকুটি পাশে সরিয়ে একজন দরিদ্র বিধবা সংকর বর্ণজাত রমণীকে নায়িকার আসনে বসিয়েছিলেন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের 'কমল'— শরৎচন্দ্রের সেই অহংকারের দৃপ্তময়, দীপ্তিময় শৈল্পিকরূপ।

এর সঙ্গে তুলনায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকারা অনেক বড় মাপের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভূম্যধিকারী এবং রবীন্দ্রনাথের জমিদার অথবা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অ-সাধারণত্বের দ্যুতি আছে। শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের অধিকাংশের মধ্যে সে জাতীয় কোন মহিমা নেই। এছাড়া আরও একটু বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের মান-মর্যাদাগত প্রতিষ্ঠা এবং চিন্তা-অনুভূতির বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। এবং এই ব্যবধান সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উচ্চবিত্ত বাঙালীর সঙ্গে সাধারণ জনজীবনের অর্থনৈতিক স্তরে এক বিরাট পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত স্তর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আপন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উপন্যাসের মধ্যে চরিত্র ও ঘটনাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রধানতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত ও পরিস্ফুট। পাত্র-পাত্রীরা প্রায় সকলে গ্রামীণ ভূম্যধিকারী—সাধারণ জনসম্প্রদায়ের ভূমিকা বহুলাংশে উপেক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'রজনী' প্রভৃতি উপন্যাসের দিকে তাকিয়ে একথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সর্বত্রই নগর জীবন ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যের চিত্র ফুটে উঠতে দেখি। তাঁর 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাসেরও কেন্দ্রবিন্দু নাগরিক জীবন-বৈদগ্ধ্য। গ্রামীণ অর্থনীতির শহরকেন্দ্রিক বাণিজ্য অর্থনীতিতে (Merchant Capital) রূপান্তরের চিত্র

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গভীরভাবে মুদ্রিত। তদানীন্তন ভারতের রাজধানী কলকাতা এবং উচ্চশিক্ষিত ধন-বিত্ত সমুজ্জ্বল পরিবারের প্রতিনিধিদের কথা ও কাহিনী নিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলির রূপ প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। তাঁর 'ঘরে-বাইরে' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসে গ্রামীণ পরিবেশে শহরজীবনের সুচারু রুচিমার্জিত উচ্চমানের জীবনকাহিনীই বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সময়ে নিরন্ন ভূমিহীন সম্প্রদায় ও কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব বাঙালী সমাজে ঘটলেও, এই শ্রেণীর মানুষের জীবনবৃত্তের অথবা জীবনায়নের সঙ্গে তাঁর কোন গভীর পরিচয় ছিল না। 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪) পূর্বকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্ত মানুষের যাতায়াত থাকলেও, সেখানে ফুটে উঠেছে জীবনের উপর লেখকের একটা উদার নির্লিপ্ত মনোভাব—যদিও সেখানে কবির ঔৎসুক্য-চেতনার কোন অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথের নির্লিপ্ত জীবনবোধ, গভীর ভাবাদর্শ ও কাব্যব্যঞ্জনা চরিত্রগুলিকে অনেকটা অ-সাধারণত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেছে—তাদের সকলের গায়ে অ-সামান্যতার ছোঁয়া লেগেছে।

এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক বেশী পরিমাণে আধুনিক। তিনি তাঁর 'পল্লীসমাজ' ও 'দেনা পাওনা' উপন্যাসে গ্রামীণ অর্থনীতির অবক্ষয়ের চিত্র এঁকেছেন যেমন একদিকে, তেমনি অপরদিকে দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত মানুষের জীবনের করুণ রূপ। অবাধ বাণিজ্য ও Industrial Capital অর্থনীতির নীতিতে দেশের মধ্যে যে শিল্প-সভ্যতার বিকাশ, তা দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষে কি মারাত্মক রূপ ও জীবনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণকরাল ছায়া বিস্তার করেছিল, তার চিত্রও তিনি এঁকেছেন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে এবং 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের বস্তিচিত্র বর্ণনার ভিতরে। উনিশ শতকের শেষ পাদে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে দেশের বিভিন্ন অংশে যন্ত্র সভ্যতার বিকাশ হতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক অঞ্চলে যন্ত্র-সভ্যতা এবং শিল্পকেন্দ্রিক অবাধ বাণিজ্যরীতিতে যে অপর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করা হত, তার সিংহভাগ সরবরাহ করত ইংরেজ উপনিবেশের অধিবাসীবৃন্দ। নিষ্ঠুর শোষণ প্রক্রিয়ায় দেশের কাঁচা মাল যেমন অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করে দেওয়া হত, তেমনি চালান করা হত অল্পব্যয়ে অধিক শ্রম বিনিয়োগের জন্য ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণী সম্প্রদায়। এই নিম্নশ্রেণী সম্প্রদায় বিদেশীদের মুনাফার জন্য জীবনদান করতে বাধ্য ছিল, বিনিময়ে লাভ করত অমানুষিক অত্যাচার, উপেক্ষা এবং মৃত্যুহীন জীবনযন্ত্রণা। 'পথের দাবী' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বিদেশে বঞ্চিত পরান্নপুষ্ট জনগণের ছবি আপন অভিজ্ঞতার

তুলিতে এঁকেছেন। শরৎচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তার রূপটি বুঝে নেবার জন্য দু/একটি উদাহরণ উদ্ধৃতি হিসাবে গ্রহণ করলে আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য আরও সার্থক হবে বলে মনে করি। শিল্পবিপ্লব দেশে বড় বড় কল-কারখানা যে পরিমাণে নির্মাণ করেছে, যে পরিমাণে মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ সাধন করেছে, ঠিক সমপরিমাণে বিপরীত দিকে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে হত্যা করেছে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে। নিঃস্বতা, রিক্ততা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিহীন হয়ে আত্মরতিতে নিমজ্জিত এবং বিলাস-ব্যসনে যে দিনযাপন—যান্ত্রিক সভ্যতার সেই অভিশাপ তিনি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছিলেন। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল।

"কোথায় যেতে হবে ?

মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ, বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে সব নরককুণ্ডু তৈরী করে দিয়েছে সেইখানে।...

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল...চলুন।

বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তরে বর্মা ও চীনা পল্লী পার হইয়া বাজারের পাশ দিয়া দুজনে প্রায় মাইলখানেক পথ হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বন্ধ ফটকের কাটা দরজার ফাঁক দিয়া গলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে কারিকর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙা কাঠ ও ভাঙা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিয়ে সারি সারি কয়েকটা জলের এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়তো দরজা ছিল, এখন খলে ও চটছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙ্গালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজারখানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতী কহিল, আজ কাজের দিন নয়, নইলে এই জলের কলেই দু-একটা রক্তা-রক্তি কাণ্ড দেখতে পেতেন।" [পথের দাবী]

কেবল বিদেশে নয়, স্বদেশ ভারতবর্ষেও বিদেশী পুঁজিপতিদের অর্থ শোষণের সঙ্গে দেশের মানুষের দুর্গতি ও দায়দায়িত্বহীন জীবনচিন্তা এবং পরস্পরের মধ্যে অনুভূতিহীন অমানবিক সম্পর্কের চিত্রটিও তিনি পূর্বে এঁকেছেন 'শ্রীকান্ত' আখ্যানের তৃতীয় পর্বে রেল-কুলীদের চিত্র বর্ণনায় সমানভাবে ব্যথিতবেদন চিত্তে।

"সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটো দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল।...সরকারি কাজ, মাটি-কাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হপ্তার শেষে মাপ করিয়া...মজুরি মিলিবে।...এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে, সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলোকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটিকাটার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রেকের উপর জমা করা হইয়াছে, এখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকি নাই। শুধু মাটি-কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে এ-কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।" Industrial Capital-এর মধ্যে যে অর্থনৈতিক চিন্তা, তার ভিতরে শরৎচন্দ্র শোষণের যেমন নিষ্ঠুর করালকৃষ্ণ রূপ দেখেছিলেন, তেমনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছিলেন মানুষের জীবনচিন্তার প্রতি অগভীর মনোভাব ও সস্তা আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাস-প্রমত্ততার মধ্যে জীবনের গভীর অপচয় ও অপরিমেয় বিচ্ছিন্নতাবাদ। সস্তা কৃত্রিম আনন্দ এবং আকণ্ঠ মদ্যপানের ফলে হালকা ফেনিল উত্তেজনা মানুষের জীবনকে কিভাবে ঊষর করে রিক্ততার ভারে পূর্ণ করে দেয়—যান্ত্রিক সভ্যতার এই অপসংস্কৃতির দিকটিও তিনি সমানভাবে ব্যক্ত করেছেন একই সঙ্গে: "সন্ধ্যাবেলায় নরনারী-নির্বিশেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল, দুপুরবেলার রাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে...জমাদারের গাড়ী হইতে ঢোল ও করতাল-সহযোগে প্রবল সঙ্গীতচর্চা হইতে লাগিল, সে যে কখন থামিবে ভাবিয়া পাইলাম না। কাহারও জন্য তাহাদের মাথাব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের ট্রেকেই কে একটা মেয়ের বোধ হয় জন-দুই প্রণয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নাই। এদিকে ট্রেকে এক ব্যাটা কিছু অধিক তাড়ি খাইয়াছে; সে এমনি উচ্চ কলরোলে স্ত্রীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিল যে, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। দূরে একটা গাড়ী হইতে কে একজন স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে বিলাপ করিতেছিল...লজ্জা নাই, সময় নাই, গোপনীয় কোথাও কিছু নাই—সমস্ত খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবনযাত্রার অবাধ গতি বীভৎস প্রকাশ্যতায় অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে।"

মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় নি। আধুনিকতার অন্যতম গুণ যে মানবহিতবাদ, তাকে তিনি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বরণ করে নিয়েছিলেন, আর প্রতিষ্ঠিত করতেও ছিলেন আন্তরিকভাবে তৎপর। আপন মনের চিন্তাকে তিনি শ্রীকান্তের মুখের বাণীতে মুক্ত করেছেন: "মানুষের

মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না।" যন্ত্র সভ্যতার অভিশাপে বলিপ্রদত্ত সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে আবেগভরে বলেছেনঃ "আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মরু। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াচে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস্ না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।"

মনুষ্যত্বের সাধনার সঙ্গে শরৎচন্দ্র গণতান্ত্রিক চেতনার উপাসনা করেছিলেন বলেই গণ অভ্যুত্থানের প্রয়োজনকে মনে-প্রাণে অস্বীকার করতে পারেন নি। 'পল্লীসমাজ' গল্পে সমাজতন্ত্রের যে বীজ তিনি সযত্নে বপন করেছিলেন, তার অংকুরোদ্‌গম দেখতে পাই 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে। অবশ্য কেউ কেউ সমকালীন রাজনৈতিক অন্দোলনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগ বিচার করে এই উপন্যাসটিকে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করেছেন।[২] তবে 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে দেশীয় জমিদারের অত্যাচারের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির অবক্ষয়ের রূপটি বিশ্লেষিত হয়েছে। একদিকে জীবানন্দের মতো হৃদয়হীন জমিদারের দুঃসহ অত্যাচার এবং অন্যদিকে জনার্দন রায়ের মতো নিষ্ঠুর মহাজনের নিরঙ্কুশ শোষণ— ভাগ্যহীন দুর্বল প্রজাদের কিরকম শোচনীয় অবস্থাতে নিক্ষেপ করেছিল, শরৎচন্দ্র তাঁর মানবিক সহানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মর্মবেদনার চিত্র ছিলঃ "যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্মজ্ঞান-বিরহিত, তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্বলের নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলে না, ইহার বিচার করিবার কেহ নাই—ভগবান কান দেন না, সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া আসিতেছে। এই যে আজ এতগুলি লোক গিয়া একটিমাত্র প্রবলের পদতলে তাহাদের বিবেক, ধর্ম, মনুষ্যত্ব সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার একটুখানি আশ্বাস লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, ইহার লজ্জা, ইহার দৈন্য, ইহার ব্যথা যত বড়ই হোক, যতদূর দেখা যায়, এই দুঃখীদের এই ক্ষুদ্র কৌশলটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই চোখে পড়ে না। যে অন্যায় এতগুলি মানুষকে এমন অমানুষ করিয়া দিল, তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি এতবড় বিশ্ব-বিধানে কই?"

সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান বোধ করি 'পথের দাবী' উপন্যাসেই তীব্র আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি এই উপন্যাসে বিশেষভাবে সোচ্চারিত। রামদাস তলওয়ারকরের আহ্বান প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিচিন্তার বহির্বাণী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

"শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য

কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরাও যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিত হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গোটা-কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ, কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।"

'পথের দাবী' উপন্যাসের নায়ক সব্যসাচী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলবার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন: "ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে,—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,—তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবন ধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, সৈন্য-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে,—সে-ই ত রাজশক্তি।"

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বনিয়াদ রচনা করেছিলেন বঞ্চিত, অবজ্ঞাত শ্রেণীর জীবনচিন্তাকে কেন্দ্র করে। সমস্ত বিষয়ে তাঁদের মুক্তিদান করাই ছিল তাঁর সাহিত্য ভাবনার অন্যতম ব্রত। আধুনিকতার মননালোকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মনুষ্য সমাজে এই উপেক্ষিত মানুষের সংখ্যাই অধিক; অথচ এই বৃহত্তম জনসম্প্রদায় সাহিত্য বিচিন্তাতে অবহেলিত এবং অন্ত্যজের মত পরিত্যক্ত। এদের সুখ-দুঃখ, জীবনচর্যা, সমস্যা, কল্পনা, হতাশা, প্রেম-অভীপ্সা সমস্ত কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষভাবে নিপীড়িত নারী সমাজের বিচিত্র কথা ও কাহিনী সাহিত্য রচনাতে নিত্যকালের শাশ্বত উপাদান হয়ে আছে। শরৎচন্দ্র নারীজীবনের বদ্ধ যন্ত্রণাকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরে অসংখ্য সামাজিক প্রশ্নের উতোর-চাপানে অর্গলমুক্ত করতে চান।

শরৎচন্দ্রের সমাজবাস্তবতা কোন সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি দেশের মধ্যে গণচেতনাকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার দূরীকরণে, নারীশিক্ষার প্রসারে, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অত্যাচারের উপশমে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে জাতির পাঁতির অবসানে এবং সমাজের গোঁড়ামীতে আঘাত করে এক সুস্থ কল্যাণময় মনুষ্যসমাজের প্রতিষ্ঠাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি গল্প-উপন্যাসে আপন প্রগতিবাদী চিন্তার অনুভাবনা বিভিন্ন

ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়াও তাঁর চিঠিপত্র ও আলাপ-আলোচনাতেও প্রগতিবাদী চিন্তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

শরৎচন্দ্রের সমাজবাস্তবতার ভিত্তি ছিল হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তনসম্মত সুখবাদ (Evolutionary Hedonism) এবং এর প্রয়োগ তিনি জীবনের ক্ষেত্রে তার নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সারের একজন অনুরাগী ভক্ত। তাঁর সমগ্র রচনাবলী তিনি বাংলাতে অনুবাদ করবার আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন জীবনের প্রগতি নির্ভর করে সমাজের সঙ্গে প্রগতিবাদের অবিরাম সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যে। শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন এই সামঞ্জস্যের অভাবের জন্যই জীবনের সমস্ত বিড়ম্বনা। জীবনের সুখকে বাড়িয়ে তুলতেই তিনি প্রচলিত সমাজনীতিতে অনাস্থা এনেছিলেন। 'চন্দ্রনাথ', 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি কাহিনীতে তিনি জীবনের সুখ বৃদ্ধিতে সমাজের অনুশাসনের যে নিষ্ঠুর অন্তরায় রূপ, তাকে তুলে ধরেছেন গভীর সমবেদনার তুলিতে। হার্বার্ট স্পেন্সার যেমন মনে করতেন, "Life is the continuous adjustment of internal relations to external relations" তেমনি শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, সমাজ সম্বন্ধের সঙ্গে জীবনের অঙ্গাঙ্গী সংযোগের। এর সার্থক প্রয়োগ তিনি দেখতে না পেয়েই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমাজকে আঘাত করে 'চন্দ্রনাথে' লিখেছিলেনঃ "সমাজ আমি সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মার্‌তে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মার্‌তে পার। সমাজের জন্য ভেব না।"

'চরিত্রহীনে' সমাজ ভয়ে ভীতা কিরণময়ীকে সান্ত্বনা দিয়ে সতীশ বলেছেঃ "যার টাকা আছে, গায়ের জোর আছে, তার বিরুদ্ধে সমাজ নেই।"

শরৎচন্দ্র হার্বার্ট স্পেন্সারের মত জীবনের মূল্যবোধের শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেয়েছিলেন। তিনি সমাজ ও ধর্মের সেই সমস্ত নৈতিক শাসনকে অনুমোদন করতেন, যা জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে। দুঃখজনক কাজ জীবনের মান-মাত্রা ও আনন্দকে কমিয়ে দেয়; সুতরাং যে কাজে ও নীতিবিশ্বাসে জীবনীশক্তি বাড়ে,—জীবনের দৈর্ঘ্য ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়, তাকেই তিনি জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম সুখ বলে মনে করতেন। তিনি সমাজের প্রভুত্বব্যঞ্জক নীতিবোধকে স্বীকার করতেন না। তাঁর চিন্তায় ছিল যে নৈতিক বাধ্যতাবোধ হচ্ছে মধ্যবর্তী ব্যাপার—কারণ তা পূর্বে ছিল না, পরেও থাকবে না। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অসামঞ্জস্যের দরুণ জীবনসমস্যার সৃষ্টি। যখন সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সুসামঞ্জস্য স্থাপিত হবে—সমাজের প্রভুত্ব-

বাচকতা (authoritative) ও মানুষের কর্তব্যবোধ বা নৈতিক রাষ্ট্র
(coercive) চাপ থাকবে না, তখনই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদাচরণ করবে।
ভবিষ্যতের দিকে আশাভরা দৃষ্টি নিয়েই তিনি জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য এবং মনুষ্যত্বের অবমাননাকে সমালোচনা করেছিলেন। 'শ্রীকান্ত,' 'দেবদাস,' 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' ও 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের বিবর্তনবাদী চিন্তার স্বাক্ষর সুচিহ্নিত হয়ে আছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে হার্বার্ট স্পেন্সার যে ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ (Historical Method) নীতি গ্রহণ করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের চিন্তাও ছিল সেই মার্গ অনুসারী। 'বামুনের মেয়ে' কাহিনীতে এর সার্থক বিকাশ দেখতে পাই :
"কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না…
সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে, বিচার করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সেই মরে।…

…দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধরেই ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য-মর্য্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তারপরে আবার এমন দুর্দিনও এসেছিল যেদিন এই দেশেরই রাজার আদেশে তাঁদেরই বংশধরদের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবদ্ধ করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটি এবং অনাচারের উপর তার ভিতরের মিথ্যেটা যদি জানতে…তা হলে আজ যে বস্তু তোমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেচে, শুধু কেবল সেই কুল নয়, ছোটজাত বলে যে দুলে মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে তাদেরও ছোট বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হতো …

…মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতেগড়া গণ্ডি, এ কথনো ভগবানের নিয়ম নয়। তাঁর প্রকাশ্য মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষে যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যাচারের বেড়া অনাচারে শতছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্য দিয়ে তখন পাপ আর আবর্জনাই কেবল লুকিয়ে প্রবেশ করে।"

সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের এই যে নীতি তা হার্বার্ট স্পেন্সারকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছে। তাঁর মতই তিনি আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে চাইতেন না। শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে সহানুভূতি ও সমবেদনার পূর্ণ বিকাশ হলে আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের বিরোধিতা দূর হবে—জয়লাভ করবে মনুষ্যত্বের অমর মহিমা। আত্মত্যাগ ও আত্মরক্ষা উভয়ই মানুষের জন্মগত ও স্বভাবগত প্রবৃত্তি। ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষ যখন উভয়ের মধ্যে সুসামঞ্জস্য রচনা করবে, তখনই কর্তব্যকর্মের সুখ আত্ম এবং অপর উভয়ের

পক্ষে সুখদায়ক হবে। ত্রুটিপূর্ণ সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের পূর্ণ সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়ে এই কথাই বলিয়েছেন : "যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি……প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞানে।"

সমাজ ও ব্যক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটানর জন্য তিনি অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব), 'পণ্ডিতমশাই' প্রভৃতি কাহিনীতে শরৎচন্দ্রের এই চিন্তার পরিচয় সুপরিস্ফুট। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক দূরত্ব ও বৈপরীত্য,—সমস্ত কিছুই আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের পরস্পর বিরোধ। শরৎচন্দ্র 'পণ্ডিতমশাই' কাহিনীতে নায়ক বৃন্দাবনের সঙ্গে কেশবের কথোপকথনে সাপেক্ষ নীতিজ্ঞানের (Relative Ethics) যে কথা প্রচার করেছেন, আমাদের এই ত্রুটিপূর্ণ সমাজের পক্ষে তা একান্ত প্রয়োজনীয়।

"আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না ; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।**

*** আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।

** তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পোনের-আনা লোকেই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভালো হয়, তাতে চাষা-ভূষোর ছেলেরা অধঃপাতে যায়।……আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভূষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক্ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠবে না। এ যতক্ষণ না করচ…ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।"

আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, শরৎচন্দ্রের আধুনিক চিন্তা অধুনা-কালের বিবর্তনবাদ মতবাদকে গ্রহণ ও আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর

ফলে, শরৎচন্দ্রের চিন্তার সঙ্গে আমাদের অজরা-অমরা নীতির বিরোধ বাধে ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। শরৎচন্দ্র পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন যে পৃথিবীতে কোন নীতি-নিয়ম শাশ্বত নয়—পরিবর্তনশীল। বিবর্তনবাদ অনুসারে জীবন ও জগতের যাবতীয় বস্তু যেমন ক্রমপরিবর্তন মারফৎ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে, তেমনি নীতিবোধেরও বিবর্তন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে এই নিয়মের অনুবর্তন হবে সমান ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়। এই বিশ্বাসে শরৎচন্দ্র জাতিভেদ-ধর্মের চির-শাশ্বত ঐতিহ্য এবং দেশের অতীত গৌরবের প্রতি অনড় শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে সমর্থন করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের সমাজ বাস্তবতায় আধুনিকতার পরিচয় এইখানে। তাঁর কথায়ঃ "আমার কথা—পুরান জিনিষ নিয়ে গৌরব করে কাজ হবে না। নূতন গড়ে তোল। জাত সম্বন্ধেও তাই, নাই বা থাকল জাত······২০০০ বছর আগে কি ছিল তা নিয়ে গর্ব করব না। যাদের ছিল তাদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই—রক্তেরও যোগ নেই, ধর্মেরও যোগ নেই—শুধু এক দেশে বাস করি, এই মাত্র। তাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা মৌখিক পড়ি, যোগ দেখতে পাই না। · আমার মনে হয়—মেরামত করে জিনিসটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়েছে, যেটা 'নেগ্‌লেক্ট' দ্বারা হয়ত আপনি ধ্বংস হয়ে যেত—সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করান উচিত নয়।"[৩] শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার পরিচয়ধর্মী উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন' ইতিপূর্বেই তাঁর এই ·বিবর্তনবাদসম্মত মানসিকতাকে প্রচার করেছিল। 'শেষ প্রশ্নে'র কমল তাঁর আধুনিকতার ইঙ্গিতবাহী ধ্বজা।' কোন অতীত চিন্তা বা অনুকরণ, আদর্শবোধ অথবা ঐতিহ্য কখনই কালের সীমা পরিব্যাপ্তিতে অক্ষত বা অবিভাজ্য থাকতে পারে না। অতীতের অন্ধ অনুকরণ, বৈশিষ্ট্যহীন গতানুগতিকতার প্রতি মোহ—সমস্তই জীবনের অগ্রগতির পথে বাধা, চলার পায়ে শৃঙ্খল। যে কথা তিনি চন্দননগরে আলোচনা সভায় বলেছিলেন, তারই পূর্বধ্বনি শুনি 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের নায়িকা কমলের মুখেঃ "অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে মেলে না।···ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং য়ুরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার আদর। আসল কথা, বর্তমানকালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি-না। এ-ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ। *** কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সে-ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। *** থাকবার

জন্যই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা যাবার নয় তা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনে আবার তার নতুন রূপ, নতুন সৌন্দর্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা? *** অতীতের উপদ্রবের··· চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিংবা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাও ত সত্য না হতে পারে।"

অন্য এক জায়গায় বিবর্তনবাদে বর্তমানের শাশ্বত মহিমার কথা ব্যক্ত করে কমল বলেছে: "এই চলমান সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তের পদে পদে যে সত্য নিত্য নূতনরূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না। ভাবে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। *** কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়।"

শরৎচন্দ্রের আধুনিক চিন্তার অপর পরিচয় বিবর্তনবাদী নীতিবোধের প্রচার। অর্থাৎ জগতে শাশ্বত বা চিরন্তন কিংবা স্থির বলে কিছু নেই—সবই পরিবর্তনশীল। 'শেষ প্রশ্নে'র নায়িকা কমলের মুখে লেখকের চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই: "কোন আদর্শ-ই বহুকাল স্থায়ী হয়েচে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই *** তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েচে। অতিথিকে খুশি করতে দাতাকর্ণ নিজেই পুত্রহত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোক কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে-কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। *** কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড়।"

ধর্মাচরণ বা ধর্মবোধকে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের কারণ বা উপায়ের পথ হিসাবে গ্রহণ করতে শরৎচন্দ্র একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর চিন্তায়: "ধর্ম বলতে যদি মোক্ষবাদই একমাত্র বুঝায়, জীবনকে বাদ দিয়েই ধর্ম হয়, তবে ধর্ম খুব অসার হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এ নয়। ধর্ম বলতে রিয়েলাইজেশান। যা ফ্যাকট, যা রিয়্যালিটি, তারই উপর দাঁড়াতে হবে। *** ধর্ম মোক্ষবাদ নয়। হিন্দু আজ ধর্ম বলতে (জীবনকে বাদ দিয়ে?) আত্মপ্রতারণা করছে। এত বড় ইন্‌সিনসিয়ারিটি হিন্দুর মত আর কোথাও নেই। অক্ষমতা যার মূল ভিত্তি, সে জাতি কখনও প্রতিষ্ঠা পায় না।"[৪]

জীবন ও জাতি সৃষ্টির অনুপযোগী ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণকে শরৎচন্দ্র যেমন দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, তেমনি কোন ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থকে অলৌকিক ও অপৌরুষেয় বলে বিশ্বাস করেন নি। হিন্দু ধর্মপুস্তকের কোন বিধানকে তিনি অভ্রান্তভাবে মেনে চলেন নি। গ্রহণ অথবা বর্জন সকল ক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন জাগ্রত ছিল। আধুনিকতার মূলতত্ত্ব যে যুক্তিবাদ, সন্দেহ ও সংস্কারমুক্ত চিন্তা, সেই আদর্শে শরৎচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রের বিচার ও বিশ্লেষণ করেছিলেন। মননশীলতা, অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা ছিল তাঁর সকল বিশ্বাসের ভিত্তি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানবহিতবাদের গভীর ও অবাধ মহিমা। শরৎচন্দ্র আপন চিন্তা ও মতবাদকে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীর উক্তির মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন: "কোন ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং, এতেও মিথ্যার অভাব নেই। *** সবাই নিজের বিদ্যে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়েই সত্য-মিথ্যা ওজন করে। এ ছাড়া আর মানদণ্ড নেই। কিন্তু এ জিনিস সকলের এক নয়—তুমি যাকে সত্য বলে বুঝতে পার, আমি যদি না পারি ত আমাকে দোষ দেওয়া চলে না।···যে জিনিস বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুয়েরই বাইরে, তার সম্বন্ধে মতের কত অনৈক্য হওয়াই সম্ভব। *** রূপক ত সত্য ঘটনা নয়। ওই বইখানি যে আগাগোড়াই মিথ্যা, তা না হতে পারে ; কিন্তু আগাগোড়া যে সত্য নয় সেকথা বুদ্ধির তারতম্য হিসাবে বেছে নিতে হবে না ? *** এই কথাটা সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রচার হয় না। সত্যকে সত্যের মত করেই বলতে হয়। *** মিথ্যার ভূমিকা দিয়ে মুখরোচক করার চেষ্টার মত অন্যায় আর নেই। *** মিথ্যা পাপ, কিন্তু মিথ্যায় সত্যে জড়িয়ে বলার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে। *** যা সত্য, তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই।···সত্য মিথ্যা যাই হোক, তাকে বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। চোখ বুজে মেনে নেওয়ার কোন সার্থকতা নেই।···নির্গুণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার এ-সব কেবল কথার কথা। এর কোন মানে নেই। যদি কিছু থাকে ত সে এই যে, যাঁরা এ-সকল কথা আবিষ্কার করেচেন, তাঁরাই প্রকারান্তরে বলচেন, এ-সম্বন্ধে কেউ চিন্তামাত্র করবে না—সব নিষ্ফল, সমস্ত পণ্ডশ্রম।···যে বস্তুকে অজ্ঞেয় বলে নিশ্চয় বুঝেচি, তাকে চিন্তা করাও যায় না, করিও নে। বস্তুতঃ, অচিন্তনীয়কে চিন্তা করব কি দিয়ে ? তাই অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা কোনদিন আমার নেই।···শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, সমস্ত এই গায়ের জোর আর চোখ-রাঙানি।···যেন তাঁরাই শুধু মানুষ হয়ে দেশ শুদ্ধ গরুর পাল

লাঠির গ‍ুঁতো দিয়ে ভাল পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজের ভাল কে চায় না? ব‍ুঝিয়ে বললেই ত হয় বাপ‍ু, এইজন্যে তোমার ভাল—তাই, এই-সব বিধি-নিষেধ তৈরী করে দিল‍ুম। আমাকেও ত ব‍ুঝতে দেওয়া চাই কেন এই পথে আমার মঙ্গল। তাতে ত এত চোখ-রাঙানি, এত মিথ্যে উপন্যাস রচনা করবার আবশ্যক হত না।" য‍ুগধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শরৎচন্দ্র ধর্মের অভিব্যক্তি চেয়েছিলেন। সমাজের প্রগতি ও র‍ুপান্তরের মধ্যে ধর্মের বিবর্তন প্রয়োজন। তাতে সাধারণ মান‍ুষের জীবনে আসে ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে গভীর নৈকট্য বোধ ও নিবিড় আত্মীয়তা। ধর্ম, সমাজ ও মান‍ুষের বিবর্তন থেকে বিচ্যুত হয়ে দ‍ূরের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ালে, ধর্মের শিকড়ে জীবনরস প্লাবিত হতে পারে না, পরস্পরের মধ্যে স‍ৃষ্টি হয় ঊষরতা ও সীমাহীন দ‍ূরত্ব। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নায়িকা কিরণময়ী যে কথা অসমাপ্ত রেখেছিল, 'শেষ প্রশ্নে'র নায়িকা কমল সেই অসম্প‍ূর্ণ পদ প‍ূরণ করেছে। তার উক্তিতে: "সকল ধর্মই যে আসলে এক···সর্বকালে সর্বদেশে ও সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা। ম‍ুঠোর মধ্যে ওকে তো পাওয়া যায় না। আলো-বাতাস নিয়ে মান‍ুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল করে বংশধরের জন্য রেখে যাওয়া চলে। তাই তো জীবনের প্রয়োজনে ও ঢের বড় সত্যি।···আচার-অন‍ুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাইনে, চাই শ‍ুধ‍ু এর পরিবর্তন।···ইয়‍ুরোপের সেই রেনে-শাঁসের দিনগ‍ুলো একবার মনে করে দেখ‍ুন দিকি। তারা সব করতে গেল নতুন স‍ৃষ্টি, শ‍ুধ‍ু হাত দিলে না আচার-অন‍ুষ্ঠানে। প‍ুরানোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগল তার প‍ুজো, ভেতরে গেল না শেকড়, সখের ফ্যাশান গেল দ‍ু'দিনে মিলিয়ে।···বিগত দিনের দর্শন দিয়ে যখন বর্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙার দিন।···যত উজ্জ্বল হোক, তব‍ু সে ছবি, তার বড় নয়; এমন বই সংসারে আজও লেখা হয় নি···যার থেকে তার সমাজের যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে।···বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্রের য‍ুগেও না, য‍ুধিষ্ঠিরের য‍ুগেও না। রামায়ণ-মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক‍্, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মান‍ুষের দেখাও মিলবে না, এবং মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক, তাতে ফিরে যাওয়া যাবে না। প‍ৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি নিয়েই ত মান‍ুষ? তারা যে আপনার চারিদিকে। কম্বল ম‍ুড়ি দিয়ে কি বায়‍ুর চাপকে ঠেকানো যায়?···শ‍ুধ‍ু তো হিন্দ‍ুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তো কোন-কিছ‍ু কখনো সত্যি হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়, ম‍ৃত্যু-বরণ করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহ‍ু প্রাণ বহ‍ুবার

সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাদের জিদের জোরকেই সপ্রমাণ করেচে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করে নি। যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-চিন্তাই হয় তো এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেচে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।"

শরৎচন্দ্র ছিলেন বাংলার নব জাগরণের আধুনিক চিন্তার উত্তর সাধক। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ এবং মানবহিতবাদের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার যে ত্রিধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তাকে তিনি জীবনের অনুভূতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নারী জাতির প্রতি পক্ষপাত প্রকৃত পক্ষে উনিশ শতকের নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নব মূল্যায়নের অপর পরিণত রূপ। তিনিও রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মত বুদ্ধি-মনন ও যুক্তিবাদ দিয়ে শাস্ত্র বিচার করেছিলেন। এই বিশ্লেষণী চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানবহিতবাদ—অর্থাৎ মানুষকে সমস্ত বন্ধন ও সংস্কার থেকে মুক্তি দেওয়া। শাস্ত্র বিচারে তিনি আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মত অস্তিবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কোমতের 'থিওরি অব্ পজিটিভিজমে'র সঙ্গে হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তনবাদী সুখবাদ অথবা নীতিবোধ সংমিশ্রিত হয়েছিল তাঁর জীবনদর্শনের অনুভূতিতে এবং সাহিত্যসাধনার প্রত্যয়ে। এই মতবাদের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস বা অনুরাগের ফলে তিনি শাস্ত্রের অলৌকিকত্বকে অস্বীকার করেছিলেন, দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন ধর্মাদর্শের তত্ত্বনিষ্ঠ বিধানকে। যুক্তিবাদ ও মননের মাপকাঠিই ছিল তাঁর হিন্দু ধর্মের বিধানগুলির বিচার। ইতিহাস ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচার ছিল তাঁর হিসাব-নিকাশের গ্রহণীয় তত্ত্ব।

শরৎচন্দ্র মানুষের সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য চিন্তার মূল কথা ছিল—"আমি মানুষকে খুব বড় বলে মনে করি। তাকে ছোট করে আমি মনে করতে পারি না।"[৫] তাই কোন দেশ-কাল ও চিন্তাগণ্ডীর পরিসীমাতে তিনি আপন অনুভাবনাকে সীমাবদ্ধ করতে চান নি। বিশ্বজনীনতা বা বিশ্বমানবতার সুর শরৎচন্দ্রের চিন্তার তটভূমিকে আপ্লুত করেছিল। তিনি মানুষকে ক্ষুদ্র দেশগণ্ডীর ঊর্ধ্বে তুলে আন্তর্জাতিকতার উচ্চ বেদীতে স্থাপন করতে ব্রতী হয়েছিলেন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে কমলের অভিব্যক্তি প্রকারান্তরে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি বাসনার বহিঃ প্রকাশঃ "বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেচি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে! এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই

ত ভয় ? নাই-বা গেল চেনা। বিশ্বের মানব জাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম ?…(এতে) মানুষের (সর্বনাশ) হবে না…যারা অন্ধ তাদের অহংকারের সর্বনাশ হবে।”

তবে নির্মোহ যুক্তিবাদ, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মননশীলতা দিয়ে শরৎচন্দ্র আপন বক্তব্যকে নীরস তথ্যে পরিণত করে জীবন সম্পর্কহীন করে তোলেন নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, তাঁর সাহিত্য রচনাকালে বাংলা কথাসাহিত্যে একদিকে প্রধানুসারী ঐতিহ্যবাদ এবং হৃদয়বত্তার অন্বেষণ যেমন গতানুগতিক ধারাটিকে প্রবহমান রেখেছিল, তেমনি অপরদিকে চিরন্তন ঐতিহ্য ও সংস্কারকে নব্য বিজ্ঞান ও সমাজ চিন্তার আলোকে কখনও বিশুদ্ধ করে আবার কখনও অস্বীকার করে জীবনরহস্যের অন্তর্গূঢ় অনুসন্ধান লাভের চেষ্টাও চলেছিল। লেখকের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও মতবাদ বাংলা কথাসাহিত্যকে ‘কনভেনসন’ ভাঙা মনোভঙ্গীতে রূপায়িত করেছিল। প্রধানুসারী সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন মূল্যবোধ ও জীবনগত তাৎপর্যের প্রতিষ্ঠাতে অগ্রসর হয়েছিলেন পরবর্তী কালের আধুনিক লেখকেরা। শরৎচন্দ্র ছিলেন দুইয়ের সন্ধিস্থল। তিনি সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে যেখানে জীবনের প্রকাশে বাধা বা অন্তরায় দেখেছেন, তাকে সমালোচনা করেছেন—নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে জীবন ও সমাজকে সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তবে তাঁর এই সংস্কার চিন্তা ছিল হৃদয়বাদী জীবনশিল্পীর কোমল কঠোর বিশ্লেষণ। এরই ফলে তাঁর বক্তব্য পাঠকের মনোযোগ গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি পল্লী-সমাজের কঠিন রূঢ় রূপ দেখিয়েছেন সমাজচিন্তার নানা যুক্তিহীন বিচারকে আক্রমণ করে এবং বিবর্তনবাদী ভাবধারাতে তাকে পরিশুদ্ধ করাতে চেয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যশিল্প মানবহিতবাদ এবং সমাজসচেতন মনোভাবের সঙ্গে জীবনের অসুন্দরতার প্রতি সর্বাত্মক বিরোধিতাকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করে নি।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস রচনা কোন খেয়ালী কল্পনার সামগ্রী ছিল না। সাহিত্যরচনা ছিল তাঁর জীবনসাধনা; আর এই সাধনবেদী রচিত হয়েছিল বৃহত্তর গণতান্ত্রিক চেতনা ও সমাজ-বাস্তবতার পাদপীঠ তলে। তিনি সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেছিলেন : “গল্প-উপন্যাসই জাতির প্রাণ। জীবন আর মন যখন নানা সমস্যায় ও তত্ত্ব আলোচনায় শুকিয়ে আসে, তখন এই গল্প-উপন্যাসই মানুষকে সঞ্জীবনী রসধারায় তাজা রাখে।”[৬] তাঁর ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে সব্যসাচী যে কথা শশীকবিকে বলেছেন, মনে হয় সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে এটাই ছিল শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ বক্তব্য। “কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ,

প্রয়োতন,—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,—আর কিছু না পারো শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই।"

শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার বড় কথা তিনি সমাজবিপ্লবী, পরিবর্তনপিয়াসী কিন্তু সমাজবিদ্বেষী নন। তাঁর সাহিত্যচিন্তাতে real-এর সঙ্গে ideal-এর সমন্বয় ঘটেছিল; এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অবিরাম প্রয়াস চলেছিল। কারণ তিনি জানতেন সাহিত্যের সম্পদ্ জীবন এবং মানুষই সেই জীবনের প্রকৃত অধিকারী। তিনি সংসারে দোষে-গুণে মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; এবং এও জানতেন সংসারে যেমন নিখুঁত দেবতাও নেই, তেমনি নিখুঁত শয়তানও নেই। দুইয়ের সংমিশ্রণে মানুষ ও তাদের গঠিত সমাজ।

শরৎচন্দ্রের সময় থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। এই সময় থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে সামন্ততন্ত্র বা ভূম্যধিকারীদের ভূমিকা শেষ হতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের জীবনের নিত্য তুচ্ছতা,দুঃখ-দৈন্য সম্বলিত জীবনচর্যার মধ্যে মহিমা ও গরিমার অনুসন্ধান শরৎচন্দ্রকে যে অভিজ্ঞতা দিয়েছিল, তাকে তিনি গ্রহণ করে জীবনাদর্শের মধ্যে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দিশারী ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কী এবং হার্বার্ট স্পেন্সার। হার্বার্ট স্পেন্সারের 'অতিরিক্ত সাবধানী' 'অ্যাকিউরেট' বিশ্লেষণ এবং ম্যাক্সিম গোর্কীর গভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাস্তববাদী আদর্শবোধ, তাঁকে এই দুই মনীষীর প্রতি নিবিড় অনুরাগী করে তোলে। রুশ সাহিত্যের লেখকদের জনগণতান্ত্রিক চেতনা, সুগভীর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও মানবিক সহানুভূতি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আগামী দিনে মানুষের সমাজে দীর্ঘ দিনের উপেক্ষিত লাঞ্ছিত মানুষই হবে সাহিত্যের প্রকৃত নায়ক; এদের চিন্তা ও জীবনের কাহিনীই হবে সাহিত্যের নিত্য বিষয়বস্তু। আধুনিকতার এই গণতান্ত্রিক চেতনার নান্দীপাঠ তিনি করেছিলেন এবং এই উদার মানবিক বোধকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেছিলেন: "পূর্বের মত রাজরাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"[৭]

বিশেষ থেকে নির্বিশেষের মধ্যে সাহিত্যের উত্তরণ বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের

হাতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবনকথার প্রথম কথাকোবিদ ছিলেন শরৎচন্দ্র। পরবর্তীকালের 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-'প্রগতি' গোষ্ঠীর লেখকদের হাতে যে বাংলা সাহিত্যচিন্তা উচ্চ হর্ম্যালয় পরিত্যাগ করে জনতার ভীড়ে, অবজ্ঞাত ও অপজাত মানুষের মাঝখানে নেমে এসেছিল, তার মশালচি ছিলেন শরৎচন্দ্র।

॥ ২ ॥

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্প আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে আপন আসনটি এক মুহূর্তে দখল করে নিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বরাটের মহিমায় বিরাজ করে গেছেন। এমন কি আজ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য প্রচুর বিরুদ্ধ মতবাদ ও নিন্দনীয় সমালোচনা মাথায় নিয়েও অভ্রংলিহ মহিমা ও গৌরবে সমাসীন। শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্য জগতে শুধুমাত্র নতুন ভঙ্গী, ভাব ও ভাষা কিংবা নতুন রচনাশৈলীর প্রবর্তন করেন নি, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অভিনব না হলেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবন ও সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালাকে তিনি অন্তর্লোকে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে যা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, তাকে অপরিমেয় করুণা ও হৃদয়রসে দ্রবীভূত করে মুক্তি দিয়েছিলেন লেখনীর মুখে।

শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার যে সুরটি তুলেছিলেন, তার প্রধান বাণী ছিল: জীবনের মুক্তি, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর জীবন-মূল্যবোধের স্বীকৃতি। এই চিন্তারই সরণী বেয়ে প্রকাশিত হয়েছিল নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিদ্রোহিণী রূপ, প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের বদ্ধ পটভূমিতে বিধবা রমণীর প্রেমের অভীপ্সা ও চিত্তসংকট, বিবাহিতা নারীর যৌন বুভুক্ষা ও মর্ত্যজীবন পিপাসায় প্রবৃত্তির আত্মহারা রূপ এবং উন্মাদনা ও পতিতার প্রেমের মধ্যে সতীত্বের চেয়েও অধিকতর শ্রেষ্ঠ পূর্ণ মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠা। শরৎচন্দ্র নারীর জীবন ও যৌবনের জয়গান করতে চেয়েছিলেন আপন হৃদয়ানুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শের মধ্যে যেমন আন্তর্জাতিক যুগধর্মের প্রতিফলন ঘটেছিল, শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যেও সমকালীন বিশ্বসাহিত্য নীতির চিন্তা ও অনুভূতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। শিল্পপ্রতিভা প্রকাশের সময়কালের দিক থেকে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী হলেও সাহিত্য বিচিন্তায় অন্তরচারিতাতে উভয়ের মধ্যে সমকালতত্ত্বের সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই ভাবৈক্য—চিন্তার

অন্তর্মুখিতা, ঘটনার বস্তুভার পরিত্যাগ করে 'ইনার রিয়ালিটির' অনুসন্ধান এবং জীবনে নতুন আত্মবিশ্বাসের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা।

শরৎচন্দ্র সমাজ ও ব্যক্তিমানসের দ্বন্দ্বে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার যে সুর তুলেছিলেন এবং তাতে যে আধুনিক কালচেতনা ধরা পড়েছিল, তার প্রধান কথা ছিল সংশয়, সন্দেহ এবং সর্ববিধ বন্ধনমুক্তির আন্দোলন। প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজ-বিশ্বাসের প্রতি মানুষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিতে শুরু করেছিল। এর ফলে ধর্ম, আনুষ্ঠানিক নীতি এবং সামাজিক কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে নানা যৌক্তিকতার প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। মানুষের মনে এই যে নতুনত্বের অনুসন্ধান, তার ইঙ্গিত ও কারণ ঐতিহাসিক কাল ও চেতনার মধ্যে নিহিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানা বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে মানুষের চিন্তার পরিসীমা ও ব্যক্তিসত্তার পরিমণ্ডল বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল এবং আপন অনুভূতির সীমাহীন পটভূমিকাতে নিজেকে উপলব্ধি করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। মানুষ আপন সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে বিশ্বের মানুষ হয়ে উঠবার আকাঙ্ক্ষায় হয়ে উঠেছিল অধীর। সমাজে কর্তব্যের চেয়ে নৈতিক অধিকারের দাবি হল সোচ্চারিত ; সমাজের নির্যাতন ও সংস্কারের তাড়না ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে গেল। বাইরের বন্ধন শিথিলতার সঙ্গে মনের জাগরণে সুষুপ্তির অবসান ঘটল। বহির্লোকের চেয়ে অন্তর্লোক বড় হয়ে ওঠায় মনের নানা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও স্তরভেদে বহু জটিল রহস্যের আবিষ্কার ও উন্মোচন হতে শুরু করল। সাহিত্যে দেখা দিল বৈজ্ঞানিক মন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে—কোন বিশেষ নীতি বা সমাজবোধ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিয়ামক হতে পারে না ; মনের অভ্যন্তরে গভীর রহস্যাবৃত কন্দরের অবচেতন স্তরে যে প্রবাহ নিত্য বহমান, তাতেই মানুষের সত্যকার পরিচয় ও সেখানকার অভাববোধের পরিতৃপ্তিতে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান। এই জটিল রহস্য উন্মোচনে ব্যাপৃত থাকার ফলে কথাসাহিত্য লেখকের হাতে আর হৃদয়সর্বস্বতার অনুলিপি হয়ে রইল না। বুদ্ধিবৃত্তি কেড়ে নিল লেখকের আবেগময়তাকে। সাহিত্যের অভিব্যক্তি ক্রমশঃ জটিলতর রূপ গ্রহণ করল। নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করার যে প্রবণতা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তারই পরশ লাগল আধুনিক লেখকদের মনের উপর এবং তাঁরা নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত মনে জীবনের জটিল গ্রন্থী উন্মোচনে ব্রতী হলেন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজের বিধি-নিষেধকে একপাশে সরিয়ে।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রজ্ঞাশক্তি বলে উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের মনের উপর আধিপত্য বজায় রাখার দিন ও আয়ুষ্কাল হিন্দু সমাজের শেষ হয়ে আসছে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমনের সংঘর্ষ হয়ে উঠেছে অনিবার্য এবং এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তিনি

স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ব্যক্তির অনুভূতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাই যে আগামী দিনের সমস্ত কর্মের ও চিন্তার মানদণ্ড হয়ে উঠবে—সে উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। তাই ব্যক্তিচেতনা বিকাশের বিরোধী যে অন্ধ যান্ত্রিক সমাজসত্তা, তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্পে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে বিশিষ্ট রূপ অভিব্যক্ত করেছেন, তাতে আধুনিক কালের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। অবশ্য শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, তার আলম্বন বিভাব নারীর প্রেম-অভীপ্সায় নিহিত, কারণ প্রেমের ভিতরেই মানুষের ব্যক্তিচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যের স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটে থাকে। সমাজের নিষ্ঠুর নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে আপন ভাগ্যজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এবং প্রেমসত্তাকে কখনও প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্টাকারে আবার কখনও অগ্নিআখরে আকাশের গায়ে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে চিহ্নিত করতে ব্রতী হয়েছে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের নায়িকারা।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখতে হবে শরৎচন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার দীক্ষাগুরু ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মানুষের মনের অভ্যন্তরে যে প্রেম অভীপ্সা, দুর্বহ কামনাবেগ ও চিত্তদ্বন্দ্ব নানা সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাসে আহত এবং প্রতিহত হয়ে প্রতিষ্ঠার মধ্যে রূপায়িত হতে আগ্রহী হয়; রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'চোখের বালি'তে তার আভাস দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসের নারী চরিত্রের জটিলতা শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও আকর্ষণ করেছিল। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের অপরূপ বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার ও সাহিত্যসাধনার গুরু প্রণামী দিয়ে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিলেন: "আমি ঐ চোখের বালি খানা পড়েছি ২৪ বার। আর রীতিমত ওর ওপর দাগা বুলিয়েছি। তবে আর একখানা বই……আমি 'নষ্টনীড়ে'র কথা বলছি। ওখানাও অন্ততঃ ২০ বার পড়েছি। আমার সাহিত্য রচনার দীক্ষা ঐ বই দুখানা থেকে।"[৮]

অন্যত্রও এই ঋণ স্বীকার এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়: "কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানে নি গুরু ব'লে,—আমার চাইতে কেউ বেশি মক্সো করে নি তাঁর লেখা……আমার চাইতে বেশি বার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভাল ব'লে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি।"[৯]

কিন্তু এই নিবিড় আনুগত্য সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে একটি বিশেষ পার্থক্য ও ব্যবধান রচনা করেছিলেন। আমরা জানি বিশ শতকের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। বিধবার সঙ্গে বিবাহিত পুরুষের সমাজনিষিদ্ধ প্রণয় বর্ণনাই ছিল আখ্যানটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই প্রণয়লীলার নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য কোন গুরুত্ব পায় নি। এই উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তিচেতনার বিচিত্র রহস্য প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির হৃদয়ের নিগূঢ় সংঘাত ও সংঘর্ষের সূক্ষ্ম জটিল চিত্র চোখে পড়ে—বিশেষভাবে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিঃসংশয় পরিচয় এতে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' সম্পর্কেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিনোদিনী কুলটা নারী নয়। তাকে কোন সংকীর্ণ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে তার সামগ্রিক জীবনগত তাৎপর্য ও ব্যক্তিচেতনাকে প্রসারিত করবার প্রয়াসই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। বিনোদিনীর প্রেমের আদর্শগত মহিমা ও করুণ বেদনা তার ব্যক্তিচেতনাকে প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিচেতনার বিচিত্র রহস্য প্রাধান্য পাওয়ার ফলে তিনি সামাজিক প্রশ্নকে এক পাশে সরিয়ে রেখে, সমাজ নিরপেক্ষ চিত্রাঙ্কণেই গভীরতর মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা যেন ঠিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়—তারা চিরন্তন ব্যক্তি-মানব বা ব্যক্তি-মানবী। রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তি সচেতন রোম্যান্টিক প্রেমের কাছে সমাজ প্রায় বিলুপ্ত। এরই জন্য সমাজ ও ব্যক্তি মনের সংঘর্ষ তাঁর লেখাতে তেমন পরিস্ফুট নয়। এখানে যেন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নিগূঢ় চেতনার সংঘর্ষ। প্রেম ও কামনা, হৃদয় ও শরীর, বিবেক ও প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম ও জটিল শাখায়িত ঘটনা ও মনোবিশ্লেষণ আমাদের অভিভূত করে রাখে। সমাজের প্রাধান্য স্তিমিত করে ব্যক্তিচেতনার যে বিস্তার, তাতেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। তাই 'চোখের বালি'র বিনোদিনী বিধবা হলেও বাঙালী সমাজের প্রভাব তার উপর খুব গভীরভাবে পড়ে নি। 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ এবং 'চতুরঙ্গে'র শচীশ ও দামিনী—সকলেই সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ। 'হালদার গোষ্ঠী', ও 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের প্রচলিত প্রথাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিত্বের মহিমময় স্বরূপকে পরিস্ফুট করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চরিত্রগুলি আধুনিক মন ও আধুনিক কালের সৃষ্টি। এখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অথবা ব্যক্তির সঙ্গে কোন 'আইডিয়া'র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিমানসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালী সমাজের সুপরিচিত প্রচ্ছবিটি সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায়

সকলেই ব্যক্তি সত্তার একক স্বকীয়তায় সমাজসীমাকে অতিক্রম করেছে—সমাজের অন্তর্ভুক্ত একেবারেই হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের সুগভীর কাব্যকলাসমৃদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টি, তত্ত্বনিষ্ঠ মন, আত্মপ্রত্যয়জাত বৈশিষ্ট্য ও মহিমা তাঁর সাহিত্যকে যতই বিশালতা বা বিস্তৃতি দিক না কেন, সাধারণ মানুষের সমাজ-জীবন ও জীবন-চেতনা অনুবিদ্ধ না হওয়ার জন্য তা অনেকটাই বাংলা কথাসাহিত্যে পাঠকের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদী সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের পরিচিত পরিবেশ ও সামাজিক বিন্যাসের ছাপ আপন সাহিত্যে সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত করেন নি, সেখানে শরৎসাহিত্যের পরিবেশ একান্তভাবেই বঙ্গভূমি ও বাঙালী সমাজের পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উদার মানবতাবোধের প্রকাশ থাকায়, তাঁর সাহিত্যের পটভূমি বাংলা ও বাঙালী সমাজের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থাকে নি, তাদের আবেদন বিশ্ব-মানবের বৃহত্তর চত্বরে ছড়িয়ে পড়েছে; আমরা কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনায় এই ব্যাপকতার প্রসার দেখি না। তাঁর উপন্যাসে যেখানে সংস্কারমুক্ত মন, জীবন-জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ লক্ষ্য করি, সেখানেও দেখতে পাই তাঁর পরিচিত সমাজজীবন ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ বাঙালীর হৃদয়রহস্যের শিল্পী। বাঙালী সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আদর্শ-কুসংস্কার,—এর ভালমন্দ সবকিছুর উপরে তাঁর দৃষ্টি ছিল অতন্দ্র প্রহরীর মত। আবার হৃদয়বোধের শিল্পী বলেই নর-নারীর প্রেমের রহস্য তাঁকে দুর্বার আকর্ষণে টেনেছে। ব্যক্তিচেতনার এই নিগূঢ়তম রহস্য প্রকাশের জগতে সমাজ বহুবার খড়্গপাণি হয়ে আঘাত করেছে। সেই বেদনা ও বিক্ষোভের কথা তিনি অভিভূত কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র সমাজধর্মের মূল্য স্বীকার করলেও ব্যক্তির মহিমাকে অত্যন্ত মূল্য-বান্ বলে মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সমাজ ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর হাত দিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজের জন্য সংকুচিত হতে পারে না। বরঞ্চ সমাজকেই এই স্বাধীনতার স্থান যোগাবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করতে হবে। শরৎচন্দ্র তাই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যথার্থ সম্পর্কের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন এবং জীবনের প্রেমকে তিনি সমাজের এবং ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের সার্থক প্রেক্ষাপট ও মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণও করেছেন। বিশেষভাবে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের মধ্য দিয়েই তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ, শক্তি ও জটিলতা নির্ণয়ের সুযোগ খুঁজেছেন। কারণ সমাজ ও ব্যক্তিমনের সংঘর্ষই চিত্তের জটিল রহস্য উপলব্ধির অন্যতম উপাদান।

শরৎচন্দ্র তাঁর রচনাতে সমাজ থেকে দূরে সরে যেতে চান নি। তবে তিনি কখন ব্যক্তিজীবনের উপর সামাজিক প্রাধান্য স্বীকার করে নেননি। তাঁর ব্যক্তিত্বস্পৃষ্ট

মনে যে আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছিল, তার বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেনঃ "সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে।...এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না।"[১০] কিন্তু আধুনিক কাল সমাজের এই কঠিন বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যে হিন্দু সমাজের প্রথার প্রভাবে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল, সেখানে সদ্যোজাগ্রত ব্যক্তিচেতনার অমোঘ আঘাতে সামাজিক কাঠামো ধ্বসে পড়ছে অত্যন্ত দ্রুত তালে ও লয়ে। সমাজের কঠিন অনুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ ও স্বাধীন মন প্রতিবাদ শুরু করেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সমাজের চিরাচরিত মাপকাঠি দিয়ে প্রেমের বিচার অথবা মহিমা প্রকাশ করেন নি। তিনি বরঞ্চ সমাজের চোখে যে প্রেম অবৈধ, সেখানে একান্তভাবে গভীর ও আন্তরিক হতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল শুধুমাত্র এইখানে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সমাজ নিরপেক্ষ মানুষের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের গভীরে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিক্ষেপে করে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অথবা ব্যক্তির সঙ্গে আইডিয়ার দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, সেখানে শরৎচন্দ্র একান্ত চেনা ও পরিচিত সমাজের মানুষের হৃদয় সায়রে উৎক্ষিপ্ত বিভিন্ন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে ব্যক্তিচেতনার স্পর্শটি সজীব করে তুলতে চেয়েছেন। দীর্ঘ কালের পরিচিত সমাজ পরিবেশের মধ্যে তাঁর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনাটি যেমন জাগরিত হয়েছে, তেমনি বাঙালী জীবনের রূপান্তরের আভাসটিও তিনি পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। তবে এই পরিস্ফুরণ—কখনও হৃদয়ের নিভৃত কন্দরের স্খলিত শিথিল বেদনাভারে আবার কখনও চিত্তের হোম-হুতাশনের দীপ্ত ছটায় অথবা আত্মনিবেদনের অসীম পরিতৃপ্তিতে।

শরৎচন্দ্রের রচনাবলী ও সাহিত্য-চিন্তাদর্শ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁর শিল্পীমানস সর্বদাই হৃদয়বৃত্তি অনুসরণ করেছে। তিনি নীতিবোধ ও তত্ত্ব দিয়ে মানুষের হৃদয়-সমস্যাকে ফুটিয়ে তুললেও নির্ব্যাজ বুদ্ধিবৃত্তি বা 'আইডিয়া'কে কোথাও প্রাধান্য দেন নি। তাই মনে হয়, তিনি বিশেষভাবে প্রমথ চৌধুরীর মত আধুনিক হবার সজ্ঞান প্রচেষ্টায় সাহিত্য রচনা করেন নি। তাঁর সাহিত্য রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য হিসাবে সেই বহুশ্রুত ও বহুপঠিত উদ্ধৃতিটি আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করতে পারিঃ "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা

দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেচি অবিচার, কত দেখেচি কুবিচার, কত দেখেচি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।"[১১] এই উক্তিটিতে শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে হৃদয়সংবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী লেখক। তাঁর ঘটনাবলী ও চরিত্রসৃষ্টি সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি রবীন্দ্রনাথের মত তাত্ত্বিক বা মিস্টিক লেখক নন। শরৎচন্দ্র কাহিনীর প্রেম ও মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অথবা সমাজের সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব চিত্রণে কুহেলিকা সৃষ্টি করে দার্শনিক পন্থায় জীবনের প্রশ্নের উত্তর দিতে বা সমাধান করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর রচনাতে মানুষের অন্তর্লোক অর্থাৎ মানবমনের যে চিরন্তন লীলাচাঞ্চল্য, সংঘাত, আত্মনিগ্রহ ও অন্তঃসমীক্ষা—সমস্ত কিছুতেই তিনি আপন অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিজীবনের অনুভূতিকে সম্প্রসারিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাঙালী সমাজ ও বাঙালীর পল্লীসংস্কৃতিরই সৃষ্টি। আধুনিক নাগরিক চরিত্র-বৈদগ্ধ্য ও জীবন-বিচিত্রা তাঁর খুব কম রচনাতে প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র 'বিপ্রদাস,' 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীন' ছাড়া অন্য কোন রচনাতে নগর জীবনের পরিচয় আমরা সেভাবে পাইনা।

তবে শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে মুক্ত বুদ্ধি, সংস্কারহীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদার মানবহিতবাদের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে আধুনিকতার যে শুভ উদ্বোধন ঘটেছিল, তাতে নর-নারীর জীবনচিন্তাতে অনেক রকমের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এই প্রশ্নগুলির মূল্যবোধ ও গুরুত্ব ছিল জীবনধর্মের বিবর্তনবাদী চিন্তার ভিত্তিমূলে। তাতেই অতীতের বিচার ও বিশ্লেষণ এবং প্রবহমান চিন্তা ও নীতির মূল্যায়ন হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে। সামাজিক রীতি, ধর্মাচরণ, সংস্কার, দাম্পত্যনীতি, সমাজ বিগর্হিত ও চির নিন্দিত বিধবার প্রেম এবং তার জীবনদ্বন্দ্ব, পতিতার প্রেমে মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠা, মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের (বিশেষভাবে নারীজাতির) সমাজ নিরপেক্ষ মূল্যায়ন, হৃদয় ও শরীর, বিবেক ও প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জীবনের স্বতন্ত্র অর্থ আবিষ্কার, স্বাদেশিক চেতনা, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বুদ্ধিবাদী প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছিল। শরৎচন্দ্র সংবেদনশীল ও হৃদয়বাদী লেখক ছিলেন বলেই তিনি যুগধর্মের দাবিকে এড়িয়ে যেতে চান নি। তিনি তাঁর সাহিত্য রচনাতে প্রত্যেক-

টিকে গ্রহণ করে সমাধানের জন্য দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন জীবনের মরমী শিল্পী; তাই ব্যক্তিগতভাবে কোন রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা বা সমাধানের অধিকার দাবি করেন নি। নর-নারীর ভালবাসার ছবিতে প্রেমের সহজ পথের অনেক প্রশ্ন তুলেছেন সহজ ভঙ্গীতে। অবশ্য এ কথা ঠিক, প্রশ্নগুলিই তাঁর প্রধান বক্তব্য নয়, প্রধান হচ্ছে তাদের প্রেম। এই হৃদয় বিশ্লেষণের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের দুঃসাহসিক আধুনিকতার সূচনা হয়েছে। একদিকে সমাজ-ধর্ম-নীতি প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে ঔচিত্যবোধের বিচার ও অপরদিকে বিভিন্ন স্তরে ভালবাসার মহিমা প্রকাশ,—এই দু'য়ের ভাবমিশ্রণে শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা। জীবন-জিজ্ঞাসা ও ভালবাসার অনল জ্বালা একে অপরের পরিপূরক, কেউ স্বতন্ত্র নয়—একই অঙ্গে বিষামৃত রূপ।

আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে, আধুনিক চিন্তার উন্মেষের প্রত্যুষ লগ্নে মানুষের মনে বিশ্লেষণী চিন্তার সঙ্গে অনেক প্রশ্ন গ্রহণ ও বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে উদয় হয়েছিল। এই প্রশ্নগুলি ছিল আধুনিকতার একটি বিশেষ রূপ,—যদিও একমাত্র নয়। সকল প্রশ্নের সমাধান মানুষ চেয়েছে জীবনের মঙ্গলের জন্য, তার প্রেমের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তাই ভালবাসা বা প্রেমের মর্যাদাই হচ্ছে জীবনচিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা। পতিতাদের মধ্যে নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের যে পূর্ণ প্রকাশ শরৎচন্দ্র আপন অভিজ্ঞতার আলোকে লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে তাঁর জীবনদৃষ্টির বিচার ও মনুষ্য চরিত্র পর্যবেক্ষণে একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল। জীবন ও সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যে নতুন প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর আধুনিক মনের পরিচয়। এই নতুন মূল্যবোধ থেকেই তিনি বলেছিলেন,

(১) "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড় *** সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?"[১২]

(২) "সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।"[১৩]

স্মার্ত রঘুনন্দন শাসিত হিন্দু সমাজের অধিবাসী এবং নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও শরৎচন্দ্র এই ধরণের চিন্তা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। কারণ তাঁর নিজস্ব বৈজ্ঞানিক মন ও যুক্তিবাদ সর্বক্ষেত্রে সকলের উপর কাজ করত। তিনি নারীত্বের মহিমাকে স্বীকার করতেন। সমাজ অথবা পরিবারের কল্যাণ এবং মঙ্গল চিন্তার বেদীমূলে নারীর কন্যা-জায়া ও জননীর ত্রিমূর্তি স্থাপন করে সমাজবাস্তবতার

কাঠামোর মধ্যে তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর এই প্রয়াসের চিরন্তনী রূপ 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দু, 'রামের সুমতি'র নারায়ণী, 'মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'পল্লীসমাজে'র বিশ্বেশ্বরী, 'চরিত্রহীনে'র সুরবালা ও 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মৃণাল প্রভৃতি নারী চরিত্রে দেখতে পাই। তবুও তিনি নারীর পরিবারকেন্দ্রিক কল্যাণময়ী মূর্তির মধ্যে নারীত্বের সমস্ত রূপ ও প্রকৃতি খুঁজে পাননি। তিনি অনেক সতী নারীর মধ্যেও স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও মনুষ্যত্বহীনতার সন্ধান পেয়েছিলেন। বিশেষভাবে 'চরিত্রহীনে'র অঘোরময়ী চরিত্র তাঁর কাছে ছিল এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আধুনিক সময়চেতনা এবং যুগধর্মের আলোকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সতীত্বের মহিমা নারীর একমাত্র পরিচয় হতে পারে না। নারীত্বের পূর্ণ প্রকাশ দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের মধ্যে নারীত্বের সফল জাগরণ। এই মানস অভ্যুত্থান যেমন সামাজিক ও পারিবারিক গৃহকোণে ঘটতে পারে, তেমনি এই চত্বরের বাইরে সংসার সীমান্তে নিগৃহীতা পতিতা সমাজেও মনুষ্যত্ব স্ফুরণের অবকাশ কম নয়। যারা সংসারে পতিতা অথবা অশুচি বলে নিন্দিতা, তাদের মনের চিন্তা, মানসিক ঔদার্য ও উৎকর্ষকে শরৎচন্দ্র বিচার করেছেন সাংসারিক স্থূল সতীত্বের মানদণ্ডে নয়—মনুষ্যত্বের দৃষ্টিকোণ দিয়ে। তিনি কোনদিনই সতীত্বকে নারীজাতির পরম সম্পদ বলে মেনে নিতে চান নি—বরং এই প্রাচীন বিশ্বাসকে বহুলাংশে কুসংস্কার বলে মনে করতেন। সংকীর্ণ সমাজমনের বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ ব্যক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করার যে প্রচেষ্টা এবং যা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক, তাকে শরৎচন্দ্র মনে-প্রাণে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পতিতাদের সম্পর্কে তিনি অনেক জায়গায় অনেক সহানুভূতির কথা বলেছেন। সে সমস্ত কথাকে গ্রন্থীবদ্ধ করলে যা রূপ নেয়, তা আমরা আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করব :

(ক) "সমাজের চোখে এরা নোংরা আবর্জনা, অথচ এদের মনের মধ্যে যে মানুষটি বিরাজ করছে—কত মহৎ সে মানুষ! অনেক সাধ্বী স্ত্রীও তার স্বামীর··· বিপদে এতখানি বিচলিত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে না। *** এদের কথা কবে আমাদের সাহিত্যে স্থান পাবে!"[১৪]

(খ) "আমার বিরুদ্ধে এদের সব চাইতে বড় অভিযোগ, পাপীর চিত্রকে কেন আমি অমন মনোহর করে এঁকেছি। *** তাদের অপমান করতে আমার মন চায় না। বলি, তারাও তো মানুষ, তাদেরও তো নালিশ জানাবার অধিকার আছে। মহাকালের দরবারে তাদের বিচারের দাবী একদিন তোলা রইল। সংস্কারের মূঢ়তায় এ কথাটা কেউ স্বীকার করতেই চায় না। আর তাছাড়া, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব—সে তো

সতীত্বের চাইতেও বড়। *** বাইরের রূপটাই এদের আসল পরিচয় নয়। এরাও মানুষ, এদেরও হৃদয় আছে এবং হৃদয়ের যে সব সৎপ্রবৃত্তি, তাও এদের মরে যায় নি। আর, কেন যে এরা এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছে, সেজন্য দায়ী তো এরা নয়, দায়ী আমাদের সমাজ। এই হৃদয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে, আমাদের সংসারের সতী-সাধ্বীদের চাইতে এরা কোন অংশে কম নয়।"[১৫]

(গ) "আমি মানুষকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমি দেখেছি, কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মানুষের বিচার করতে গেলে আমরা ভুল করে থাকি। মেয়েদের ক্ষেত্রেই আমাদের এই বিচার-বিভ্রম বেশী ঘটে থাকে। আমাদের এই সনাতন সমাজের বিচারে কোন মেয়ে যদি 'সতী' হয় তবে তার সাত খুন মাফ। অথচ আমি নিজে দেখেছি, সমাজ পঞ্চ মুখে 'সতী' বলে যে সব মেয়ের প্রশংসা করে, তাদের কারো কারো ভেতর স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার অন্ত নেই। এদের কারো কারো চুরি বিদ্যাটিও যে জানা আছে, এ তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর যারা অবস্থাচক্রে বা সাময়িক দুর্বলতার বশে সতী ধর্মের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তাদের ভেতরেও যে মহত্ত্ব বা হৃদয়ের ঔদার্য থাকতে পারে, সে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ***

*** সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, আর নারীদের ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? সতীত্ব সেই মনুষ্যত্বের একটি মাত্র দিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাটি নয়। *** সত্যের আলোকে মানুষের বিচার কোরো, সংস্কার মুক্ত মন ও সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে মানুষকে দেখো।"[১৬]

শরৎচন্দ্রের এই আলোচনাগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি বিবর্তন নীতিবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ-বাস্তবতার ক্ষেত্রে হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদ যেমন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এইজন্য তিনি 'সতী' ধর্মের অর্থ ও মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ও একনিষ্ঠ প্রেম এবং সতীত্বের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এই পরিবর্তিত মানসিকতাই শরৎচন্দ্রের আধুনিকতা এবং তাঁর রূপান্তরিত বোধি-চিন্তার মন্থন থেকে উঠে এসেছে চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী, বিজ্‌লী, ও সাবিত্রী প্রভৃতি পতিতারা। এই হতভাগিনীরা নিজের জীবনে আকণ্ঠ গরল পান করে প্রেমাস্পদের জন্য বিলিয়ে দিয়ে গেছে অমৃতসুধা। সমাজের উপেক্ষিতারা শরৎসাহিত্যে মনুষ্যত্বের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে কল্যাণী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র কোনদিনই সতীত্ব এবং নারীত্বকে সমার্থক মনে করে একাসনে বসান নি। এই প্রসঙ্গে তিনি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বালবিধবা নিরুদিদির পদস্খলন ও

করুণ জীবন পরিসমাপ্তির কাহিনী বর্ণনা করে প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন করেছেন : "নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয় ? এই বাল-বিধবা, যৌবনের দুঃসহ তাগিদে যদি তাঁর দেহটাকে পবিত্র না রাখতেই পেরে থাকেন, তাই বলে কি তাঁর অন্তরের অন্য সব গুণগুলিই মিথ্যে হয়ে যাবে ? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই কি তিনি পাবেন না ? মানুষের প্রকৃত রূপ আমরা পাই কোত্থেকে ? তার দেহের আবরণ থেকে, না তার অন্তরের আচরণ থেকে ***

এই কারণেই আমি সতীত্ব ও নারীত্বকে পৃথক করে দেখাতে বাধ্য হয়েছি।"[১৭]

শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজ নারীর উপর সতীত্বের বিধান চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কিংবা জীবনভিত্তিক নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই সে করে নি। অথচ অসহায় বিধবা নারী যদি কোন পরিপার্শ্বিক কারণে অথবা চাপে কিংবা জীবন-যৌবনের প্রাকৃতিক নিয়মের দাবিতে নৈতিক আদর্শ থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে, অমনি সমাজ তার মুখের উপর সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়। স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে আত্মগ্লানি ও চিত্তবেদনার দুঃসহ মর্মপীড়ায় সে গ্রহণ করে পতিতাবৃত্তি অথবা আত্মহত্যার উদ্বন্ধনরজ্জু। শরৎচন্দ্র যেমন সমাজের কাছে জীবনের দাবি পেশ করেছেন, তেমনি সমাজের অরুন্তুদ নিয়ম-নীতিকে আক্রমণ করে ব্যঙ্গচ্ছলে প্রশ্ন করেছেন : "দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর (নিরুদিদি) মুখেরউপরেই তাহার সমস্ত দরজা জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে, কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই এক প্রান্তে অন্তিমশয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায়, লজ্জায়, নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাসকাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহকাল ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোনো স্মার্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।"[১৮]

শরৎচন্দ্র স্বাভাবিকভাবে নারীর উপরে কোন আদর্শের তিলক অথবা বিভূতি-গৌরব দান করতে চান নি। তিনি নারীকে চিরন্তন রক্ত-মাংসের মানবী বলে মনে করতেন। এজন্য তিনি তাদের জীবনচিন্তায় ও কর্মে অথবা আদর্শে পৌরাণিক দেবী প্রতিমা কিংবা পুরাণ-কাহিনীর নায়িকা করে তোলেন নি। ত্যাগ-প্রেম-সেবা-প্রীতি-সহানুভূতি প্রভৃতি নানা গুণকে তিনি যেমন নারীজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম বলেই গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি তাদের দেহ ও মনের কামনা, জৈব ইচ্ছা, অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির কণ্ডূয়ন ও আশ্লেষের প্রতি অনুরাগকেও

কোনদিন অস্বাভাবিক অথবা অপরাধ বলে মনে করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে সতীত্ব কোন ধর্ম নয়। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশকেই তিনি সতীত্ব বলে মনে করতেন আর এরই পাদপ্রদীপে নারীত্বের প্রতিষ্ঠা। প্রথাবন্ধ সংস্কার 'সতীত্ব' শব্দটিকে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে আবদ্ধ করে তার বৃহত্তর তাৎপর্যকে যান্ত্রিক সংস্কারে পরিণত করেছে। শরৎচন্দ্র 'সতীত্ব' শব্দটির মানবিক মূল্য আবিষ্কার করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর আধুনিকতার তাৎপর্য এখানেই। তিনি লাঞ্ছিতা নারীর অগৌরবের অর্থান্তর ঘটিয়ে গৌরবের মহিমা দান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

সাহিত্য রচনার উষালগ্ন থেকে শরৎচন্দ্র পতিতাদের বিশেষ সহানুভূতির চোখে দেখেন। তাদের বঞ্চিত জীবনের অন্তরালে পারিবারিক জীবনপিপাসা ও গার্হস্থ্য কুলধর্মের প্রতি যে সুগভীর আগ্রহ চিত্তের অন্তরালে অন্তহীন ব্যথা-বেদনা ও অশ্রুজলে সংমিশ্রিত হয়ে আত্মগোপন করে আছে, তাকে তিনি জীবনের নিবিড় সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রত্যেক পতিতার মধ্যে সাংসারিক জীবনাগ্রহ ও মাতৃত্বের তৃষ্ণা 'বক্ষজুড়ে' বিরাজ করেছে। 'শ্রীকান্ত' কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর মুখে এই কামনার অভিব্যক্তি ঘটেছে ঃ "বাঃ, এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষ মানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! *** আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভালো হতো।" অথবা, শ্রীকান্তের অনুভূতিতে ঃ "রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম, তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অধীর যৌবনের সমস্ত আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। * * * আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদানিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়?"

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনকালের রচনা 'শুভদা'তেও (মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত, ১৯৩৮) পতিতা রমণী কাত্যায়নী চরিত্রে গার্হস্থ্য জীবনপ্রেম ও পারিবারিক জীবনবুভুক্ষা ফুটে উঠেছে। নানা সামাজিক কারণে অথবা জটিল পরিস্থিতিতে মেয়েদের গৃহজীবনের পরম নির্ভর-আশ্রয় ও পরিবেশ ত্যাগ করতে হয়। এই পরিত্যাগের পিছনে হয়তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না; কিন্তু বঞ্চনার বিষবাষ্পে তাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে যায়। ঘরে ফেরার পথ থাকে না, অথচ ফেরবার ব্যাকুলতাও কমে না। শরৎচন্দ্র এই জীবনযন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নিন্দা করেছিলেন সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসনের।

'শুভদা' গল্পে কাত্যায়নীর মুখে তার চিন্তারই প্রতিধ্বনি শুনি। সে নিন্দিতা রূপোপজীবিনী হয়েও হারাণচন্দ্রকে বলেছে: "তোমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, একবার ঠকলে আর একবার উঠতে পার, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারব না, আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কারো দয়া হবে না। লোকে বলে 'যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন', আমাদের সে ভরসাও নেই।"

শরৎচন্দ্র পতিতা রমণীর প্রেমে যেমন গার্হস্থ্য জীবনাগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন, তেমনি তাদের অন্তর্মুখী প্রেমের দহন জ্বালাও দেখিয়েছেন। প্রেমাগ্নির 'দহনদানে' অগ্নিশুদ্ধ হয়ে তারা যেন মনুষ্যত্বের গরিমায় ও দুর্লভ বৈভবে অধিষ্ঠিত হয়েছে। 'দেবদাসে'র চন্দ্রমুখী, 'আঁধারে আলোর' বিজ্‌লীর সম্বন্ধে একথা বলা যায়। চন্দ্রমুখী ও বিজ্‌লীর প্রেম ও তাদের প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জনে বিপ্রলব্ধা রমণীর ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এদের উভয়ের ভালবাসাতে রোম্যান্টিকতার ছাপ থাকলেও পতিতা জীবনের কোন কালিমা তাদের স্পর্শ করেনি। প্রেমের নিবিড় আকর্ষণে উভয়েই যেন সর্বরিক্তা 'বিরহিনী রাই।' পথের মধ্যে দুর্বিষহ দুঃখ সহনে তাদের প্রেমের শুচিতা ও জীবনের পরীক্ষা হয়েছে। চন্দ্রমুখী ও বিজ্‌লী উভয়েই তাদের প্রণয়ীর জীবনসঙ্গিনী হতে চেয়েছে; কিন্তু সামাজিক বাধা অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এই বাধা-নিষেধের মধ্যে যে যন্ত্রণা বা ব্যথা; সেখানেই লেখক প্রশ্ন তুলেছেন। জীবনপ্রশ্ন ও জীবনের প্রেমবুভুক্ষা এই দুই চরিত্রকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সমাজ উপেক্ষিতা চন্দ্রমুখীর অন্তর্মুখী প্রেমের হৃদয়বেদনা না বলা বাণীতে নিঃসীম গভীরতায় বিলীন। দেবদাসের প্রত্যাখ্যান সে অসীম প্রাণশক্তি দিয়ে সহ্য করেছে: "সে অবুঝ নয়, তাই সহজেই বুঝিল। আর যাহাই হোক; এ-জগতে তাহার সম্মান নাই। তাহার সংস্পর্শে দেবদাস সুখ পাইবে; সেবা পাইবে, কিন্তু কখনো সম্মান পাইবে না।"

চন্দ্রমুখীর যে হৃদয়বেদনাকে শরৎচন্দ্র অপ্রকাশ্য, অকথিত এবং অনুচ্চারিত উপলব্ধির মধ্যে অস্ফুট রেখেছিলেন—জীবনের পরবর্তী স্তরে 'আঁধারে আলো', (১৯১৪) কাহিনীতে পতিতা বিজ্‌লীর দুঃখ ও ব্যথাতে তাকে আর অব্যক্ত রাখেন নি। নারীত্বের জাগরণে একজন মূক অপরজন মুখর। মনে হয়, সময়ের ব্যবধান লেখকের চিন্তাতে পরিবর্তন এনেছিল। চন্দ্রমুখীর মত উপেক্ষার মধ্য দিয়ে পতিতা বিজ্‌লীর নারীত্ব জন্মলাভ করেছে। নায়ক সত্যেন্দ্রের উপেক্ষা ও নিষ্ঠুর সমালোচনা বিজ্‌লীর ইন্দ্রিয়প্রমত্ত জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। যে জীবনবোধ স্থূল দেহলালসার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তা বিশালতার মধ্যে মুক্তি পেয়ে আত্মধিক্কার ও অপরিসীম যন্ত্রণার

ভিতরে পবিত্র হয়েছে। পতিতা রমণীর অপমৃত্যু ঘটেছে, জন্মলাভ করেছে মনুষ্যত্ব-বোধ। এ যেন দীর্ঘ জড়িমা ও সুষুপ্তি অবসানে হৃদয়ের জাগরণ। চন্দ্রমুখীর মতো বিজলীও এক মুহূর্তে রঙ্গিনী সাজ ফেলে বলেছে: "আর না। বাইজী মরেচে—*** যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্য্য উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু।" বিজলীর মানস রূপান্তর লেখকের অনুভূতিতে আরও গভীর। তাঁর কথায়: "সে ভালবাসিয়াছে। যে ভালবাসার একটা কথা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাই হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে। *** নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না। বিজলী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী। আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা নারীদেহ। ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে এ-ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃত স্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে কি যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে ***।" স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই যে শারীরিক পরিবর্তন ও মনের রূপান্তর, তাতে পতিতা রমণীর নারীত্বের জাগরণের সঙ্গে সীমাহীন দুঃখের যন্ত্রণাবোধ ও বৃহৎ প্রেমের অঙ্গীকার একসঙ্গে জন্মলাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের আধুনিক চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তির প্রেমকে নির্বিশেষ করা এবং বিশালতার মধ্যে মুক্তি দেওয়া। তিনি বিজলীর প্রেমকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না করে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের স্পর্ধিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় এখানেই। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কেবলমাত্র সমাজ নিয়ন্ত্রিত পথেই প্রকৃত প্রেমের উৎসার, প্রকাশ ও পুষ্টি ঘটে না। সমাজনিষিদ্ধ প্রেমেই নর-নারীর ভালবাসার সর্বোচ্চ বিকাশ। সামাজিক বাধায় প্রেমের দাবি, অধিকার ও গতিবেগ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই রূপান্তরিত মূল্যবোধের ভিত্তিতেই শরৎচন্দ্র আপন আধুনিকতার স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে।

চন্দ্রমুখী ও বিজলীর মত অন্তর্মুখী প্রেমের করুণ কথাচিত্র শরৎচন্দ্রের চিন্তায় বিকশিত হয়েছে 'শ্রীকান্ত' ভ্রমণোপন্যাসে রাজলক্ষ্মী চরিত্র রূপায়ণের মধ্যে। নারী মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে তিনি এই নায়িকার রূপ নির্মাণ করেছেন। একটি বাইজীর প্রেম আন্তরিকতায়, ত্যাগে, তিতিক্ষায়, দুঃখসহনে এবং আপন চিত্ত দহনে কত উচ্চ পর্যায়ের হতে পারে, তারই বাণীরূপ এই চরিত্র। সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের চাপে তার জীবনের একান্ত শৈশব লগ্নেই বিয়ের প্রহসন ঘটেছে। দারিদ্র্যের ভারে জর্জরিত হয়ে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে জননীর শাঠ্য ও কাপট্যে বরণ করতে বাধ্য

হয়েছে পতিতা জীবনের গভীর গ্লানি ও অভিশাপ ; অথচ শৈশবের প্রেম হৃদয় বিনিময়ের মাধুর্য ও পবিত্রতায় নারী জীবনের স্বপ্নকে সে রক্ষা করেছে আন্তরিক প্রযত্নে। রাজলক্ষ্মী আপন হৃদয়-বিশ্বাস, প্রেম ও পরিণয়ের কথা যা অনেকবার সে শ্রীকান্তকে শুনিয়েছে, তাতে যেমন একদিকে রোম্যাণ্টিক মনের অনুভূতি ও কল্পনার বিকাশ ঘটেছে, তেমনি সাধনবেগটুকুও কোন কারণেই গোপন থাকেনি। রাজলক্ষ্মী তার জীবনব্যাপী সাধনার কথা উল্লেখ করে কমললতাকে বলেছেঃ "আমার বয়স তখন আট-ন' বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হলে আমার বর। বর। বর! *** তারপরে অনেকদিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালুম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া হ'লো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ আর একদিন হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।*** আমার ছেলেবেলার সেই রাঙা মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই মালাই চিরদিন থাক দিদি।"

শরৎচন্দ্র নারীর হৃদয়ে প্রেমোন্মেষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নি—কারণ তা দুর্জ্ঞেয় ও চির রহস্যময়। শরৎসাহিত্যে কোনখানেই প্রেমের প্রসাধন কলা নেই—সাধন বেগের দুস্তর বাধার সঙ্গে অশ্রুজলের করুণ চিত্র, দীর্ঘশ্বাস এবং প্রতীক্ষার বেদনভার মিশে আছে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মুখে নারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্বের অপার রহস্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেনঃ "এ কি বিরাট অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পিলে রোগা মেয়েটা তামার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল, এবং বঁইচি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র-পুজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। বিস্ময় সে জন্যও নয়। নভেল-নাটকেও বাল্য প্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শতকোটী মিথ্যা প্রণয় অভিপ্রায়ের মধ্যে কোন্-খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?"

রাজলক্ষ্মীর এই যে প্রেমনিষ্ঠা, আপন ভালবাসা সম্পর্কে গৌরববোধ এবং প্রকাশ্য স্বীকৃতি, তা সমাজনিষিদ্ধ প্রেম বলেই এতখানি উজ্জ্বল হয়েছে। তার শ্রীকান্তের প্রতি ভালবাসাতে এমন একটি পবিত্রতা আছে, যা সমাজবিরুদ্ধ হলেও মনকে কলুষিত করে না—বরং ভালবাসার সৌরভে অন্তর প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু

এই ভালবাসাই রাজলক্ষ্মীকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। তার অন্তর্মুখী প্রেম সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রশ্ন তুলেছে মানুষের কাছে। শ্রীকান্তের কাছে তার প্রশ্ন একান্তভাবে সমাজকেন্দ্রিক :

"আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক্, ভাল হতে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না ; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে পড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?" রাজলক্ষ্মীও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী ; তবে এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে উগ্রতা নেই—নম্রনত মেঘের মত ধীর ও গম্ভীর। তবুও যেখানে নারীর আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দাবি প্রতিষ্ঠিত হতে সে লক্ষ্য করেছে, সেখানেই তার আন্তরিক সমর্থন নৈতিক দাবিতে উচ্চারিত হয়েছে। শ্রীকান্তের কাছে প্রেরিত চিঠিতে অভয়ার জীবনপ্রশ্নকে সমর্থন করে তার অপমানিত লাঞ্ছিত নারীত্বের বিরুদ্ধে সমাজের নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক নীতির সমস্ত অভিযোগকে খণ্ডন করে রাজলক্ষ্মী অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছে। এই পত্রখানির অংশবিশেষ আমাদের আলোচনার স্বার্থে গ্রহণ করা কর্তব্য, কারণ এতে রাজলক্ষ্মীর আধুনিক মনের পরিচয় আছে।

"রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটী নমস্কার জনাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই ; তিনি শুদ্ধ মাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য।…অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তাঁর ভিতর যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইয়াছি। তাঁর কর্মের বিচার একটু সাবধানে করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাট্‌খারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।"

আমরা শ্রীকান্ত ভ্রমণোপন্যাসের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব মুহূর্ত থেকে শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রের যে বিকাশ ও ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করি, তাতে একটি জটিল জীবনদ্বন্দ্বের কাহিনী স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজলক্ষ্মী সমস্ত জীবন ধরে আপন কৃতকর্মের বিশ্লেষণে আত্মাবিষ্কারে রত থেকেছে, এবং জটিল ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্তি পায়নি। সংশয়, সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার মধ্যে মানুষের এই আত্মানুসন্ধান একান্তভাবেই আধুনিক। শরৎচন্দ্র একই রমণীকে রাজলক্ষ্মীরূপে পারিবারিক জীবন-বুভুক্ষায় ও অন্যদিকে পিয়ারী হিসাবে বাইজী সত্তার বিপরীত মেরুতে স্থাপন করে নারীর জীবনদ্বন্দ্বের polarisation-এর যে প্রয়াস করেছেন, তাতে আধুনিক জীবনের তৃষ্ণা ও প্রবাহ একই সঙ্গে গ্রন্থীবদ্ধ হয়েছে।

আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে বড় কথা মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা সন্দেহ ও সংশয় হিসাবে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনবেদীতে অনেক প্রশ্ন তুলেছে। আধুনিক কালে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ভিত্তিতে যে প্রশ্ন সব চেয়ে বৃহৎ ও জটিল, তা—বিবাহ বড়, না প্রেম মহৎ? রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস থেকেই এর সূচনা। শরৎচন্দ্রের আধুনিক জীবনপ্রশ্নও এইখানে। তবে রবীন্দ্রনাথের সমাজ নিরপেক্ষ মতবাদ শরৎচন্দ্রে নেই। শরৎচন্দ্র সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে কোন দিন চান নি; তাই তাঁর নায়িকারা জীবনদ্বন্দ্বে ও চিত্ত সংঘাতে অধিক ক্লান্ত। রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব—তার পারিবারিক সত্তার সঙ্গে বাইজীসত্তার চিত্তসংঘাত। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি মানসের সংঘাত। তাই তীব্রতা ও দহন জ্বালার দিক থেকে এর ভার গুরু ও খুবই দুঃসহ। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী সামাজিক দায়িত্ব রক্ষার চাপে ক্লিষ্ট ও খিন্ন হয়েছে। চিত্তে নারীত্বের বাসনা ও কামনার অপূর্ণতা এবং বঞ্চনার বেদনাবোধকে কখনো হাসি, কখনো উপেক্ষা অথবা সাধু সঙ্গের আড়ালে সে গোপন করতে সচেষ্ট হয়েছে। তবুও রাজলক্ষ্মী বিদ্রোহিণী,—অভয়ার মত উচ্চ ভাষণে আপন দাবি, জীবনমর্যাদা এবং নারীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী না হলেও তার অন্তর্মুখী প্রেম ও স্থির জীবনচিন্তা সমাজের অনুশাসনকে স্পর্দ্ধাভরে উপেক্ষা করেছে। এমন কি সতীনপুত্রের জননী গর্বও তার প্রেমাস্পদের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমকে সংকোচের লজ্জা দিয়ে খর্ব করতে পারে নি। শরৎচন্দ্র প্রেম এবং বিবাহ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সীমারেখা না টানলেও, প্রেম যে হৃদয় সম্পর্কহীন বিবাহের সামাজিক নিয়মের অনুশাসনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং হৃদয়ের অনুভূতি ও কামনা যে সর্বদাই সমাজ শাসনকে অতিক্রম করতে চায়, তাকেই তিনি রাজলক্ষ্মীর জীবনঘটনার পৌর্বাপর্য বিচারে তুলে ধরেছেন। জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে ও সুগভীর সহানুভূতির মর্মস্পর্শে তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছিল যে, মানুষের অন্তর জিনিসটা অন্তহীন এবং অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ। সীমাহীন বিশালতার মধ্যে আত্মার আসন বিস্তৃত। শরৎচন্দ্রের পতিতা রমণীরা মানবত্বের মহনীয়তায় প্রত্যেকে দেবদূতী।

তাই পতিতাদের প্রেমে আমরা সর্বদা একটি বিশালতার ব্যঞ্জনা দেখতে পাই। এই মহত্তর বোধ বা 'বড় প্রেম' তাদের জীবন ও চিন্তার নিত্য সহচর। মনে হয়, শরৎচন্দ্র তাঁর বাস্তব জীবনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও আন্তরিক শিল্পীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকার বলেই অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা শ্রেণীর প্রেমানুভূতিতে যে বৈভব দেখেছিলেন, তার দিকে তাকিয়েই উল্লেখ করেছিলেন: "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।" 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রীর প্রেমও

এই একই কারণে মহীয়ান্। তার একনিষ্ঠ ব্যক্তিপ্রেম ও অন্তর্মুখী তেজস্বীতা প্রেমের পাত্র সতীশকে স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী বা আপন আকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তির গ্রন্থীতে আবদ্ধ করতে দেয় নি। শরৎচন্দ্র আরও উপলব্ধি করেন যে পতিতাদের অনুভূতিতে একটি অশুচিতার বেদনা আছে। এই বেদনাবোধই মনে হয় তাদের সমাজের প্রতি একনিষ্ঠ করেছে। বৃহত্তর মনুষ্য সমাজ ও পারিবারিক মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তারা নিজেকে সরিয়ে এনেছে ;। কারণ তাদের হৃত মর্যাদা ও অধিকার, যা ক্ষণিকের বিভ্রান্তি বা মোহপাশে বিলুপ্ত হয়েছে, তাকে কোন মতেই প্রতিষ্ঠিত করা চলেনা পুনর্বার—তাই তাদের এই অভিমান। আহত চিত্তবেদনা ও জীবনবঞ্চনা থেকে জন্মলাভ করেছে 'নারীত্ব', যা ভোগবাদের বৃহত্তর ক্ষুধা ও আত্মরতির পরিতৃপ্তিকে উপেক্ষা করে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মঙ্গল আলোকে পবিত্র হয়েছে। অনুরূপ কারণের জন্যই সাবিত্রী সতীশকে ফিরিয়ে দিয়েছে নিজের জীবন থেকে অত্যন্ত দৃঢ় আন্তর শক্তিতে : "সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি ত তাকে মানি।*** সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন। *** ভালবাসি কি না! নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? *** তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা দিতে পারলুম না।*** এই দেহটা আমার আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তোমার পায়ে দেবার যোগ্যতাও এর নেই। এই দেহ নিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে অনেকের মন ভুলিয়েচি, এ ত আমি কোনমতেই ভুলতে পারব না! এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পূজো হবে না।*** যতদিন বাঁচব, যেখানে যে ভাবেই থাকি, এ (মন) তোমার চিরদিন দাসীই থাকবে।" শরৎচন্দ্র সাবিত্রীর প্রেমের মধ্যে যে আত্মবিলুপ্তি বা আত্মলোপের চিহ্ন এঁকেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত পতিতা নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেহ অশুচিতার অন্তরালে তারা প্রত্যেকেই যে চিত্ত ও আপন ধর্ম-বিশ্বাসের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, তা সাবিত্রীর কথাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সংস্কারমুক্ত মনে একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, পতিতা নারীদের প্রতি বৃহত্তর জনসমাজ মানসের নৈতিক ও সামাজিক বিচারবুদ্ধির পরিবর্তন ঘটান। ফলে, সমাজের ক্ষতস্থানে তিনি চালিয়েছিলেন অস্ত্রোপচার। অবশ্য অপর আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি মানবহিতবাদী চিন্তায় দীক্ষিত ছিলেন বলে প্রেমের পাত্র-পাত্রীর বিচারে কোন শ্রেণী বৈষম্য রাখতে চাননি। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে সমকালে অনেকে সাহিত্যে দুর্নীতি আমদানি করার অভিযোগ এনেছিলেন, দায়ী করেছিলেন সাহিত্যে 'sense-

of immorality' প্রচার করায়। গতানুগতিক, স্থির আদর্শপ্লুত, সমাজনীতির অনুশাসন সমর্থিত, যুক্তি-বিচার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন বাংলা সাহিত্য বিচিন্তালোকে শরৎচন্দ্র যে ঝড় তুলেছিলেন, তাতেই তাঁর আধুনিক চিন্তা ও চেতনার রাগ ও রূপ প্রকাশ পেয়েছিল অত্যন্ত প্রবল গতিতে। তিনি অশ্লীলতার অভিযোগকে খণ্ডন করে বিশ্বসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন, "এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউন্ট টলস্টয়ের 'রিসারেক্‌শন' পড়েছ কি? 'হিজ বেষ্ট বুক' একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে আমাদের দেশে এখনো অতটা আর্ট বুঝিবার সময় হয় নাই, সে কথা সত্য।"[১৯] 'চরিত্রহীন' রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ও আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি লিখেছিলেন: "অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না।*** যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধা হয় না। শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস- লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়— তাই করিতে হইবে। অস্টিন, মারি কোরেলি প্রভৃতি এবং সারা গ্রেণ্ড সমাজের অনেক ক্ষত উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়।*** গল্প লিখিয়া তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিব, সে আশা আমি আজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম।"[২০] টলষ্টয়ের মত শরৎচন্দ্রও সমাজের ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করে তার রোগমুক্তি চেয়েছিলেন।

সাবিত্রী—যার একমাত্র পরিচয় মেসের ঝি, তাকে একজন উচ্চ সমাজভুক্ত নায়কের প্রণয়িনী হিসাবে চিত্রিত করার জন্যও তিনি নীতিবোধহীন অশ্লীল ও সামাজিক অপরাধের আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হন। কিন্তু শরৎচন্দ্র চিরকালই সামান্যের মধ্যে অ-সামান্যের অনুসন্ধান করেছেন এবং সন্ধানও পেয়েছেন। জীবনবোধহীন ও পর্যবেক্ষণ শক্তির অনধিকারী লেখক এবং সমালোচকদের ব্যঙ্গ করে তিনি সাহিত্যিক ও বাল্যসুহৃদ্ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: "তাহারা সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কিভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না।*** তারা এটা ভাবে নাই, যে-লোক ইচ্ছা করিয়া একটা মেসের ঝি-কে আরম্ভেই টানিয়া লোকের সম্মুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে।"[২১]

আমরা বারবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির

বনিয়াদ বাস্তব সত্যের উপরেই গড়ে উঠেছিল। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা অথবা নিছক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। ফলে তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতা নেই, এই অভিযোগ তিনি কখনই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি পতিতাদের জীবনচিত্র অংকনে কোন স্তরেই নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনীদের লাস্যবিলাস বা নূপুরের নিক্কণ ধ্বনি শোনান নি, জীবনের উচ্চ সীমায় হৃদয়ানুভূতির গভীর কন্দরে যেখানে জমাট কান্না সমুদ্রের গভীর বিশালতা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে, তাকেই মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন গভীর সহানুভূতিতে। এজন্যই তিনি অতি আধুনিক কথা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃত অভিজ্ঞতাহীন মননালোকে সাবিত্রী চরিত্র চিত্রণের নিন্দনীয় আলোচনাকে কঠোরভাবে আঘাত করে দিলীপ কুমার রায়কে লিখেছিলেন : "গরীবের অভিজ্ঞতা নীচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে। তাই ও (বুদ্ধদেব বসু) শ্রীকান্তর টগর ও বাড়িউলিকেই চেনে। এ-সব উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, লিখতেও লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়েলিজম ভাবে তাদের আইডিয়েলিজম ত নেই-ই রিয়েলিজমও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।"[২২] শরৎচন্দ্রের পতিতাদের মধ্যে একটা আভিজাত্যের গর্ববোধ আছে—তাদের মহিমা ত্যাগের, আত্মবিলুপ্তির ও নারীত্বের পরাকাষ্ঠায়। কোন স্বার্থসর্বস্ব দেহলুব্ধ মনোবিকার তাদের মধ্যে একেবারেই নেই। মনুষ্যত্ববোধের উচ্চ মহিমাসনে তারা আপন গৌরবে সমাসীন।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী চরিত্র চিত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্রকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনাকে যুক্তি দিয়ে সব সময়ে ঠেকিয়ে ছিলেন। এই প্রতিরোধী শক্তির মধ্যে সংস্কারমুক্ত মন, সমাজ চেতনা এবং মানবহিতবাদের যেমন বিকাশ ঘটেছে, তেমনি সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের প্রভাব তাঁর উপর কিরকম পড়েছিল, তারও নিদর্শন আছে। তিনি কাউন্ট টলস্টয়ের উদাহরণ ছাড়াও লিখেছিলেন : "যারা ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ কিংবা জার্মানি নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে ইহা সত্যই 'ইম্‌মরাল্' কিনা।*** যাই হোক আমি এখনও স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে, চরিত্রহীনে এক বর্ণও 'ইম্‌মরালিটি' আছে।"[২৩]

উনিশ শতকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যে পতিতা নারীকে স্থান দেবার ও তাদের প্রেম এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। ফরাসী কথাসাহিত্যে জোলা, মোপাসাঁ, ফ্লবেয়ার ও আনাতোল ফ্রান্স জীবনচিন্তায় উপেক্ষিতাদের কথা

নিয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন দরদী মনের সহানুভূতিতে। এ ছাড়াও জন বোয়ার ও নুট হ্যামসুনের উপন্যাসের দারিদ্র্যপীড়িত বুভুক্ষিত জীবনের কথাচিত্রের সঙ্গে অবহেলিতা নারীর জীবনক্রন্দন ও মুক্তিপিপাসার আগ্রহ শরৎচন্দ্রের উপর প্রভাব ফেলেছিল। ইংরাজী সাহিত্যে বার্ণার্ড শ-এর বৈপ্লবিক সাহিত্যচিন্তা, সংস্কারহীনতা এবং মুক্ত স্বাধীন মনের স্বচ্ছ বিহার শরৎচন্দ্রকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। এ ছাড়াও রাশিয়ার ম্যাক্সিম গোর্কীর সম্পর্কে তাঁর গভীর আনুগত্য ছিল।* এই রুশীয় লেখকের জীবননিষ্ঠা, সমাজ অভিজ্ঞতা ও মানবহিতবাদী চিন্তা ও মমত্ববোধ শরৎচন্দ্রকে আন্তরিকভাবে ম্যাক্সিমনিষ্ঠ করে তুলেছিল। এর সঙ্গে ডস্টয়ভস্কী ও আলেকজাণ্ডারকুপারিনের 'Yama—the Pit' উপন্যাসের প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছিল।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা লগ্নে সমাজের উপেক্ষিতা ও নির্যাতিতা রমণীদের জীবনকাহিনীর প্রেক্ষাপটে মানবতাবোধের যে অনুসন্ধান চলেছিল, তার প্রভাব আমরা ইতোমধ্যে 'ভারতী' ও 'নারায়ণ' পত্রিকার কথ্যসাহিত্য শৈলীর আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রহণ করেছি। রবীন্দ্রনাথও পতিতার জীবন নিয়ে, 'বিচারক' (১৩০১) গল্প লিখেছিলেন। এই ছোটগল্পটির বড় সম্পদ পতিতা নারীর প্রথম ভালবাসার নায়কের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি। একথা অবশ্য সত্য যে শরৎচন্দ্র আপন জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পতিতাদের প্রতি সমব্যথী হয়েছিলেন। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে তিনি পরোক্ষভাবে কুলত্যাগিনী রমণীদের ইতিহাস সংগ্রহ ও ঘটনার কারণ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা স্বীকার করেছেন। তাতে পতিতা রমণীদের সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তাই ছিল তাঁর সাহিত্য-রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষকে শরৎচন্দ্র কোনদিন ছোট ভাবেন নি। নিত্য দিনের তুচ্ছতার মধ্যে কিংবা ক্ষুদ্রতার ভিতরে তিনি কোনদিনই বাঁধা পড়েন নি—কোন স্তরেই মানুষকে করেন নি ঘৃণা অথবা অবহেলা। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল ঃ "হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোনদিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়।"[২৪]

বিধবার প্রেম ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্রের আধুনিক চিন্তার যে বিশেষ

* "মাথা নুয়ে আসে আমার গোর্কীর লেখা পড়ে"।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনা ঃ শরৎচন্দ্র (২য়), গোপাল চন্দ্র রায়, পৃ ৪৩।

রূপটি ফুটে উঠেছে, তাতে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন ও নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আগ্রহকে বিকশিত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিধবার সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর কিরকম আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, এ কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিধবাদের জীবনের কথা ও কাহিনী নিয়ে নিজে যা চিন্তা করেছিলেন, তার পরিচয় এই পত্রটিতে পাওয়া যায়ঃ "বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।*** যে ষোল সতর বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে, ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন সত্তা নাই।"[২৫] শরৎচন্দ্র বিধবাদের চিত্তের প্রেম বিশ্লেষণে এই 'নারী সত্তার' অনুসন্ধান করেছেন আগ্রহভরে। 'অনুপমার প্রেম', 'বড়দিদি', 'মন্দির', 'পথনির্দেশ' ও 'পল্লীসমাজে'র কাহিনীর মধ্যে লেখকের একই প্রয়াস চলেছে। তবে 'পথনির্দেশ' ব্যতীত অন্যান্য গল্পের বিধবা নায়িকাদের প্রেম একান্ত অস্ফুট ও প্রচ্ছন্ন। ব্যক্তিসচেতন আত্ম-অভীপ্সা অথবা প্রেমবৈচিত্র্য খুবই ছায়াবৃত। সংস্কার ও সমাজধর্মের নীতির বিরুদ্ধে আপন প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে কেউ-ই উচ্চবাক্ হয়ে ওঠে নি। হিন্দু সমাজের উদ্ধত শাসনদণ্ডের প্রভাবে তাদের প্রেম চিত্তের মধ্যে অন্তঃসলিলাকারে প্রবাহিত হয়েছে, যদিও তাতে বিরহের উষ্ণতা বা দাবদাহ একেবারেই কম ছিল না। এই পর্বের নায়িকাদের প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে যথার্থই মনে হয়ঃ "তাদের বুকে আগুন মুখে দেবী প্রতিমার মত পাষাণ কঠিনতার ছাপ। তাদের বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না।"[২৬]

শরৎচন্দ্র সাহিত্য সাধনার ব্রাহ্মমুহূর্তে অভিজ্ঞতার উপকরণ হিসাবে নারীর জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছিল। 'অনুপমার প্রেম' গল্পে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক যন্ত্রণার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তাতে দীর্ঘদিন প্রবাহিত সমাজ সংস্কারের সঙ্গে পারিবারিক অত্যাচারের করুণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এর সঙ্গে অস্ফুটভাবে মিশে আছে হৃদয়হীন সমাজের কঠিন কারাগার থেকে নারীর মুক্তিলাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। 'অনুপমার প্রেম' গল্পে অন্তিম লগ্নে, অনুপমা আত্মহত্যার প্রাক্ মুহূর্তে বৈধব্যের সংস্কারকে অস্বীকার করে অথবা বিস্মৃত হয়ে, জীবনে প্রেমকে অন্যতম সত্তা বলে মনে করেছেঃ "জগতে তাহার একতিলও সুখ নাই, অসীম

সংসারে দাঁড়াইবার একবিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে একজনও নাই *** পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথা মনে হইল। যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত।*** সে ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে পূজা গ্রহণ করে নাই এবং অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। *** সে কি আজও তাহাকে মনে করে?"

'বড়দিদি' গল্পে মাধবীর প্রেমে অনুরূপ বৈধব্যসংস্কার মুক্তির প্রয়াস আছে। মনে হয়, শরৎচন্দ্র বিধবাদের জোর করে ব্রহ্মচর্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখাকে জীবন-ত্যাগিদের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যায় বলে ভাবতেন। তাদের জীবনযন্ত্রণা তিনি কেবলমাত্র সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে বিচার করেন নি, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার দিক থেকেও অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত মনের কথা ছিল : "এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।"[২৭] সুরেন্দ্রনাথের কাছে 'আমি মাধবী'—এই অশ্রুসজল উক্তির মধ্যে, মাধবী আপন হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। শরৎচন্দ্র নারীকে মানবী হিসাবে দেখেছেন। বৈধব্যের সংস্কার জীবনের ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। মাধবীও জীবন-যৌবনের আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারে নি। তার মনের অনুভূতি, লেখকের কথায় : "এ-জীবনের কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা! বিধবা হইলে কিছু সে-সব যায় না।" তাই মাধবী হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্যে কম্পিত হত। বৈধব্যের গুরুভার তার জীবনকে শুষ্ক করতে পারে নি। মাধবীর চিত্তের অন্তরালবর্তিনী নারীপ্রকৃতি কখন যে আত্মভোলা সুরেন্দ্রনাথকে ভালবেসে ফেলেছিল, সে উপলব্ধিও করতে পারে নি। অথচ সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার অকারণ কৌতূহল, সেবাযত্নের প্রতিদানে প্রশংসালাভের আগ্রহ, ব্যর্থতায় বেদনাবোধ ও অহেতুকী অভিমান প্রভৃতি ক্রম—যা প্রেমোন্মেষের উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে, সবই মাধবীর মনকে আচ্ছন্ন করেছে। সুরেন্দ্রনাথের সুপ্ত পৌরুষ চৈতন্যে আঘাত দিয়ে হৃদয় জাগরণের প্রয়াসেও সে কুণ্ঠিতা হয় নি! মাধবীর অ-ব্যক্ত অনুভূতি মনঃ বিশ্লেষণ প্রয়াসী শরৎচন্দ্রের কথায় বাণীরূপ পেয়েছে : "মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু, এমন সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই! তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এই অকর্মণ্য সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল।" মাধবী তার গোপনচারী ভালবাসাকে অ-কথিত বাণীতে অশ্রুজলে প্রকাশিত করেছে বন্ধু মনোরমার কাছে। একদিকে বৈধব্যের সংস্কার ও অপরদিকে প্রেম এবং অনুরাগের দহনে হৃদয়মিলনের জন্য প্রচণ্ড তাগিদ—দুই বিপরীত ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব ও আর্তি

মাধবী প্রাণপণে লুকাইয়া আসিতেছিল, মনোরমার কাছে আর তাহা লুকাইতে পারিল না। ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বড় ছেলেমানুষের মত কাঁদিল।··· "তিনি যদি না বাঁচতেন, তাহলে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম।" বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার প্রাতঃকালে শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি' গল্পে মাধবীর প্রকাশ-ভীরুতার মধ্যে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের সমর্থনে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুক্তি দিয়েছিলেন; যদিও তা দ্বিধায় জড়িত ছিল পরবর্তীকালের রচনার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিধবা নারীর সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র সনকালে সংস্কারাবদ্ধ নারীচিত্তে বিরূপতার ঢেউ তুলেছিল। মনোরমার স্বামীকে লেখা একটি চিঠিতে এই রকম অভিব্যক্তি ঘটেছে: "মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,—সে আমার আজন্মের ধারণা ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়াছে।·· মাধবী পোড়ামুখী—বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে।" পত্রান্তরে মনোরমার স্বামীর উক্তিতে, শরৎচন্দ্র যেন নিজের মনের অনুভূতিকেই মুক্তি দিয়েছেন: "মাধবী পোড়ামুখী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেন না, বিধবা হইয়া মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে।···কিন্তু···তুমি আমাকে আশ্চর্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ ক্রোশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল! এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্প মঞ্জরি!" শরৎচন্দ্র জীবনকে ভালবাসতেন, তার বৈভবময় পল্লবিত বিকাশ দেখতে চাইতেন বলে, কোন সংস্কারাবদ্ধ মনের অনুগামী ছিলেন না। নারীত্বের অপমৃত্যু তাঁর কাছে সহ্য করা অসহনীয় ছিল বলে তিনি নারী জীবনের নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী হয়েছিলেন সহানুভূতিশীল প্রগতি-বাদী আধুনিক মন নিয়ে।

বিধবার সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের আর একটি উদাহরণ 'মন্দির' গল্পটি। ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক আচারনিষ্ঠা এবং দেবভক্তি বিধবার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করলেও, হৃদয়মন্দিরে প্রেমের জাগরণ ও অভিব্যক্তিকে বিনষ্ট করতে পারে না। শরৎচন্দ্র 'মন্দির' গল্পে নায়িকা অপর্ণার অন্তর-জাগরণের মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রচার করেছেন। প্রথমে বৈধব্য সংস্কারের প্রতি নিবিড় অনুরক্তি, আপন ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং দেবদেউলে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা অপর্ণাকে এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করেছিল যে হৃদয়রহস্য এবং নরনারীর চিত্ত আন্দোলনজনিত প্রেমানুভূতি সম্বন্ধে তার কোন ব্যাকুলতা ছিল না। জীবনে যৌবন ও প্রেমের রক্তরাগরঞ্জিত বিকাশের প্রতি সে ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্তা এক উদাসীনা রমণী। স্বামী অমরনাথের প্রণয় আবেদন অপর্ণার আচারনিষ্ঠ জীবনে কোন কামনার তরঙ্গ তোলে নি।

পরিশেষে অমরনাথের মৃত্যু তার মনকে জাগিয়েছিল এবং আপন কর্মদোষের জন্য সে আত্মগ্লানিতে হয়েছিল জর্জরিত। অপর্ণার চিত্তজাগরণ তার ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ ট্র্যাজেডির মধ্যে ঘটেছিল। জীবন ও প্রেমের মূল্য জীবনের হাহাকার ও ক্রন্দনের ভিতর দিয়ে সে উপলব্ধি করেছিল। শরৎচন্দ্রের নিষ্পৃহ যুক্তিবাদী মন বুঝেছিল যে, অনুরাগরঞ্জিত সোনার জীয়নকাঠির স্পর্শে প্রাণের স্পন্দন জাগে, দেবারতি বা পূজার্চনা দেহ ও মনের মধ্যে গড়ে তোলে অদৃশ্য সুবৃহৎ ব্যবধান।

তবুও অপর্ণা বিগ্রহসেবায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বৈধব্যের দুঃখ ও বিষাদ ভুলে থাকতে চেয়েছিল। শক্তিনাথের দেবসেবায় তার যে সহযোগিতা, তাতে তার মানসদ্বন্দ্বের অনেক চিন্তা মিশে আছে। কিন্তু কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে তার অনুরাগ দেবতাকে অতিক্রম করে পূজারী শক্তিনাথের প্রতি নিবিষ্ট হতে শুরু করেছে। এখন সে আর শুধু দেবতাকে আরাধনা করে না, পূজারীর প্রতি তার প্রকৃত অনুরক্তি। সমাজের বিধি-নিষেধ ও সংস্কারের বেড়া অতিক্রম করে নারীমনের একটি বিনম্র অনুরাগ শরৎচন্দ্র আন্তরিকতার সঙ্গে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। বিধবার কোন সংস্কার বা নীতিবোধের দ্বিধা অপর্ণাকে অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত করে নি। কিন্তু তার সচেতন মনের সংস্কার একবার জেগে উঠেছিল শক্তিনাথের 'কুন্তলীন' সেণ্ট উপহার হিসাবে দেওয়ার সময়ে। অপর্ণার দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ও শক্তিনাথকে দেবপূজার কাজ থেকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি, সংস্কারজাত অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ। কারণ সে হিন্দু ঘরের বিধবা, অপর পুরুষের কাছ থেকে কোন সৌখীন বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করা অনুচিত এবং যে বিশেষ প্রসাধনী দ্রব্যের সঙ্গে তার মৃত স্বামী অমরনাথের স্মৃতি ও সধবা জীবনের দুঃখকর অনুভূতি এবং অপরাধবোধ জড়িয়ে আছে—অতীত ও বর্তমানের ঘটনা এবং অনুভূতির দ্রুত সংমিশ্রণ তাকে বিদ্রোহিণী করে তুলেছে। কিন্তু বিধবা অপর্ণার মনের অন্তরালে শক্তিনাথের প্রতি যে অনুরাগ সঞ্চিত ছিল, তা বেদনাতপ্ত অশ্রুধারায় ও অপরাধবোধের দীর্ঘশ্বাসে মুক্তি পেয়েছে শক্তিনাথের মৃত্যুতে। তার মনের গোপন স্তরে অবরুদ্ধ ভালবাসা চির মৌনতার প্রাচীর চূর্ণ করে চির স্থির, চির অচঞ্চল ও শান্ত দেবতারূপ অদৃষ্টের কাছে প্রশ্ন করেছে ঃ "ঠাকুর, এ কার পাপে ? ···ঠাকুর, আমি যা নিতে পারি নাই—তা তুমি নাও।" অপর্ণার এই নিভৃত স্বীকৃতি তার জীবনের দ্বিতীয় ট্র্যাজেডি।

'মন্দির' গল্পটিতে রোম্যাণ্টিকতার ছাপ থাকলেও, ক্ষুদ্র বীজের অভ্যন্তরে বিশাল বনস্পতির প্রাণ যেমন সুপ্ত থাকে, তেমনি সমাজের বিরুদ্ধে এবং দেবতারূপ ধর্মের অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠার দাবি ও সংস্কারমুক্ত মনের অসংখ্য প্রশ্নও যেন আত্মগোপন করে আছে ভবিষ্যতে আত্মবিকাশের

আশায়। ‘চরিত্রহীন’, ‘গৃহদাহ’ ও ‘শেষ প্রশ্ন’ উপন্যাসে জীবনরহস্য বিশ্লেষণের যে পূর্ণ রূপ, তার সূচনা দেখা যায় শরৎচন্দ্রের ‘মন্দির’ গল্পের চরিত্রচিত্রণে। ‘মন্দির’ গল্পের অপর বৈশিষ্ট্য ‘অসবর্ণ’ প্রেমের চিত্র ও প্রকৃতি রূপায়ণ। কায়স্থ-কন্যা বিধবা অপর্ণার সঙ্গে ব্রাহ্মণপুত্র শক্তিনাথের প্রেমকাহিনী বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের সংস্কারহীন, মানবতাবাদী জীবনদৃষ্টির অন্যতম পরিচয়।

শরৎচন্দ্রের বিধবা চরিত্রের প্রত্যেকেই যেন বিষাদের মর্মতলে অধিষ্ঠিতা পাষাণ প্রতিমা। প্রেমের দীপ্তিতে এদের জীবন আলোকিত নয়, দহনের জ্বালাতে তারা সর্বদা ক্লিষ্ট। ব্যক্তিগত প্রেমাভীপ্সা, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও মুক্তি কামনা সবই সামাজিক বিধান ও পারিবারিক অত্যাচারের পাষাণ দুর্গে সীমাবদ্ধ। চিত্তের বহিঃনিষ্ক্রমণের কোন পথই সেখানে নেই। তবুও এরই মাঝে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন ও দাবি তুলে ধরেছে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা। তারা সনাতন সতীত্বের অনুভাবনাতে জীবনসমস্যার সমাধান খোঁজে নি। আমরা দেখেছি যে শরৎচন্দ্র সতীত্ব ও নারীত্ব উভয়কে পৃথক্ করে দেখেছেন; একমাত্র মনুষ্যত্ববোধ ও চিত্তমুক্তির পটভূমিতেই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করলেও নারীত্বকে তিনি সর্বদা শ্রেষ্ঠ ও মহীয়ান্ বলে মনে করেছেন। নারী জীবনের অপমৃত্যু তাঁর সহ্য হলেও নারীত্বের মৃত্যু তিনি কখনও সহ্য করতে পারতেন না। ফলে, কোন সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে নারীত্বের লাঞ্ছনা দেখলেই তিনি বিরূপ হয়ে বিরোধিতা করতেন। প্রেমের অধিকার ব্যতিরেকে সমাজে ও পরিবারে কোন সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। কেবল রীতি-নীতি অথবা সামাজিক বিধানের দাবিতে কাউকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করলে বিরোধ বা সংঘর্ষ বাধে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে। ‘পথনির্দেশ’ গল্পে হেমনলিনীর মানসচিন্তা এই মার্গকেই অনুসরণ করেছে। সে জীবনে বৈধব্যকে কোন সমস্যা বা ঘটনা বলে মনে করে নি। স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের কোন স্মৃতিচিহ্নই তাকে প্রণয়মুগ্ধা রমণীতে পরিণত করতে পারে নি। উপরন্তু প্রেমহীন ও হৃদয় সম্পর্কহীন এই সামাজিক বিধানকে অস্বীকার করে দৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যভঙ্গীর অধিকারে সে মৃত্যুর পরে নারীর স্বামীসঙ্গ লাভের চিরন্তন বাসনাকে অস্বীকার করে আপন প্রণয়ীর চরণতলে স্থান পাবার কামনা প্রকাশ করেছে। সে আত্মশক্তির জোরে নিজেকে ‘সতীলক্ষ্মী’ বলে দাবি করেছে। হেমনলিনীর চিত্তের আনুগত্য ও শুচিতা আপন প্রেমধর্মের কাছে, সমাজের নির্দেশ বিধানের কাছে নয়। আধুনিকতার মধ্যে যে সমাজবিদ্রোহ ও ধর্মবিরোধিতা জাগ্রত হয়েছিল, তার মূল কারণ ছিল সর্বক্ষেত্রে স্বীয় ব্যক্তিত্ববোধের প্রতিষ্ঠা। হেমনলিনী আপন ব্যক্তিত্বকে সমস্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে—সমাজধর্ম, পারিবারিক জীবনধর্ম সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে। মনে

হয় 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর ভবিষ্যৎ রূপনির্মিতির অস্ফুট কাঠামো শরৎচন্দ্র হেমনলিনীর মধ্যে উপাদান হিসাবে সংগ্রহ করেছিলেন। হেমনলিনী শরৎচন্দ্রের নির্যাতীতা নারী চরিত্রের প্রথম স্ফুটবাক্ বিদ্রোহিণী নারী। সে দৃপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংস্কারমুক্ত মনের চিন্তাতে প্রণয়ী গুণেন্দ্রকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে: "আমাকে তোমরা জোর করে ধরে-বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমি সতী-লক্ষ্মী, তাই মরণ-কালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে করব! আচ্ছা গুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব?" তার এই কথায় ও প্রশ্নে দ্বিধা, জড়তা, সংকোচ বা লজ্জা কোন কিছুই ছিল না। তার প্রশ্ন আধুনিক নারীর মনের নিভৃত কামনার বহিঃপ্রকাশ। বিধবা রমণীর মধ্যে হেমনলিনী প্রথম নারী, যে নিজের সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের কথা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার ও ঘোষণা করেছে।

আলোচনার ধারাপাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে শরৎচন্দ্র সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিমানব বা ব্যক্তিমানবী চরিত্র সৃষ্টি করতে চান নি। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার দাবিতে সমাজের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিমনের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের প্রতি আনুগত্য তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন বিভিন্ন স্থানে। ফলে বিধবাদের প্রেম চিত্রণে শরৎচন্দ্রের সমাজবিপ্লবী মনোভাবের অভ্যন্তরে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের যে অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা ছিল, তা অনেকাংশে সমাজবৃত্তের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয়ে ভাবানুভূতির হৃদয়বাষ্পে দ্রবীভূত হয়ে বিষাদের দীর্ঘশ্বাস উন্মোচনের অধিক কিছু করতে পারে নি। আমরা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার সংঘর্ষে ব্যক্তির বেদনাময় করুণ পরাজয়ের চিত্র শরৎসাহিত্যে পাই। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজে ব্যক্তির স্থান সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত; সংঘর্ষের মধ্যে ব্যক্তিকে বারবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। শরৎচন্দ্রের পতিতা রমণীদের মধ্যে কেউ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হয় নি। বিধবাদের মধ্যেও অনুরূপ ভাবের অনুসৃতি ঘটেছে। 'বড়দিদি'র মাধবী, 'অনুপমার প্রেমে'র অনুপমা, 'মন্দিরে'র অপর্ণা ও 'পল্লীসমাজে'র রমা—সকলের সম্পর্কে একই কথা। সকলেই সামাজিক বিধানে সঙ্কুচিত ও চিত্তবিষাদে ক্লান্তমলিন। কেবল-মাত্র 'পথনির্দেশ' গল্পে হেমনলিনী আপন আপোষহীন চিন্তার ক্ষীণ প্রতিবাদটুকু তুলে ধরে নতুন দিনের সম্ভাবনায় ভবিষ্যতের পানে চেয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের পরিণতিতে শরৎমানস দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সতীত্বের ঊর্ধ্বে নারীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। শরৎচন্দ্র ব্যক্তিসত্তার নির্যাতনটুকু তুলে ধরেছেন, ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন মানবাত্মার ক্রন্দনকে; কিন্তু সমাজের অপর পারে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি। অবশ্য লেখকের এই দ্বিধা আমাদের যুগের আলোকে বিচার করতে হবে। যুগ সন্ধিক্ষণের ভাবদ্বন্দ্ব লেখককে আন্দোলিত করেছিল বলে তিনি সমস্যার দিকেই

আলোকপাত করে ক্ষান্ত হয়েছেন, সমাধানের দিকে আগ্রহ দেখান নি কোনভাবেই।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমা-রমেশ উভয়ের প্রেমে আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কার জর্জরিত হওয়ার জন্য সচেতন কামনার প্রণয়মদিরা জীবনউত্তাপে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেনি। জমিদারনন্দিনী রমা আপন কর্তব্যবোধের মধ্যে যতখানি ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠেছে, জীবনে প্রেম অথবা কামনা চরিতার্থতার ক্ষেত্রে ততখানিই শীতল, দুর্বল ও সংস্কারাবদ্ধা। তবে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যার আবর্তের মধ্যে প্রেমের কুণ্ঠিত রূপের বিকাশটি মহিমময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু রমার বৈষয়িক সত্তা ও সমাজ অনুগত সত্তা তার চরিত্রের বহির্দেশ মাত্র। সে প্রকাশ্যভাবে রমেশের বিরুদ্ধে যে নানা ষড়যন্ত্রে সংযুক্ত হয়েছিল, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রেমবিহ্বল চিত্তকে সকলের দৃষ্টি থেকে দূরে গোপন করে রাখা। আপন চিত্তের অতল প্রদেশ-শায়ী ভালবাসাকে সে বিড়ম্বিত বৈধব্যজীবনের অন্তরালে নানা সংস্কারের মধ্যে পরম সযত্নে লালন করে এসেছে। তারকেশ্বরে রমা রমেশের সেবা করেছে অন্তরের গভীর প্রেমানুভূতিতে, তার নিয়োজিত আকবর লাঠিয়ালের পরাজয়ের গ্লানিতেও সে গৌরব বোধ করেছে। শরৎচন্দ্র রমার এই গোপন মানসচারণা ও চিত্তাভিসারকে মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রযত্নে রূপায়িত করেছেন: "আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রু-প্লাবিত হইয়া উঠিল··· ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়াছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।"

রমার চিত্তের মুগ্ধা রমণীর প্রেমাভীপ্সা সর্বদা অন্তর্মুখী হয়ে থাকেনি। প্রয়োজনবোধে প্রকাশ্য জনসাধারণের সামনে সে ব্যক্তিপ্রেমকে ব্যক্ত করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। ভৈরব আচার্যকে রমেশের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে সে যে ভূমিকা নিয়েছিল, তাতে কলঙ্কের মিথ্যা পশরা মাথায় তুলে নিতেও কুণ্ঠিতা হয় নি; এবং পরিশেষে ভালবাসার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে দূর তীর্থস্থানে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যে প্রবাসযাত্রা, তাতে রমার চিত্তমথিত, অপরিপূর্ণ প্রেমই দুঃসহ বেদনভারে ভেঙ্গে পড়েছে। সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় তার দেহ-মন ও অনুভূতি অসাড় হয়ে পড়েছে। রিক্ত জীবনের সমস্ত রোদনভার সে বহন করে ভালবাসার জনকে বিশালতার

মধ্যে মুক্তি দিয়ে গেছে। সমাজ জীবনের অত্যাচার এবং মহৎ প্রাণের অপমৃত্যু সংস্কার মুক্তিকামী শরৎচন্দ্র সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর প্রশ্ন তিনি প্রতিনায়িকা বিশেশ্বরী দেবীর মুখে করেছেন: "এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন! এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা!"

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অথবা ব্যক্তির সঙ্গে 'আইডিয়া'র দ্বন্দ্বচিত্র রূপায়িত না করলেও সমাজ ও ব্যক্তিমানসের দ্বন্দ্বে তিনি সর্বদা যে ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, সে সংবাদ আমরা পূর্বেই গ্রহণ করেছি। 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বুক চিরে বাঙালীর স্বভাবসুলভ শান্ত মধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে রমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দৃশ্যতঃ দুর্বল অথচ দৃঢ়চিত্ত অভীপ্সার মধ্যে। শরৎচন্দ্র সমাজকে অস্বীকার করে অথবা বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিচেতনার বিকাশ ঘটাতে চান নি, তিনি প্রচলিত সমাজের পটভূমিতেই এর রূপান্তর চেয়েছিলেন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে এক সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবসচেতন মন সর্বদা জাগ্রত ছিল। এই পটভূমিতেই তাঁর আধুনিকতার মুক্তি ঘটেছিল। এজন্য 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়িকা রমা একই সঙ্গে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক। একদিকে সে একক, অপরদিকে সে সমাজের। সমাজের নিষ্ঠুর আঘাত তার চিত্তকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, আবার সেই সময়ে সে নিজে দৃঢ়ভাবে আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাকে রক্ষা করেছে। রমার একক সত্তার সঙ্গে বহুর যে দ্বন্দ্ব, তাতেই শরৎচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ও তাঁর আধুনিকতার পরিচিতি। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে রমার হৃদয়রহস্যের বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বে মানুষের অন্তরজীবন ও নারীর নারীত্ব সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশায় তিনি আপন মনের অভিব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে বলেছিলেন: "পল্লীসমাজ' বলে আমার একখানা বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। ··· ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোনকালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে-এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এতবড়

দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ-জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। ...রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না এ-কথা আমি নিশ্চয় জানি।"[২৮]

পতিতা ও বিধবাদের প্রেম কোন সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে। তবুও 'দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে' এদের প্রেম নিত্যই নিঃসংশয় এবং গৌরবে অক্ষয়। ক্ষুব্ধ চিত্তদহনে এরা যেন প্রত্যেকেই তাপসী জ্যোতির্ময়ী রূপে আলোকিতা। কিন্তু এরই মাঝে শরৎচন্দ্রের হাতে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংস্কার মুক্ত মনের দার্ঢ্য 'বিদ্যুৎ-অসিলতার' মত অশান্তরূপে প্রতিষ্ঠার দাবিতে হয়েছে সোচ্চার। 'পথনির্দেশ' গল্পে হেমনলিনীর মধ্যে যার সূচনা, 'শ্রীকান্তে'র অভয়ার মধ্যে তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। হেমনলিনী প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেছে যে সে তার স্বামীকে ভালবাসেনি—কারণ চিত্তে প্রেম সামাজিক সংস্কার ও নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ব্যক্তিমনের অধিকারের দাবিতে সে গুণেন্দ্রকে ভালবাসতে চেয়েছিল—সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে সে হয়েছে পরাজিত। হেমনলিনীর পরাভব পরোক্ষভাবে শরৎচন্দ্রের নারীচিত্তের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনের পরাজয়। এই পরাজয়েব উত্তরণ তিনি দেখিয়েছেন অভয়ার মধ্যে। যে সমাজনিষিদ্ধ প্রেম হেমনলিনী তার জীবনাগ্রহ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, অভয়া সামাজিক প্রথা ও অনুশাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করে সেই সমাজনিষিদ্ধ প্রেমকেই জীবনে মর্যাদার সঙ্গে করেছে প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্র, শ্রীকান্তের ভাষ্যে তাকে বিদ্রোহিণী আখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ "স্নেহে, প্রেমে, করুণায় অটল অভয়া...বিদ্রোহী অভয়া।" অভয়ার বিদ্রোহ ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র অতীত ও বর্তমান উভয় কালের ভিত্তিতে পুরুষ সমাজের নারী অত্যাচারের বহু বৈচিত্র্যময় কাহিনী পরিবেশন করে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। এই সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামিকে আক্রমণ করা, ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করা নয়।[২৯] অভয়ার প্রশ্ন এই ধর্মের অনুশাসনকে লক্ষ্য করে। সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংস্কারমুক্ত মনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাদর্শে অভিষিক্ত হয়ে শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করেছে ঃ "স্বামী যখন শুদ্ধ মাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যে দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইচি। ...অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে

বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ বলে আমারি উপরে? ··· সারাজীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই···নারী-জন্মের চরম সার্থকতা? ··· এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার···কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা-দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই?"

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীদের মধ্যে অভয়াই বোধ করি সর্বাপেক্ষা উচ্চবাক্। অন্যান্য নারীরা যেখানে বিষাদের গুরুভারে পাষাণপ্রতিমা, সেখানে অভয়া প্রশ্নমুখরা। তার ভালবাসায় চিন্তা, মনন ও কর্মের মধ্যে এমন একটি বলিষ্ঠতা ছিল, যা তাকে মানুষের ও সমাজের হীনমন্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী করে তুলেছে। অভয়ার ভালবাসা অন্তর্মুখী নয়; নীরবে, নিভৃতে সমস্ত সামাজিক বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনা সহ্য করে অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাসে অন্য নারীদের মত সে বুক ভাসিয়ে দেয় নি।

নারীর আপন ভাগ্য জয় করবার যে বাসনা ঊনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, তার প্রথম রূপকার ছিলেন মধুসূদন দত্ত। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রমীলা নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রথম সবাক্ প্রতিমা। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের আয়েষা বোধ করি কুমারী হৃদয়ের রুদ্ধ ভালবাসাকে মুক্তি দিয়েছিল এই বলে—"বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।" 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মধ্যেও বিধবা নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে। কিন্তু এ সবই খদ্যোতের আলোকরেখার মত নারীর নিশ্ছিদ্র জীবনান্ধকারে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছে, কোন মার্গের অনুসন্ধান দিতে পারেনি। বোধ করি রবীন্দ্রনাথের হাতেই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আপন জীবনজিজ্ঞাসা ও সমাজের বুকে স্বতন্ত্র স্থানলাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ ও ইচ্ছা পূর্ণ রূপ পেয়েছিল। তাঁর 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে ও 'স্ত্রীর পত্র' এবং তৎপূর্বে 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি ছোট গল্পে নারীব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার বিচিত্র কাহিনী আমরা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি। শরৎচন্দ্রের অভয়া চরিত্র সৃষ্টিতে এই সব পূর্ব উদাহরণ তাঁর কাছে দিগ্‌দর্শীর কাজ করেছিল বলে মনে হয়। বিশেষভাবে বিদ্রোহের প্রখরতার দিক দিয়ে 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের সঙ্গে অভয়ার ভাবৈক্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি প্রগতিবাদী তত্ত্বকে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সমাজের ধর্ম ও নীতির ঊর্ধ্বে মানুষের প্রেম কৌস্তুভ মণির দীপ্তিতে বিরাজ করে। অর্থাৎ সামাজিক ও

ধর্মীয় বিচারে যাকে আমরা বিবাহ বলি, তার চেয়ে মানুষের ব্যক্তিপ্রেম অনেক বড়। শরৎচন্দ্র অভয়ার মাধ্যমে এই তত্ত্বই বলেছেন যে, বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের চেয়ে মানুষের হৃদয়ের দাবি অনেক বেশি গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। ভালবাসা বিবাহের সংস্কারের যে অনেক ঊর্ধ্বে—এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সামাজিক মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন বলিষ্ঠ জীবনবোধের তাগিদ ও দাবিতে।

শরৎচন্দ্র কখনও সতীত্বকে নারী জীবনের কাম্য ধন বলে মনে করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে এ ছিল একটি চির জীর্ণ সংস্কারের প্রতি আনুগত্য। তিনি পতিতা ও বিধবাদের প্রেমের মধ্যে নারীত্বকে অধিক মর্যাদার আসন দিয়েছিলেন। বিবাহিতাদের মধ্যেও তাঁর এই চিন্তারই অনুবর্তন ঘটেছে। 'শ্রীকান্ত' ভ্রমণোপন্যাসে অভয়া দ্বিধাহীন কণ্ঠে সতীত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে নারীত্বের অধিকার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। সে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছে: "আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। ... তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো...আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারী জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিনীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটাকে পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে।"

আন্তরসত্যের প্রতি আনুগত্য আধুনিকতার একটি বড় পরিচয়। বহু প্রচলিত সমাজসত্য ও ধর্মীয়সত্যের মধ্যে মানুষ যখন মানবতাবোধের সন্ধান পায়নি; উপরন্তু জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে এই দুই নিষ্ঠুর নিয়মের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে দেখেছে, তখনই বেরিয়ে এসেছে বিদ্রোহী মন। চিত্তের এই বিপ্লবী সত্তা উদার মানবহিতবাদে দীক্ষিত হয়ে বহুদিনের জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলে নতুন দিনের সূর্যকে বন্দনা করেছে আত্মশক্তির উদ্ধত স্পর্ধা ও গৌরব নিয়ে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অভয়া এই সত্যের দিশারী। সে গর্বিত বুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে নতুন মনুষ্য সমাজ, যেখানে স্থাপিত হবে ন্যায়, কল্যাণ ও মঙ্গলবোধ। পুরাতন সামাজিক রীতি-নীতির বিষবাষ্প কলুষিত করবে না এই নতুন মনুষ্য সমাজকে। সংস্কারহীন চিত্তের উদারতা ও ভালবাসা হবে এর প্রকৃত বনিয়াদ। অভয়ার বাণী যেন এই অনাগত কালের প্রতিধ্বনি! সে মুক্তকণ্ঠে বলেছে: "একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন,

তিনি কি তাতেই খুসি হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি··· আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ব'লে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের মত বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। না হ'লে তারা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যাবে। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতের বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।"

আধুনিক চিন্তার প্রসাদ গুণ এই যে, ব্যক্তির মুখের অভিব্যক্তির সঙ্গে মনের ইচ্ছাও সমান গতিবেগে উন্মুক্ত হয়। দু'য়ের মধ্যে কোন ব্যবধান অথবা বৈপরীত্য থাকে না। নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা যুদ্ধ করে; ফলে সংস্কার ও প্রাচীন রীতি-নীতি অনুপন্থী ব্যক্তিরা হয়ে যায় নির্বাক। চিন্তার স্বাধীনতা, আচরণের নির্ভীকতা, সততার অনুগামিতা আধুনিকপন্থীদের করে তোলে নতুন যুগের নতুন মানুষ। অভয়া ছিল এই দেশের অধিবাসী—সততা ও আন্তরিকতায় সে অপরূপা।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনের অনুভাবনায় বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমাবেশ ঘটলেও তিনি নতুন দিনের সূর্যালোককে প্রণাম জানাতে কোনদিনই কুণ্ঠিত হন নি। নবাগত যুগচিন্তার দিকে পিছন ফিরে অথবা ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে কখনও অতীতের স্তবগানে মোহমুগ্ধ হন নি। 'শ্রীকান্ত' ভ্রমণোপন্যাসের মধ্যে শ্রীকান্তের আত্মকথনে অন্নদাদিদির চরিত্রমাধুর্য ও দৃঢ় সহনশীলতার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিচিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটলেও, নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টিকল্পে আধুনিক চিন্তার যে মননশীল যুক্তিবাদী বিশ্বাস, মানবহিতবাদী উদারপন্থী মতবাদ এবং সর্ব সংস্কার মুক্ত আদর্শের প্রতি স্থির নিষ্ঠা, তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন অভয়া চরিত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসার মাধ্যমে। শ্রীকান্তের মানসিক চিন্তা ও অভিব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ: "যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সংস্কার, যুগ-যুগান্তরের ভাল-মন্দ বিচারের অভিমান আমারও ত রক্তের মধ্যে প্রবহমান। কেমন করিয়া অকপটে তাহাকে দীর্ঘায়ু হও বলিয়া আশীর্বাদ করি! কিন্তু মন যে সরমে সংকোচে একেবারে ছোট হইয়া আসিতে চায়।···

অভয়াকে আমি চিনি। ···হৃদয়হীন বর্বরতায় কেবলমাত্র অশ্রদ্ধা ও উপহাসের

দ্বারাই সংসারে সকল প্রশ্নের জবাব হয় না। ভোগ! অত্যন্ত মোটা রকমের লজ্জাকর দেহের ভোগ! তাই বটে! অভয়াকে ধিক্কার দিবার কথাই বটে! ··· আমি জানি কিছুই অভয়ার কঠিন নয়—মৃত্যু, সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এইসব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনার পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।" শ্রীকান্তের এই বিশ্লেষণের মধ্যে যে একদিকে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এবং অন্যদিকে মানুষের জীবনের নব মূল্যায়নের অনুসৃতি—উভয়ই শরৎচন্দ্রের আপন কাল ও যুগধর্মের প্রতিচ্ছবি। এরই মধ্যে যেখানে প্রগতিবাদী মনোভাবনা জীবনের নতুন তাৎপর্য উদ্ঘাটনে অথবা আবিষ্কারে ব্রতী হয়ে আছে, সেখানেই শরৎচিন্তা আপন ঠাঁই করে নিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের আধুনিক চিন্তার বৈপ্লবিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' ও 'শেষ প্রশ্নে'। এই তিনটি উপন্যাসের পটভূমি মুখ্যতঃ নগরকেন্দ্রিক। কিরণময়ী, অচলা ও কমল—তিনজনই নাগরিক বৈদগ্ধ্যতার অধিকারিণী। শহরের আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখর জীবনবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিক অনুভাবনায় তাদের চিত্তের অনুভূতি ও মতবাদ পুষ্ট হয়েছে। এই তিন নায়িকার মনের গভীরে অবচেতন স্তরে সংস্কার, প্রেম ও কামনার ভাবান্দোলনে যে বিচিত্র জটিলাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালের বিক্ষুব্ধ জীবনের প্রতীক। সমাজের ভূমিকা বহুলাংশে গৌণ হয়ে যাবার জন্য একই মানুষের দুই ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব অভিব্যক্তিতে খুবই করুণ ও আত্মক্ষয়ী হয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস মূলতঃ 'আইডিয়া' প্রধান অথবা 'এক্সপিরিমেণ্ট্যাল' প্রধান হওয়ার জন্য জীবনের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের সংকট ও সমস্যার চেয়ে, দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদের আধিক্য হয়েছে উগ্রভাবে। এই উপন্যাসটিতে জীবননিষ্ঠার পরিবর্তে আমরা অনেক আধুনিক মতবাদ ও নিষ্পৃহ এবং নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হই, যেখানে বুদ্ধির তৃপ্তি ঘটলেও চিত্ত শান্ত হয় না। শরৎচন্দ্রের সমস্ত লেখার মধ্যে 'শেষ প্রশ্নে'র স্থান একটি বিশেষ গোলার্ধে; তাই এর আলোচনাও হয়ে থাকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের বিভিন্ন মতবাদে—প্রেম ও মনস্তত্ত্বের ভাবসম্মিলনে নয়।

শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্বস্পৃষ্ট—কিরণময়ী। তার অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লেখক বলেছেন: "···নিরুপমা,···লীলা-কৌশলময়ী, তেজস্বিনী যুবতী।" কিরণময়ীর অসাধারণ রূপ ও দেহলাবণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তীব্র ভোগস্পৃহা ও নিবিড় আসঙ্গলিপ্সা। সংস্কারহীন মুক্ত মনের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, আধুনিক জড়বাদ এবং নাস্তিক্য বস্তুবাদী দর্শন তার

জীবনের জটিলতা ও দ্বন্দ্বকে খুবই যন্ত্রণাকাতর করেছিল। কিরণময়ীর চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবন-অস্থিরতার যে চিত্র, তা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ব্যক্তি-মানুষের অশান্ত, বিক্ষুব্ধ ও লাঞ্ছিত জীবনের চরম প্রকাশ। 'চরিত্রহীনে'র নায়িকা সংশয়বাদ থেকে কোনদিন মুক্তি পায়নি বলে, তার জীবনে প্রেম ও প্রতিহিংসার দ্বন্দ্বের কোন স্বাভাবিক সমাধান ঘটেনি। আধুনিক মানুষের জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদী সংশয়ক্ষুব্ধ চিত্তের মর্মান্তিক পরিণতি শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর অনুভূতি ও ভারসাম্যের অবলুপ্তির মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

কিরণময়ী অত্যন্ত তীব্রভাবে 'সতীত্বে'র সমালোচনা করেছে। তার চিন্তায়, সতীত্বের উজ্জ্বল রূপে নারী আত্মপ্রতারণা করে থাকে। স্বামীপ্রেমে একনিষ্ঠা, অবৈধ প্রণয়ের প্রতি ঘৃণা, ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা—সবই মানুষের সংস্কারাবদ্ধ চিন্তার পরিণতি। নারীর জীবনের প্রকৃত বিকাশ ও রূপ, সমাজ ও ধর্মনীতি বোধের কঠিন চাপে বিশীর্ণ হয়ে যায়। কিরণময়ীর এই বিদ্রোহী মানসচিন্তার অন্তরালে ছিল আপন জীবনধর্মের প্রতি সমাজ ও পরিবারের গভীর বঞ্চনা। কিরণময়ীর স্বামী হারাণ তার নারীত্বকে বিকশিত করতে পারেনি। কেতাবী বিদ্যার পাষাণভারে তার চিত্ত হয়ে উঠেছিল শুষ্ক। এ ছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠের মধ্যে জীবন সম্পর্কহীনতা লক্ষ্য করে সে আরও বিদ্রোহিণী হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং জীবনাচরণের কামনা তার জীবনে দুই মেরুর ব্যবধান রচনা করেছিল। ফলে কি শাস্ত্র কি স্বামীভক্তি কোনটাই কিরণময়ীর মধ্যে দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। জীবনবোধ ও জীবনসম্পর্কজাত কোন নীতি বা ধর্মে সে ছিল সর্বদা সংশয়মুক্ত। তার মানস পরিবর্তনের স্তরটি শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে মনো-বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন: "ছেলেবেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামীভবনে আসিয়াছিল। ··· স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালবাসেন নাই। তিনি ··· রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাঁহাকে এমনি গ্রাস করিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই। এমনি করিয়া এই নিরুপমা প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী শৈশব অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—এমনি করিয়াই সংসারের সৌন্দর্য মাধুর্য হইতে নির্বাসিতা, শুষ্ক কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এমনি স্নেহ-প্রেম বঞ্চিত হইয়াই সে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্মও জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল।" কিরণময়ীর জীবনবিদ্রোহ ও সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করে আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চিত্তপ্রদাহের তীব্র জ্বালায় প্রকাশ করবার মূলে ছিল তার অবদমিত

ও অপরিতৃপ্ত জীবনপিপাসা। স্বামীর সংস্পর্শে তার নারীধর্ম একেবারেই চরিতার্থ হয় নি। স্বামীসঙ্গ সুখ অথবা পারিবারিক জীবনধর্মের পরিতৃপ্তির কোন উপলব্ধি প্রত্যক্ষভাবে সে জীবনে অনুভব করেনি। অথচ এই অনুভূতির প্রতি কিরণ-ময়ী সারাজীবন সাগ্রহে অপেক্ষা করেছে। নারীধর্মের অপূর্ণতাই তাকে সতীধর্মের প্রতি নিষ্ঠ হতে দেয়নি। কোন পৌরাণিক আদর্শবাদ অথবা বিশ্বাস কিংবা ধর্মের সনাতন নীতিবোধ তার বিচারে অভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি; বরঞ্চ এই সমস্তের বিরুদ্ধে সে অবিশ্বাসী হয়ে নাস্তিক হয়ে উঠেছে। কিরণময়ী নিজের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করে দিবাকরকে বলেছে: "আমি ভগবান মানিনে, আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, স্বর্গ নরক ও-সব কিছুই মানিনে,—ও-সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল, আর এই দেহটাকে।" কিরণময়ীর অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা তার ঐহিক সুখাভিলাষী মনোভাবের পটভূমি হিসাবে কাজ করেছে। আধুনিক কালে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় যৌন সুখের অনুসন্ধান একটি বড় আবিষ্কার। জীবনের উপর এই প্রবৃত্তির প্রভাব এবং প্রতিপত্তি অত্যন্ত ব্যাপক। একে অবদমিত রেখে বা অস্বীকার করে জীবনের বিকাশকে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন করে তোলা দুরূহ। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর চরিত্র ব্যাখ্যার মধ্যে অবদমিত চিত্ত বুভুক্ষার যে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে বৈজ্ঞানিকের পক্ষপাতশূন্য মনোভাবনারই বিকাশ দেখতে পাই। তিনি প্রকাশ্যভাবে বলেছেন: "মেয়েদের যৌবনের প্রেম আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে তৃপ্ত হয় না।" এজন্যই তাঁর কিরণময়ী দেহবন্ধ প্রেম ও প্রবৃত্তি চরিতার্থতার মধ্যে নারী জীবনের পরিপূর্ণতা অনুসন্ধান করেছিল ও তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিল। দেহের কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির মধ্যে জীবন পিপাসার তৃপ্তি সাধন আধুনিক ভোগবাদী চিন্তার অন্যতম দিক। আধুনিকতায় বিশ্বাসী কিরণময়ী সর্বসংস্কারমুক্ত মন দিয়ে তাকেই গ্রহণ করেছে। দেহবাদ ও ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে সে প্রেমের প্রকৃত রূপের সন্ধান করেছিল। তার উপলব্ধি হয়েছিল যে নারী দেহের সার্থক তৃপ্তি সৃষ্টিতে, যার অপর নাম নারীর রূপ এবং যৌবন। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর মাধ্যমে আধুনিকতার সুখবাদ দর্শনকে তুলে ধরেছেন: "মনে হয় সন্তান ধারনের জন্য যে-সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। ··· ততক্ষণই তার রূপ, যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ-যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।" কিরণময়ী প্রবৃত্তিকে জীবন থেকে অস্বীকার করতে চায় নি। সে প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বাস্তব বলে গ্রহণ করেছে। তার জড়বাদী দর্শনচিন্তা এ বিষয়ে কার্যকরী হয়েছে। তার মতে প্রেম দেহ বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নয়। পার্থিব কামনার অভ্যন্তরে ও

প্রবৃত্তির তলদেশেই ভালবাসার অধিষ্ঠান। ভালবাসা যে সম্পূর্ণ জৈবিক ব্যাপার, এই বৈপ্লবিক চিন্তা কিরণময়ী দ্বিধাহীনভাবে দিবাকরের কাছে প্রকাশ করেছে: "পঞ্চভূতের দেহটা বড় না হওয়া পর্যন্ত ··· স্বর্গীয় প্রেমের কোন সংবাদ রাখবারই তার অধিকার জন্মায় না। ততদিন পর্যন্ত স্বর্গীয় আকর্ষণ তাকে একতিল নড়াতে পারে না। পৃথিবীর আকর্ষণ ত চিরদিনই আছে, কিন্তু সে আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করতে গাছের পাকা ফলটিই পারে, কাঁচায় পারে না। তার আঁশ শাঁস পৃথিবীর রসেই পাকে, স্বর্গের রসে পাকে না। ··· এই তার প্রকৃতি, এই তার প্রবৃত্তি, এই তার স্বর্গীয় প্রেম। বিশ্ব জুড়ে এই যে অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টির খেলা রূপের খেলা চলেচে, স্বর্গীয় নয় বলে এতে দুঃখ করবার বা লজ্জা পাবার ত কিছুই দেখিনে। ··· প্রবৃত্তির তাড়না চাইনে, স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করব—প্রেমের ব্যবসা অত সোজা নয়। ··· মানুষের প্রবৃত্তি জিনিসটা যুক্তি নয় বলেই আছে। যাকে ঘৃণিত বলচ, সেটা আসলে সুবুদ্ধির অভাব। অর্থাৎ যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না, তাকেই ভালবাসা। অসাবধানে গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙার অপরাধ মাধ্যাকর্ষণের উপর চাপান, আর প্রেমকে কুৎসিত ঘৃণিত বলা সমান কথা। ··· যে দেহে তার জন্ম, সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির নির্দিষ্ট সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই তার যৌবন। তখনই শুধু সে অন্য দেহ সংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্য শিরায় উপশিরায় বিপ্লবের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, তাকেই পণ্ডিতদের নীতি-শাস্ত্রে পাশবিক ব'লে গ্লানি করা হয়। তাৎপর্য না বুঝতে পেরেই হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘৃণিত বলে, বীভৎস বলে সান্ত্বনা লাভ করে। ··· এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই অমন হেয় অমন ছোট হতে পারে না। এ সত্য। সূর্যের আলোর মত সত্য ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণের মত সত্য। কোন প্রেমই কোনদিন ঘৃণার বস্তু হতে পারে না।"

কিরণময়ী আপন জীবনে প্রেমকে কোনদিন উপেক্ষা বা ঘৃণা করে নি। তার চিন্তাতে কোন প্রেম অবৈধ নয়। এই বোধ চিত্তের অবক্ষয়জাত সংস্কার। আমরা একথা বারবার দেখেছি যে আধুনিকতার বড় পরিচয় নিহিত আছে মনের সংশয়মুক্ত দ্বিধাহীন প্রেমানুভূতিতে। সমাজের অনুশাসনের মধ্যে প্রেমের উজ্জ্বল মহিমা বিকশিত হয় না। চিরন্তন অথবা শাশ্বত প্রেমের প্রতিষ্ঠাতে লোকনিন্দার অভাব কোনদিন ঘটেনি। অথচ প্রেম সমস্ত কিছুকে হেলায় তুচ্ছ করে নিজের মহিমাকে ব্যক্ত করেছে। মানুষ যেখানে সমাজ ও সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রেমের সামঞ্জস্য স্থাপন করে প্রেমকে স্বীকার করে নিয়েছে, সেখানে সমাজের মাহাত্ম্য রক্ষিত হলেও প্রেমের গৌরব বাড়ে নি। সমাজের চিরন্তন বিধি ও নিয়মকে অস্বীকার করাই প্রেমের

প্রাকৃত ধর্ম। তাই যুগে যুগে প্রেমিক-প্রেমিকারা বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী। ফলে, প্রেম সমাজবৈধ কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। ব্যক্তির আন্তরসত্যতেই প্রেমের পীঠস্থান। সমাজের অনুশাসনকে অস্বীকার করে জীবনে প্রেমের প্রতিষ্ঠাই আধুনিক চিন্তার প্রাকৃত ধর্ম; কিরণময়ীর প্রেমে সেই চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাধিকারের নিরপেক্ষ দাবিতেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা; সমাজ ও ব্যক্তিমানসের সাপেক্ষ দাবির উপর নয়। কিরণময়ীর এই আধুনিক চিন্তার বিশ্লেষণে প্রেমে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে যে মতবাদ, তা লেখকের কথায় "আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি! সুতরাং, কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে, কাহারো সত্যিকার অধিকারে হাত দিতেছি কি না। আবার এ অধিকার বাহিরের দিকে যেমন, ভিতরের দিকেও ঠিক তেমনি। নিজের উপরেও নিজের একটা সত্য অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারো চেয়ে তুচ্ছ নয়। সে অধিকারেও বাহিরের কাহারো হস্তক্ষেপ সহ্য করা নিজের উপরে অন্যায় করা।"

"আমি বিধবা, আমার উপরে কারো ন্যায়সঙ্গত দাবি নেই, তুমিও অবিবাহিত, তোমার হৃদয়ের উপরেও কারো অধিকার নেই। ·· যাকে অবৈধ বলে মনে করচ, সে তোমার সংস্কার—যুক্তি নয়।…এই সংসারেই স্ত্রী-পুরুষের এমন অনেক মিলন হয়ে গেছে, যাকে কোনমতেই পবিত্র বলা যায় না। …ইতিহাস-পুরাণ পড়ে দেখো। অথচ, সে-সব মিলনকেও সমাজ স্বীকার করেছিলো এবং অবশেষে বিয়ের মন্ত্র দিয়েও সুপবিত্র করে নেওয়া হয়েছিল। ' সমাজকে আঘাত করা এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিস নয়! …সব জিনিসেই একটা সত্যিকার অধিকার আছে। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়। …সব কাজে নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলেও যেমন সমাজ থাকে না, সমাজ যদি সব সময়ে এবং সব কাজে নিজের মতটাই চালাতে যায়, তাতেও মানুষ টিকে না। মানুষই ভুল করতে, অন্যায় করতে জানে, আর সমাজই জানে না ঠাকুরপো? উভয়েরই সীমা নির্দিষ্ট আছে …যেভাবেই হোক লঙ্ঘন করলেই অমঙ্গল। সে-অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন ক্ষমতা তোমাদের ভগবানেরও নেই।" কিরণময়ীর এই উক্তির পশ্চাতে তার 'সতীধর্ম" অস্বীকারের যুক্তি চিহ্নিত হয়ে আছে। বিবর্তনবাদী নীতি ধর্ম ও সামাজিক বিধানের অভিব্যক্তির উপর শরৎচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস ছিল। মানুষের সমাজ-ইতিহাসের বিভিন্ন পরিবর্তন ও রূপান্তরের কথা তিনি জানতেন। তাই কোন

সংস্কারের নিগড় তাঁর চিন্তাকে শ্লথ করতে পারেনি। তাঁর আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ সংলাপ—জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর "নিজের বুদ্ধি-বিচারের কাছে—সমাজের কাছে নয়।" 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীও শরৎচন্দ্রের আধুনিকতার এই উপলব্ধিকে জীবনের প্রতি তরঙ্গভঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেঃ "বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার তুলাদণ্ডই সে গ্রাহ্য করে না, এবং যে বস্তু ইহার বাহিরে, তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করে না।"

কিরণময়ীর চিত্তের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অশান্ত বিক্ষুব্ধতা ও পরিশেষে যে করুণ পরিণতি, তাতে শরৎচন্দ্র আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা, মনের অস্থিরতা ও জড়বাদী জীবনদর্শনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকটি দেখিয়েছেন। কিরণময়ীর বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা তার চিত্তের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। অপরিতৃপ্ত নারীত্ব এই দেহকামী নারীকে বিপথগামী করে। ন্যায় ও সামাজিক নীতির মূল্যবোধ কিরণময়ীর দেহ এবং আত্মার প্রচণ্ড সংঘর্ষে খড়কুটোর মত ভেসে যায়। আপন প্রাণ ও মনের সঙ্গে জৈব কামনার এই সংঘাত আধুনিকতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ। কিরণময়ীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অনুরূপ সংঘর্ষের পরিচয় দেখতে পাই। সে অপরিতৃপ্ত নারীত্বকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গসুখ গ্রহণ করেছিল; কিন্তু এই দেহ সম্ভোগ তাকে পরিতৃপ্তি দিতে পারেনি। তার মনের মধ্যে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, যা তাকে অস্থির এবং অশান্ত করে তোলে। এই অধীরতা ও অশান্ত বিক্ষুব্ধতা আধুনিক মানুষের জীবনচিন্তার বিশিষ্ট লক্ষণ। একদিকে বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য আগ্রহ অথচ পরিতৃপ্তির অভাবে চিত্তজ্বালা—দুই বিপরীত ভাবদ্বন্দ্বের সংঘাতে কিরণময়ীর জীবনের করুণ কাহিনী ট্র্যাজেডির নিঃসীম শূন্যতা ও হাহাকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যৌবনের তীব্র প্রদাহ ও দেহ সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা তাকে কি ভাবে অনঙ্গ ডাক্তারের প্রতি আকর্ষিত করেছিল, তা সে দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করে উপেন্দ্রকে বলেছেঃ "কত বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা আমার এই বুকের মাঝখানে জমাট বেঁধে ছিল বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল। ...যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দমার গাঢ় কালো জলও অঞ্জলি ভরে মুখে তুলে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা।" কিন্তু দেহোপভোগের পরিণতি তার চিত্তের জ্বালাকে মর্মান্তিক করে তোলে। একটি ভুল ধারণার পরিসমাপ্তিতে অন্তরের অপরিসীম গ্লানি অশুচিতার তীব্র জ্বালায় তার দেহ ও মনকে ক্রমশঃ ক্ষয় করতে থাকে। এই অবক্ষয়ের প্রদাহ অত্যন্ত অসহনীয়। আধুনিক মানুষের চিত্তজ্বালা কিরণময়ীর ট্র্যাজিক পরিণতির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছেঃ "তারপরে—উঃ, সে কি গা বমি বমির দিনগুলোই কেটেছে...কিন্তু বমি করতেও পারলুম না...শাশুড়ী আমার মুখ চেপে ধরলেন। ...তার পরে

আসক্তি ঘৃণার, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার অবিশ্রাম সংঘর্ষে যে গরল অহরহ উঠতে লাগল…দেব-দানবের নিষ্ঠুর আকর্ষণে মন্দার-পীড়িত বাসুকিও বোধ করি ততখানি বিষ তার অতবড় মুখ দিয়ে ছড়াতে পারেনি। আমার মনে হয়, এ-বাড়ীর প্রত্যেক ইট-কাঠ, দরজা-জানলা, কড়ি-বরগা পর্যন্ত বিষে নীল হয়ে আছে।"

কিন্তু উপেন্দ্রকে ভালবেসেও কিরণময়ীর চিত্ত শান্ত হয়নি। সে উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও দৃপ্ত আত্মাভিমানে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে নি। অথচ প্রেম ও ভালবাসার প্রতি তার আকর্ষণ নিবিড়। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে প্রকাশ্য ভাবে বলেছে ঃ "ভালবাসার স্বাদ আমি পেয়েছি—এ আমি আর ছাড়তে পারব না। ভালবাসা আমার চাই-ই—ভাল আমাকে বাসতেই হবে।" কিন্তু ভালবাসায় প্রয়োজন নিঃসংকোচ আত্মনিবেদন এবং নমিতাঙ্গী চিত্তভাবনা। আত্মগরিমা অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভালবাসায় যে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এ শিক্ষা কিরণময়ীর হয় নি। তার চিত্ত চির পিপাসিত ও ঊষর থেকে গেছে। সে কোনদিন প্রেমকে অন্তমুখী করে নীরবে সকল ব্যথা ও বেদনাকে উপেক্ষা করতে শেখে নি। তাই উপেন্দ্রের আঘাত কিরণময়ীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের খর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে চোখ দিয়ে আগুন ছড়িয়েছিল এবং প্রতিহিংসায় উন্মাদ করেছিল। স্বাভিমানবোধের তেজস্বিতা অনেক সময়ে আত্মহননের দিকে কিভাবে নিয়ে যায়, বিভ্রান্তির কুহেলীতে জীবনকে অভিশপ্ত করে দেয়, প্রেমের দ্বৈত সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বে মন দুঃসহ ক্লান্তিভারে ভেঙ্গে পড়ে, তারই রূপপ্রতিমা শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী। আধুনিকতার বিচ্ছিন্নতাবাদ ও স্বাভিমানবোধের আলোকে চরিত্রটিকে আমাদের উপলব্ধি কবতে হবে।

কিরণময়ীর জীবনের অশান্তি আপন মনের অস্থিরতার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে। এই অস্থিরতা আধুনিকতার একটি অভিশাপ ; এবং কিরণময়ী সেই অভিশাপে অভিশপ্তা রমণী। উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সে আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে নিজেকে করেছে ক্ষত-বিক্ষত। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে দিবাকরকে নিয়ে বর্মা যাত্রা করে চিত্তের কামনাবহ্নিকে প্রশমিত করতে চেয়েছে। কিরণময়ীর জীবনে এটা দ্বিতীয় ভুল এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ভুল। অনঙ্গ ডাক্তারের কাছে আত্মবিক্রয় করে অনুশোচনার মধ্যে তার প্রেম ও ভালবাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, উপেন্দ্রকে ভালবাসার মধ্যে সে নিজের অশান্ত জীবনে বহুলাংশে শান্তি পেয়েছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি যা আধুনিক দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে, সেই পরিশেষে ভ্রান্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তাকে গ্রাস করল এবং ঠেলে দিল ভয়াবহ পরিণতির দিকে। কিরণময়ীর এই ভুলের কোন প্রায়শ্চিত্ত ছিল না। ফলে, একদিকে চিত্তের ভয়াবহ আত্মগ্লানি ও অপর দিকে দিবাকরের জাগ্রত যৌবন ক্ষুধা

থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কিরণময়ীর চিত্ত সংঘাতের রূপটি খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে : "ছ' মাস পূর্বে সেই যে একদিন সে সমাজকে ধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়া মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া এক অবোধ অপরিণামদর্শী যুবককে রূপ ও ভালবাসার মোহে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বপ্রকার সার্থকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া আনিয়াছিল, আজ সেই প্রতারণার ফাঁসিই কিরণময়ীর নিজের গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে।

পাপের সহিত নিষ্ফল ক্রীড়া করিতে গিয়া সেই দিবাকরের বুকের ভিতর হইতেই আজ বাসনার যে রাক্ষস বাহির হইয়া আসিয়াছে, আত্মরক্ষা করিতে তাহারই সহিত অহর্নিশি লড়াই করিয়া কিরণময়ী আজ ক্ষত-বিক্ষত।" অথবা, দিবাকরের কাছে কিরণময়ীর করুণ প্রার্থনা : "যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যান, সেইদিন থেকে তোমাকে ছোট ভাইটির মত ভালবেসেছিলুম। তাই ত এই ছটা মাস নিজের ছলনায় আমি ক্ষত-বিক্ষত। তোমার চোখের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম-নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণার লজ্জায় কেমন করে শিউরে ওঠে, তা কি একটা দিনও বুঝতে পারনি? আমার পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক না থাক্, কিন্তু এই দেহটার ওপর তোমার লুব্ধ দৃষ্টি আর আমি সইতে পারিনে।"

বিদ্রোহ, উপেক্ষা অথবা অস্বীকার করাই আধুনিক চিন্তার একমাত্র পরিচয় নয়। আপন যুক্তিবাদী মন ও বৌদ্ধিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে আত্মসংরক্ষণ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করার ইচ্ছাও আধুনিকতার একটি দিক। যে প্রেম ও ভালবাসাতে চিত্তের স্ফূর্তি প্রকৃতভাবে বিকশিত হয় না, আধুনিক মতবাদ তাকে অগ্রাহ্য করে। সংস্কারমুক্ত চিন্তাতে প্রাণ ও চিত্তের দাবিই স্বীকৃত হয় এবং এই দাবির প্রতিষ্ঠা উদারতা অথবা বিশালতার পরিমণ্ডলে। কিরণময়ীর অনমনীয় প্রাণশক্তি (Life force) যুক্তি-বিচার ও আত্মবিকাশের দাবিতে আপন অধিকারবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিল; অথচ আধুনিক চিন্তার অপর কোটিতে যে সংশয়বাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিক্ষুব্ধ হতাশা এবং বিদ্রোহী চেতনা জীবনের সমস্ত কামনা ও বাসনাকে অপরিপূর্ণতায় ভরিয়ে দেয়, তাকে সে এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাই কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের আধুনিক চিন্তাবেদীতে সজ্ঞান মনের সর্বাপেক্ষা করুণ সৃষ্টি। "চরিত্রহীন গল্প হিসাবে—তা' সে প্রায় কিছুই নয়। অ্যানালিসিস্—সাইকোলজিক্যাল—এই ইচ্ছা নিয়েই লিখি।"[৩০] লেখকের এই কথা 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত অভিব্যক্তি।

'গৃহদাহ' (১৩২৬) শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। লেখক নিজেও একথা স্বীকার করতেন। এই উপন্যাসের রচনার পিছনে একটি গভীর জীবন-মনস্তত্ত্বের রূপ ও

রূপায়ণ বিশ্লেষিত হয়েছে। 'গৃহদাহ' গ্রন্থটির উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করে বলা যায়ঃ "কুলত্যাগিনীদের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া শরৎচন্দ্র দেখিয়াছিলেন যে ইহারা অনেকেই সধবা, অনেকেরই অবস্থা বিপর্যয়ে পা পিছলাইয়া গিয়াছে, কেহ বা অনেক সময় নিতান্ত তুচ্ছ কারণে ঘটনাচক্রে পরপুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই রকম একটি ঘটনাকে ভিত্তি করিয়াই তিনি 'গৃহদাহ' রচনা করিয়াছিলেন।"[৩১] সধবা কুলত্যাগিনীদের কাহিনী তিনি 'শ্রীকান্তে'র অভয়া, 'স্বামী'র সৌদামিনী এবং 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের বিরাজের মধ্যে দেখিয়েছেন এবং প্রত্যেকের কুলত্যাগের মর্মকাহিনীও বর্ণনা করেছেন প্রেম ও মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে। তবে এদের জীবনের নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতার পিছনে আছে সামাজিক, বিশেষভাবে পারিবারিক জীবনের লাঞ্ছনা এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সমাজ ও পরিবারের ভূমিকা অচলার নিষ্ফল জীবনের উপরে অপেক্ষাকৃত কম। তার জীবনের ভারসাম্যহীনতা, অস্থিরচিত্ত মানসিকতা এবং সর্বোপরি ব্যক্তি জীবনে সংযমের অভাব জীবনের পরিণতিকে করুণ ট্র্যাজেডিতে পরিণত করেছে। প্রেম ও আসক্তির দ্বন্দ্বে শরৎচন্দ্র অচলার দুর্বল চিত্তের বিভিন্ন রহস্য ও আত্মদহনের জ্বালা উদ্‌ঘাটন করেছেন অপরিসীম মনন শক্তিতে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাস একজন প্রেম-বুভুক্ষু রমণীর প্রবৃত্তির উন্মাদনাতে আত্মহারা রূপের কথাচিত্র। কিন্তু 'গৃহদাহ'তে আমরা একজন শিক্ষিতা নারীর ভালবাসার দ্বিমুখী আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচয় পাই। শরৎচন্দ্র মনের জ্বালাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞানীর রীতি অনুযায়ী দেখতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিত্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ছিল বলে কোন সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বা শুচিবাই মানসিকতা একেবারে স্থান পায় নি। একজন বিবাহিতা রমণীর পক্ষে অপর একজন অবিবাহিত পুরুষকে ভালবাসা এবং জীবনে একান্তভাবে কামনা করা যে মনের স্বাভাবিক ধর্ম, তাতে শরৎচন্দ্রের কোন সংস্কার ছিল না। অচলা চরিত্র পরিকল্পনাতে আধুনিকতার আর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, এই রমণীর অন্তর্জগতটি কোন দেশ-কালের পরিচ্ছিন্ন বিশেষ চরিত্র নয়—সাধারণ মানব চরিত্রের অন্তর্গত।[৩২] রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে যেমন সমাজনিরপেক্ষ চিরন্তন ব্যক্তিমানব অথবা ব্যক্তি-মানবীর অন্তর্লোকের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে, 'গৃহদাহ' উপন্যাসে (যদিও সমাজ একেবারে অনুপস্থিত নয়) অনুরূপ মনোবিশ্লেষণের প্রতিচ্ছবি দেখি।

'গৃহদাহ' প্রকৃতপক্ষে একটি বিবাহিতা রমণীর পদস্খলনের কথাচিত্র। শরৎচন্দ্র অচলার পদস্খলন কাহিনীর সঙ্গে জীবন ও মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। নর-নারীর মনের গভীর রহস্যময়

অজ্ঞেয় স্তরে যেখানে প্রবৃত্তির পরস্পর বিরোধী নিষ্ঠুর ও আত্মঘাতী সংগ্রামে বহির্মুখী জীবন ক্ষত-বিক্ষত এবং অসহনীয় হয়ে ওঠে—মনোবিকলন তত্ত্বের এই আধুনিক বিশ্লেষণ 'গৃহদাহ' উপন্যাসে খুবই বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজনিষিদ্ধ প্রণয়ের কাহিনী শুধুমাত্র সহানুভূতির হৃদয়স্পর্শে এখানে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেনি, প্রেম এই উপন্যাসে নর-নারীর দেহের অভ্যন্তরে কামনার শিকড় সম্প্রসারিত করে জীবনরসকে সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত করেছে। দেহচারী প্রেমের প্রমত্ত রূপ শরৎচন্দ্র তাঁর অন্য কোন উপন্যাসে দেখান নি। তাঁর সংস্কারমুক্ত মন নারীর একনিষ্ঠ প্রণয়নিষ্ঠাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। সমাজ অথবা পারিবারিক নীতি ধর্মের অনুশাসনে নারীর প্রণয়চিন্তা যে অনড় নয়, আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণী বিচারে বিশ্বাসী শরৎচন্দ্রের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়িকা অচলা প্রেমের ক্ষেত্রে একেবারেই একনিষ্ঠ নয়। যৌবনদীপ্ত দেহকামনার সঙ্গে আপন মনের অনুভূতির যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাতে তার জীবনের ভরকেন্দ্র বিপর্যস্ত হয়েছে। চিত্তের সংশয়ের আবর্তে অচলার প্রেম হয়েছে উন্মার্গগামিনী। দেহ ও আত্মা, প্রাণ ও মনের সংঘর্ষ আধুনিকতার যে একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, অচলার মধ্যে তার দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে এর করুণ রূপটি ফুটে উঠেছে। দুই বিরুদ্ধ কামনার সংঘর্ষে অচলার জীবনের তার গেছে ছিঁড়ে।

শরৎচন্দ্র অচলার মানসরহস্য বিশ্লেষণে যে জটিল মনস্তত্ত্বের বিচিত্র কথা বর্ণনা করেছেন, তাতে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়। মানুষের মনের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তরে পরস্পর বিরোধী ভাবধারা যে পাশাপাশি বাস করে, ফ্রয়েড তাঁর 'Psychoanalysis of Mind' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে মানুষের জীবনের জটিলতম রহস্য উন্মোচনে এই তত্ত্বের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির মন অখণ্ড বা অবিভাজ্য নয় এবং একই সঙ্গে পাশাপাশি পরস্পর বিরোধী মনোভাব বিরাজ করে থাকে। ফলে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে একই সময়ে ভালবাসা অথবা হৃদয় বিনিময় করা কোনমতেই অস্বাভাবিক বলা চলে না। কিন্তু মন এবং হৃদয়কে সংযত করে রাখতে আমাদের শাস্ত্রবিধানে অনুশাসনের পরিমাণ কম নয়। তবু মানুষের চিত্ত বা ব্যক্তিমন এই সমস্ত শাস্ত্রীয় নীতির নিয়ম-নিষেধকে বারবার অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। অনেক সময় যুক্তিবাদ ও প্রত্যক্ষ মননশীল চেতনাও মনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সচেতন মনের সংস্কার-নীতিবোধ, সামাজিক সম্ভ্রম প্রবৃত্তির দুর্দমনীয় তাড়নাতে শতধা হয়ে যায়। আধুনিক মানুষের জীবন-ট্র্যাজেডি বোধ করি এই 'চক্রবৎ' চিত্ত চাঞ্চল্যের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। অচলার জীবনের ট্র্যাজেডির বীজ তার অস্থিরচিত্ত

মানসিকতার ভূমিতে পল্লবিত হয়েছে, যদিও তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাব ছিল না।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনার বহুস্থানে লক্ষ্য করেছি যে আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যেই মানুষের সকল প্রবৃত্তির অভিযান। সামাজিক অথবা মানসিক সংস্কার বর্তমানে জীবন নিয়ন্ত্রণের অভিব্যক্তিতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই বিবাহিতা রমণী অচলা স্বামীপ্রেমে একনিষ্ঠ না হতে পারলে কোন সংকোচ অথবা অপরাধবোধে ক্লান্ত হয় না। যে বিবাহে হৃদয়ের সংযোগ নেই, সেখানে 'ছায়েবানুগতা পতিম্' শাস্ত্রবাক্য মূল্যহীন হয়ে যায়। সেজন্য অচলা প্রেমহীন জীবনের আত্মবঞ্চনা থেকে মুক্তি চেয়েছে। সে প্রকাশ্যভাবে হৃদয়হীন দাম্পত্য জীবনের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছে : "সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।" অচলার চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লেখক নিজেই বলেছেন : "সে স্বামীকে ভালবাসে না, অথচ ভুল করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সারা জীবন সেই ভুলেরই দাসত্ব করার বিরুদ্ধে তাহার অশান্ত চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অহর্নিশ লড়াই করিতেছিল।" অথচ অচলা ও মহিমের বিবাহের বন্ধন ছিল ভালবাসার এবং অচলাই এই বিবাহ বন্ধনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

মহিম ও অচলার মানসিক দূরত্ব অথবা ব্যবধান ছিল দুই মেরুর। একজন সংযত, শান্ত, ধীর এবং কোন পরিবেশেই অস্থির নয়; কিন্তু অচলা নারীসুলভ রোম্যাণ্টিক মনোভাবনার অধিকারিণী, জীবন-যৌবন ও নারীত্বকে পূর্ণ করে তোলবার আগ্রহে অধীরা। অনুভূতির যে গভীর রহস্যে ডুব দিয়ে একটি রমণী আপন জীবন সম্বন্ধে সুনিশ্চিত বিশ্বাস ও আপন প্রেমিক সম্পর্কে স্থির প্রত্যয়াভিষিক্ত হতে পারে, অচলার অস্থির জীবনানুভূতিতে তার পরীক্ষা হয়নি। আবার অপরদিকে সুরেশের কামনার বহ্নিদীপ্ত লালসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তার মহিমের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল অপরিহার্যরূপে। বৌদ্ধিক চেতনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার অক্ষমতাই অচলাকে পরবর্তীকালে বিবাহিত জীবনে cultural conflict-এর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই চিত্ত সংঘাতের আর্তির পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি। সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের যে আগ্রহ আধুনিক জীবনচিন্তার একটি বিশেষ রূপ, অচলার বিদ্রোহাত্মক প্রচেষ্টার মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটেছে। বিবাহ ব্যাপারে অচলার ঝটিতি সিদ্ধান্ত আধুনিক যুগের অস্থির মনের পরিচয় বহন করে। সুরেশের কাছ থেকে আত্মরক্ষার সক্রিয় প্রচেষ্টায়

মহিমকে অবলম্বন করে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত চিত্তে শান্তি লাভের প্রয়াসী হলেও অচলার মনের গভীরে স্বতন্ত্র এক আলোড়ন সৃষ্টি হতে বেশী দেরী হয় নি। তার মানসিক কাঠামোতে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল, তেমনি পিতা কেদারবাবুর অস্থির চিত্তের মানসিকতা, তার জীবনাচরণে দুর্নিবার প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দুইয়ের সংমিশ্রিত প্রভাব অচলার মানসিক কাঠামোকে গড়ে তুলেছিল। আধুনিক জীবনে নাগরিক বৈদগ্ধতা এবং উত্তরাধিকার রূপে জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত রক্ততরঙ্গে অনুভূত 'বিপন্ন-বিস্ময়' ক্লান্তি, তার রোম্যাণ্টিক চিত্তের অপমৃত্যুর কারণ হয়েছিল। বিবাহের পরে অচলার নারী অনুভূতি অকারণ পুলকে আত্মহারা হয় নি এবং স্বামীগৃহে যাত্রাকালে দীর্ঘ পথের কষ্ট, তার গ্রাম বাংলা সম্পর্কে কাল্পনিক বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল—"এই পথটুকুর মধ্যেই যেন তাহার নব বিবাহের অর্ধেক সৌন্দর্য তিরোহিত হইয়া গেল।" এ ছাড়া অচলা ছিল শহরের পরিমার্জিত রুচি ও পরিবেশে পরিশীলিত মহিলা। বিয়ের পর মহিমের গ্রামের পরিবেশ, তার জীর্ণ কুটিরের অবহেলিত ভগ্নাবশেষের রূপ, গ্রাম্য মানুষের স্থূল রঙ্গ রসিকতা—সমস্ত কিছু একযোগে তার ভাবপ্রবণ রোম্যাণ্টিক মনে আঘাত হেনেছিল। অচলার কল্পনাসত্যের অপমৃত্যু তার বিবাহিত জীবনের অশান্তির একটি বড় কারণ ছিল। বাস্তবসত্য ও চিত্তের অনুভূতির অসংলগ্নতা তার বিবাহিত জীবনের মাধুর্য নষ্ট করেছিল: "জীবনের সমস্ত গন্ধস্বাদ তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।"

অচলার প্রত্যয়ভাস্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাকে আত্মবিলুপ্তিতে বিবাহিত জীবন সমস্যার অবসান ঘটাতে দেয়নি; অথচ কোন শান্তিতীর্থের অনুসন্ধানও দিতে পারেনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই সংকট আধুনিক কালের গভীর জীবনসমস্যা এবং অচলাও একে অতিক্রম করতে পারে নি।

আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা, চিত্ত-অন্তর্দাহ এবং হৃদয়ের কামনা-বাসনার ঘনীভূত রূপ—শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস। 'গৃহ' ও 'দাহ' রূপকের অন্তরালে আধুনিক মানুষের বিশ্বগ্রাসী অনুভাবনার সঙ্গে জীবনের অসারত্ব (futility of life) শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন, নারীর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ কিভাবে তাকে সামাজিক ও সাংসারিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্বের মানুষ করে তুলেছে এবং সেই সঙ্গে অধিকার দাবি প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা সংগ্রাম তার জীবনকে শ্যামলী সন্ধ্যার বিধুরিমায় ভরিয়ে দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের অচলা সেই অধিকার প্রতিষ্ঠাপিয়াসী; জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, প্রশ্নমুখর আধুনিক রমণী, যে জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান করতে না পেরে

আত্মক্ষয়ের মধ্যে সকল কাজের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। অচলার অন্তর্দ্বন্দ্ব, চাওয়া-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ, সমাজ ও ধর্মের বিধানকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছাশক্তি গৌরবকে শ্রেষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা এবং পরিশেষে নিঃস্বতার বিরাট হাহাকারে বিলীন হয়ে গিয়েও ব্যক্তিজীবনকে অনন্য মহিমায় উজ্জ্বল করে তোলা, সমস্ত কিছু একসঙ্গে 'গৃহদাহ' উপন্যাসকে আধুনিক কালের একটি মহাভারতে পরিণত করেছে। শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থে দ্বৈরথ সমরে প্রেমের যে স্বরূপ দেখিয়েছেন, তা বর্তমান মানুষের চিত্তের কামনা, প্রয়াস ও ব্যর্থতার অভিব্যক্তি।

আধুনিক মানুষের চিত্তের প্রতিফলন ঘটেছে 'গৃহদাহে'র পাত্র-পাত্রীর মধ্যে। সাম্প্রতিক কালের দাবিতে যেহেতু নারী সমান মর্যাদা ও অধিকারের অংশীদার, সেহেতু তার ভূমিকা এবং জীবনের ব্যর্থ পরিণতির কাহিনী এত করুণ ও ভয়াবহ। অচলা আধুনিক কালের নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী জীবনচিন্তার জীবন্ত রূপ। তার জীবনদর্শন আধুনিক কালের জীবনমন্থনজাত বিষামৃত। তবে অচলার জীবনে অমৃত সত্য হয় নি, বিষই তার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করেছে। শরৎচন্দ্র যেহেতু ছিলেন দুই বিপরীত ভাবসমন্বয়ের কথাকোবিদ, তাই তাঁর চিন্তাতে কোন প্রতিষ্ঠা নেই, শুধুমাত্র স্থায়িত্বের আগ্রহ ও নতুন দিগন্তের অনুসন্ধানের পিপাসা আছে। এই অন্বেষণ যেমন করুণ তেমনি মর্মবিদারী। এই জীবনদৃষ্টির আলোকেই অচলার জীবনের প্রেম ও মনস্তত্ত্বের রূপটি উপলব্ধি করতে হবে। অচলা, সুরেশ ও মহিমকে কোন ব্যক্তিচরিত্র না ধরে আধুনিক জীবনচিন্তা-বোধ সমন্বিত এবং নতুন আদর্শবোধে অভিষিক্ত শাশ্বত নারী-পুরুষের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করলে বোধহয় বর্তমান কালের জীবনের করুণ ও বিহ্বল রূপটি উপলব্ধি করা যাবে। অচলাকে কেন্দ্র করে মহিম ও সুরেশের জীবনে যে অশান্ত ঝটিকার ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তাতে একটি চিরন্তন নিত্যতার পরিচয় আছে। মনে হয়, এই ত্রি-কোণ প্রেমের করুণ আলেখ্য সর্বদেশের সর্বকালের ঘটনা বা জীবনের কথাচিত্র হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে গৃহদাহ কথাটি সাংকেতিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। চিত্তরূপ গৃহদাহের কথা (মহিমের ভস্মীভূত গৃহের কথা মনে রেখেও) শরৎচন্দ্র এখানে বলেছেন এবং অচলাকেই এই কর্মের অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন বলে মনে হয়। প্রথমে তার অস্থিরচিত্ত মানসিকতার স্বরূপটি আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। এছাড়াও অচলা চরিত্রের মধ্যে কোন স্থির জীবনদর্শন (Philosophy of life) ছিল না। এর অভাবের জন্যই সে সুরেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকে ঠেকাতে কোন সক্রিয় ভূমিকা নেয় নি; উপরন্তু তার আচরণের মধ্যে

এমন একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল, যার ফলে সুরেশ অনেক সময়েই উন্মত্ত হয়ে তার দেহের উপর উৎপীড়ন চালাত। অচলার এই আচরণকে আমরা মনোবিকলন তত্ত্বের অবচেতন মনের রহস্যময় ক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতে পারি। সুরেশের প্রবৃত্তিপরায়ণ বল্গাহীন প্রেম তার দেহ-মনে 'স্তব্ধ তীব্র জ্বালা' ছড়ালেও, সেই অঙ্গারতপ্ত দেহ আকর্ষণের প্রতি কেমন একটা রোমাঞ্চকর সুখানুভূতি সে মনের অবচেতন স্তরে লালন করেছিল। সুরেশের প্রতি অচলার এই প্রচ্ছন্ন ও অপ্রতিরোধ্য কামনাবেগ না থাকলে, সে কখনই দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারত না। এছাড়া সুরেশের পরের জন্য যে আত্মোৎসর্গ, তাকে অচলা মহৎ প্রাণের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছিল। একটি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ থেকে তার অনুরাগের জন্ম হয়েছিল, এবং এরই ফলে সুরেশের মধ্যে যে একটি অসহিষ্ণু পৌরুষ মাঝে মাঝে অতিরেক আচরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করত, তাকে অচলা প্রশ্রয় দিয়ে সহ্য করেছিল। একে প্রেম না বলে অনুরক্তি বলা যেতে পারে। অনুরাগের মধ্যে প্রেমের গাঢ় রং না থাকলেও, আত্মসমর্পণের ইচ্ছা অচলার মনের কোণে যে নিবিড় হয়ে বাসা বেঁধে ছিল, তার প্রমাণ সুরেশের রাজপুর গ্রামের বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে অচলার অভিমানাহত বিক্ষুব্ধ চিত্তদ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আত্মসংযমের সদা সতর্ক প্রহরা থাকা সত্ত্বেও "আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু!" কথাটিতে মনের দুর্বলতাকে অচলা গোপন রাখতে পারে নি। কিছুক্ষণ পরে সকল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে প্রকাশ্যভাবে সে স্বামী মহিমের সামনে বলেছেঃ "তোমার আমি কোন কাজেই লাগলুম না সুরেশবাবু; কিন্তু তুমি ছাড়া আর আমাদের অসময়ের বন্ধু কেউ নেই। তুমি বাবাকে গিয়ে ব'লো, এরা আমাকে বন্ধ করে রেখেচে, কোথাও যেতে দেবে না—আমি এখানে মরে যাব।" হৃদয়হীন সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা এই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী রমণীর চিত্ত বিক্ষোভের মধ্যে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মনের অভ্যন্তরে একটি সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি আগ্রহও কোনক্রমেই অস্ফুট থাকে নি। মহিমকে বিবাহপ্রতিশ্রুতি নির্বন্ধ রূপে অঙ্গুরীয় প্রদান করার পরেও, তার ভারসাম্যহীন চিত্ত সুরেশের দিকে যে ঢলে পড়েছিল, তার কাহিনী অচলা স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে স্বীকার করেছে পরবর্তীকালেঃ "যেদিন সুরেশের কলিকাতার বাটী হইতে তাহারা এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় এমনি গাড়ী করিয়াই ফিরিতেছিল। যেদিন তাহার সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যেদিন এই সুরেশের হাতেই আত্মসমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই।" এই 'অসঙ্গত' এবং 'অসম্ভব' শব্দ

দ্বটির মধ্যে আধুনিক চিন্তার সমাজনিরপেক্ষ মতবাদ ও অনুভূতি আত্মগোপন করে আছে। চিত্তের এই ভাবদ্বন্দ্বে আধুনিক কাল ও ব্যক্তিমানসের জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে।

সুরেশের প্রতি অচলার হুতাশে এবং দহনে অনুরাগের যে অভিব্যক্তি, তাতে নারীত্বের ব্যাকুল তৃষ্ণা লক্ষ্য করা যায়। মহিমের সঙ্গ ও ভালবাসা তার জীবন কামনার এই দিকটিকে পরিস্ফুট হতে দেয় নি। সুরেশের গোপন কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সজাগ সহানুভূতি তাকে একটি অসহনীয় বেদনার আনন্দ দান করেছিল, এবং অচলাও চিত্তের রিক্ততা দিয়ে তাকে বরণ করেছিল ব্যগ্রভাবে: "সে চোখ বুজিয়া সেই আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, শুধু তাহাকেই দেখিবার জন্য, এবং ভাল করিয়াই দেখিবার জন্য যে অমন করিয়া আসিয়াছে ··· ইহাকে সে কুৎসিত বলিয়া, গর্হিত বলিয়া, অভদ্র বলিয়া সহস্র প্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল এবং অতিথির প্রতি গৃহ-স্বামীর এ চৌর্যবৃত্তিকে সে কোনদিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারংবার প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কোনমতেই সায় দিতেছে না, ইহাও তাহার অগোচর রহিল না, এবং কোথায় কিসে যে তাহাকে এতদিন উঠিতে বসিতে বিঁধিতেছিল, তাহাও যেন একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।" অচলার আপাত নিষ্ক্রিয় মৌন মুখরতার মধ্যে যে দ্বিধা, তা তার মগ্ন চৈতন্যে সযত্নে লালিত প্রেম বা ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এই সংকুচিত ও অবদমিত কামনা অচলার মানসদ্বন্দ্বের যে অপরিহার্য পরিণতি, আমরা তখনই বুঝতে পারি, যখন সে সুরেশের প্রতি ভালবাসাকে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা অনুভব করে না। অচলার মনের অন্দরমহলে যে বহ্নিজ্বালা, তা সুরেশের প্রতি নিষিদ্ধ ভালবাসার অভিব্যক্তি। শরৎচন্দ্র অচলার অন্তরের চিন্তাকে সদরমহলে মুক্তি দিয়ে অতি স্বল্পতম বাক্যে কয়েকটি জায়গায় প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি জব্বলপুর যাবার প্রাক্কালে: "যে উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোনমতেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। এমন কি, মাঝে মাঝে বিরাট ভয়ে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া এ সংশয় উঁকি মারিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে সেও সুরেশকে গোপনে ভালবাসিয়াছে কি না। প্রতিবারই এ আশংকাকে সে অসঙ্গত অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল ··· তথাপি ছায়ার

মত এ-কথা যেন তাহার মনের পিছনে লাগিয়াই রহিল, ঘুরিতে-ফিরিতেই যেন সে ইহাকে চোখে দেখিতে লাগিল।" সজ্ঞান মনের কাছে নির্জ্জান মনের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে গেলে যে ভীতি-বিহ্বলতা প্রকাশ পায়, অচলার চিত্তের আতঙ্কের পিছনে মনোবিকলন তত্ত্বের সেই অনুভূতি কাজ করেছে। তার সযত্ন লালিত গোপন প্রেম ও চিত্তের জুগুপ্সা এক অসতর্ক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে সুরেশকে সঙ্গী হতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেঃ "সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।" জব্বলপুরের পথে স্টেশনের মাঝখানে বর্ষণমুখর রাত্রিতে সুরেশ অচলার জীবনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করা সত্ত্বেও, তার চিত্ত বিক্ষোভ সুরেশের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সুরেশ তাকে গণিকা বলে ক্রুদ্ধ স্বরে অভিযুক্ত করলেও তার প্রতি অচলা বিরূপ হয়ে তাকে ত্যাগ করতে পারেনি। অচলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ তার নিষিদ্ধ প্রেম ও কামনার পঙ্কে ডুবে গেছে। প্রবৃত্তির তীব্র আসক্তিতে চিত্তের সকল গরিমা কিভাবে ডুবে যায়, প্রেম ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র তা সংস্কারমুক্ত চিত্তে দেখিয়েছেন। "সম্রাট শেরশাহের নামে প্রচলিত সরাইয়ে" অচলা ভগ্ন-বিধ্বস্ত জীবন-বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়েও সুরেশের প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ করতে পারে নি। পুরুষের পরকীয়া প্রেমের প্রতি বিবাহিতা নারীর যে আকর্ষণ এবং জীবনের চরম মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রেমের পূর্ণতার জন্য আত্মাহুতি প্রদান,—নারীর সংস্কারমুক্ত চেতনার এই দিকটি এখানে রূপায়িত হয়েছে। অচলা আধুনিক নারী মনস্তত্ত্বের একটি বাস্তব চরিত্র। সচেতন মনের প্রত্যক্ষ তাগিদে সুরেশের গর্হিত কাজকে সে ঘৃণা ও নিন্দা করলেও একই কালে সুরেশের জনসেবায় আত্মদানের মধ্যে জীবনকে চরিতার্থ করবার জন্য যে সাহস ও পৌরুষ, তাকে অচলা শ্রদ্ধা না করে পারে নি। যে কোন স্তরে প্রেমের মহিমাকে স্বীকার করা, এমনকি তা সমাজ অসমর্থিত প্রেম হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করার যে মানসিক প্রস্তুতি, মনে হয় আধুনিক জীবন চিন্তার একটি বিশেষ লক্ষণ। সরাইখানায় সুরেশের অচৈতন্য দেহ দেখে অচলার মনে যেন এই বোধেরই বিকাশ ঘটেছে লেখকের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণেঃ "ভালবাসার যে জাতি নাই, ধর্ম নাই, বিচার-বিবেক ভাল-মন্দ বোধ কিছুই নাই, যে এমন করিয়া মরিতে পারে, সে যে এইসব সমাজের হাতে-গড়া আইন-কানুনের অনেক উপরে, এ-সকল বিধিনিষেধ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ-কথা সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?"

আমরা জানি অচলা ছিল ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা। হিন্দুধর্মের সনাতন নীতি-বোধ ও সতীত্বের সমস্ত সংস্কারের প্রতি তার আজন্ম ঘৃণা বা বিরূপতা ছিল। ফলে, সতীত্বের প্রতি তার কটাক্ষ শরৎচন্দ্রের অভয়া বা কিরণময়ীর মত বৈপ্লবিক নয়।

মৃণালের সতীধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তার যে উক্তি, তাতে আজন্ম ব্রাহ্ম সমাজে লালিত জীবনবোধের ধারণাই অভিব্যক্ত হয়েছে। অচলার কাছে সতীত্বের সংজ্ঞার্থ ছিল আপন নারীধর্মের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা। অভয়া ও কিরণময়ী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উজ্জল দীপ্তিতে এই নারী-ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, স্বামীর প্রতি চিরকাল কায়মনোনিষ্ঠ থাকবার সামাজিক বিধানকে অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করে। নিছক আত্মবিলোপ নয়, সমান অধিকারের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি মর্যাদা ও আত্ম-সম্মানের পুনরুদ্ধারের সংগ্রামই ছিল 'সতীত্ব' অনুভূতির নব তত্ত্ব। এই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক। অচলা স্বামী মহিমের প্রতি সমাজ ধর্মসম্মত একনিষ্ঠ হতে পারে নি বলে তার কোন সংকোচ ছিল না, কিন্তু সুরেশ যখন তার ভালবাসাকে পরোক্ষভাবে মৃণালের স্বামীপ্রেমের তুলনায় হীন বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে, তখনই শুরু হয়েছে তার হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও অপর দিকে প্রথানুগত সামাজিক নীতিবোধ, তার চিত্তকে করেছে উদ্বেল এবং আপন সংশয়ক্ষুব্ধ মনের মধ্যে অচলা সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। চিত্তের সত্যনিষ্ঠা ও আত্মাভিমানের পটে সে যে নতুন করে জীবনসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিল, তার চিত্র শরৎচন্দ্র এঁকেছেন কোন শুচিবাই মনের পরিচয় না রেখে। অচলা সতীত্বকে, স্বামী-স্ত্রীর উদ্বাহবন্ধনকে কোন অনমনীয় সামাজিক অনুশাসন বা পরকালের অচ্ছেদ্য নির্দেশ বলে মানে নি। ফলে, মহিমের জীবিত কালেই সুরেশকে স্বামী হিসাবে ভাবা তার বৈপ্লবিক মনের পরিচয়। এই বিচারে সে অভয়া বা কিরণময়ীর চেয়ে অনেক বেশী আধুনিক চিন্তা ও চেতনার অধিকারিণী। ধর্ম ও পরকালের বিধান এবং ভয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সে ভেবেছেঃ "অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্যি হইয়া উঠিবার পথে কোন বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত, এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা একেবারেই অসম্ভব, এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। .. সেই মন এক স্বামীর জীবিত কালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভারে যতই কেন না পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম ও পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।"

কিন্তু অচলার এই অনুভূতি জীবনে স্থায়ী হয়নি। তার জীবনে অশুভ পরিণতির পশ্চাতে যে ঘটনাটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে, তা আপন জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা। অবশ্য একটি বিশেষ ক্ষণ বা মুহূর্তকে চিরন্তন ও শাশ্বত বলে ভাবা আধুনিকতার একটি দিক। ক্ষণকে চিরক্ষণ করে তোলা থেকে অচলাও মুক্তি পায় নি। সুরেশের প্রতি তার অনুরাগ এই বোধ থেকেই এসেছে

এবং তার কাছে নিজেকে একান্ত করে সমর্পণ করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই শাশ্বত বোধিচিন্তা তাকে ক্লান্ত করে মুক্তি পিপাসায় আগ্রহী করে তুলেছে। জীবনে যাওয়া-আসার দ্বারটিকে সে সমানভাবে খোলা রাখতে পারেনি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে শরৎচন্দ্র অচলার জীবনদ্বন্দ্বে প্রেম ও মনস্তত্ত্বের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে হৃদয়রহস্যের জটিল তন্তু বয়ন করা হয়েছে। অচলার প্রেম ও মনস্তত্ত্বের মুক্তিহীন সংগ্রামই 'গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান বস্তু। মহিমের অন্তর্মুখী ভালবাসা থেকে সে মুক্তি লাভের জন্য আগ্রহী ও বিদ্রোহিণী হয়েছিল, কিন্তু সুরেশের কাছে আত্ম-সমর্পণও তাকে শান্তি দেয় নি। সেখানেও সে সমানভাবে মুক্তি কামনা করেছে। ডিহিরির নতুন বাড়ীতে বর্ষণমুখর রাত্রের ঘটনা পরিস্থিতিতে অচলা উপায়হীন আত্মসমর্পণে আত্মবঞ্চনার গ্লানি গভীরভাবে অন্তরে অনুভব করেছে। হৃদয়হীন দেহদান তার চিত্তের অশুচিবোধের স্তরকে এতখানি ঘনীভূত করেছে যে, মনের সমস্ত বেদনা ও দুঃখ অশ্রুজলের বিরামহীন ধারা নিয়ে নেমে এসেছে। আপন ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে এই বিরোধী ভাবচিন্তার যে সংঘাত, তাতে আধুনিক মনোবেদনার করুণ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে। অচলা ও সুরেশ দেহমিলনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছে পরস্পরের মানসিক দূরত্ব এবং উভয়েই কামনা করেছে বিচ্ছেদ ও মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সুরেশের সঙ্গ অচলার মনে প্রবৃত্তি চরিতার্থতার কামনাবেগ ঘনীভূত করত, একে এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব ; কিন্তু একই কালে সেই উত্তেজনা প্রশমিত হলে মন ক্লান্তিতে ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত। একদিকে প্রবৃত্তির দুর্দম তাড়নাতে আত্মসমর্পণ ও অন্যদিকে মুক্তিলাভের তীব্র ব্যাকুলতা আধুনিক জীবনের সবচেয়ে করুণতম ট্র্যাজেডি। অচলা এই ট্র্যাজেডির শিকার হয়েছে এবং পীড়িত হয়েছে আধুনিক যুগের অনিবার্য জীবনযন্ত্রণা ও মুক্তি পিপাসায়।

কেবল অচলার নয়, সুরেশের জীবনের ট্র্যাজেডিও আধুনিক কালের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। অচলাকে লাভ করবার সমস্ত প্রয়াস তার পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রেমহীন জীবনের দায়ভাগ যে কতদূর অসহনীয়, সে উপলব্ধি করতে পেরেছে অচলার ভাবলেশহীন পাণ্ডুর শৈত্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে। শরৎচন্দ্র সুরেশের মনের বিয়োগান্তক পরিণতিটি তার নিজের কথাতেই বাণীবন্ধ করেছেন। সে অচলাকে বলেছে : "আজকাল আমি কি ভাবি জানো ? ···এতকাল যা ভেবে এসেছি ঠিক তার উল্টো। তখন ভাবতুম, কি করে তোমাকে পাবো ? এখন অহর্নিশ চিন্তা করি, কি উপায়ে তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার ভার যেন আমি আর বইতে পারিনে। ···মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা এমন অসহ্য ভারী, এ

স্বপ্নেও ভাবিনি।" সুরেশের যে যন্ত্রণা, অচলার যে অসহনীয় রোদনভরা ক্লান্তি—উভয়ই আধুনিক জীবনচিন্তার করুণতম রূপ। একের সঙ্গে অপরের কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের জীবনের শূন্যতা মরুভূমির ঊষরতার চেয়েও ভয়ংকর। সুরেশ মৃত্যুর মধ্যে চিত্ত অশান্তির জ্বালা জুড়িয়েছিল, কিন্তু অচলা মনের যন্ত্রণায় অদৃষ্টের পায়ে আত্মসমর্পণ করে কাতরভাবে প্রার্থনা করেছে: "হে ঈশ্বর! আমি অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা পাইয়াছি,·· আমার মা নাই, বাপ নাই, স্বামী নাই—এত বড় লজ্জা লইয়া কোথাও আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। · আর আমাকে বাঁচিতে দিয়ো না প্রভো! আমাকেও তোমার কাছে টানিয়া লও!" এই আত্ম-সমর্পণ আনন্দের নয়, কোন ঐশ্বরিক কামনায় আত্মবিলুপ্তি নয়। আধুনিক জীবনে প্রত্যক্ষবাদ ও ক্ষণবাদ যে কি ভীষণ মর্মান্তিক রূপে জীবনকে গ্রাস করে, সেই যন্ত্রণাই অচলার জীবনচিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। একই মানুষের চিত্তে দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত কি রকম করুণ হয়ে ওঠে, আধুনিকতার জীবন চিন্তা বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তবে সকল ব্যর্থতার মধ্যেও তিনি জীবনের দাবি ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সমর্থ হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) তর্কমূলক অথবা প্রশ্নপ্রধান উপন্যাস। লেখক এই রচনাতে হৃদয়বৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় প্রেম ও হৃদয়ের রহস্য বিশ্লেষণে তিনি এখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীল চেতনাকে নিরংকুশ প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন এবং ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ও আধুনিক যুক্তিবাদ, ক্ষণবাদী দর্শনচিন্তা এবং আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রশ্নগুলি আধুনিক মানুষের জীবন চিন্তা ও মতবাদের প্রকাশ্য বহিঃপ্রকাশ। মনে হয়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন ও সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রশ্ন মনের মধ্যে ভীড় করেছিল, তাকেই তিনি নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাতে মুক্তি দিয়েছেন। এ ছাড়াও আধুনিক সাহিত্যচিন্তা যে নতুন দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে, অর্থাৎ কাহিনীভাগ গৌণ হয়ে মনের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে প্রবণতা বেশী পাচ্ছে, তার দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার মহিলা সাহিত্যিক ও শিষ্যা রাধারাণী দেবীকে লেখেন: "অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত।"[৩৩] পরে দিলীপ কুমার রায়কেও এই চিন্তাদর্শের কথা ব্যক্ত করে আরও একটু যোগ করে বলেন: "খুব কোরবো, গর্জন করে নোঙরা কথাই লিখবো, এই মনোভাবটাই অতি আধুনিক-সাহিত্যের সেন্ট্রাল পিভট নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।"[৩৪]

'শেষ প্রশ্ন' আত্মপ্রকাশের আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যের আঙিনাতে আধুনিক সাহিত্যের রীতিপ্রকৃতি নিয়ে অনেক ঝড় উঠেছিল। এর সূত্রপাত অবশ্য 'সবুজ-পত্রের' কালে এবং 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি'র সময়ে কালবৈশাখীর তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। শরৎচন্দ্রও এই সময়ের ঝটিকাবিক্ষুব্ধ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন অতি আধুনিকদের 'দলের দলী।' কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ও চিন্তাদর্শে আপন চিন্তার স্বাতন্ত্র্য তিনি বজায় রেখেছিলেন। এখন 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে তাঁর আধুনিক সাহিত্যবিচিন্তার রূপটি উপলব্ধি করা যাক।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে প্রেম ও ভালবাসার চিত্র অঙ্কিত হলেও, ভালবাসার মূলে যে রূপ ও যৌবনের আকর্ষণ আছে, তাকে শরৎচন্দ্র জীবনধর্মী বাস্তবতায় অস্বীকার করতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি একবার বলেন ঃ "আজকাল অনেকেই লিখছে। কিন্তু তাদের অনেককেই লেখক বলা চলে না। তাদের লেখায় সংযম দেখা যায় না। যৌন সম্বন্ধ নিয়ে তারা এমন একটা গোলমাল করছে যে, তাদের লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য কিনা সন্দেহ। এ-সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাইরে থেকে আমদানি করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই, তাই পরের ধার করা জিনিস চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুলেছে। কেউ কিছু বললে, তারা জিদের বসে বলে,—'খুব করব, লিখব, বলব।' কিন্তু সেটা ঠিক নয়।"[৩৫]

শরৎচন্দ্র যেহেতু নিজেকে 'মনোবৈজ্ঞানিক' বলতেন, সে হেতু জীবন ও ভাল-বাসার অন্তর্দেশে যে সত্য সমাহিত হয়ে আছে, তাকে মেনে নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার বিশ্লেষণী আলোকে। মানসিক স্বরূপ বিশ্লিষ্টকরণে তাঁর কোন খুঁত-খুঁতে দুর্বল ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি যথার্থ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সতর্ক হয়ে অগ্রসর হয়েছেন, অনধিকারীর মতো এলোমেলো দিক্ পরিক্রমা করে পরিবেশকে ক্ষুব্ধ করে তোলেন নি। তিনি যুক্তি ও বিচারকে সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন ; সংযমের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নি। শরৎচন্দ্রের যৌবনবন্দনা ছিল তীব্র প্রাণশক্তির বিকাশ, শুধু যৌন সম্ভোগ নয় ; যদিও তিনি উগ্র যৌন সংযমকে নিন্দা করেছিলেন। এই নিন্দার পশ্চাতে ছিল জীবনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের নায়িকা কমল এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের মতাদর্শকে প্রচার করেছে ঃ "সমস্ত সংযমের মত যৌন-সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর এক-ধরনের অসংযম। ...আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে।"

আবার,

"সংযম…উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে। ও তো কোন বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংযম—শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর এক ধরনের অসংযম, এ-কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেন নি…এর আসল সত্তা তো বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূল্যে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।…রিপু বলে গাল দিলেই তো সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার—তাদের কোন্ সত্তাটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেচে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই তো দুঃখ জয় করা নয়? · শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।"

আধুনিক মানুষের জীবনদর্শনে ক্ষণবাদ ও গতিশীলতার প্রভাব দুর্নিবার। জীবনযাত্রার মূলতত্ত্ব এই দুটি বস্তুর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের কাছে প্রতিটি চঞ্চল মুহূর্তই শাশ্বত। চিরস্থায়ী বা অনাদি বলে যে কিছু আছে, সে বিষয়ে তার বিশ্বাস কম। গতিবেগের তীব্রতায় প্রতিটি ক্ষণ নতুন ভাব ও চিন্তাদর্শে উজ্জ্বল। আজকের বিশ্বাস ও সুন্দর কল্পনা, ক্ষণিক পরে মূল্যহীন ও পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। তাই আধুনিক কালের মানুষ কোন ক্ষণ বা মুহূর্তকে উপেক্ষা করতে চায় না; সে সৃজনীমূলক অভিব্যক্তিবাদের (Creative Evolution) পূজারী। নিত্য নতুন সৃষ্টি করাই গতিধর্মের বৈশিষ্ট্য। এই জগৎ জুড়ে সর্বদাই এক বিরাট পরিবর্তনের প্রবাহ চলেছে। কোন কিছুই চিরস্থায়ী বা নিত্য নয়। এই গতিই প্রাণশক্তি বা প্রাণপ্রবাহ। আধুনিক সাহিত্য বিচিন্তাতে এই তত্ত্বের অভিব্যক্তি দেখা যায়। ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ এই মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে বার্ণাড শ'-এর সাহিত্যদর্শনেও সৃজনীমূলক অভিব্যক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে এই গতিবাদের অভিব্যক্তি দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রও তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে অবিশ্রান্ত গতিকেই জীবনের প্রাণধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সৃজনীমূলক অভিব্যক্তিবাদে প্রাণপ্রবাহ নতুন নতুন সৃষ্টিধারায় নিজেকে সার্থক করে তুলতে চায় বলেই ক্ষণবাদের গুরুত্ব অধুনা কালের চিন্তাতে স্থান পেয়েছে। গতিশীলতাকে কোনমতেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; নব নব সৃষ্টির মধ্যে এর যে পরিণত রূপ, কোন পূর্ব নির্দিষ্ট চিন্তা বা অনুমানে তা ঘটে না; এবং পরিণতিতে যা ঘটে তার আবির্ভাব পূর্ব থেকে কোনক্রমেই অনুমান করা সম্ভব নয়। এই কারণে গতিবাদের যে পরিণতি তা বস্তুবাদ বা

জড়বাদের ঠিক বিপরীত। বস্তুবাদী বা জড়বাদীরা যেখানে স্থির অথবা নিশ্চল আদর্শে বিশ্বাসী, সেখানে গতিশীলধর্মে বিশ্বাসী জীবনবাদীরা মনে করেন যে, একই প্রাণপ্রবাহকে কেন্দ্র করে জড় জগৎ, জীব ও মন প্রভৃতির বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ প্রাণের গতিবেগই আসল চৈতন্য সত্তা, যেখানে সৃজন মুহূর্তগুলি প্রাণ ও প্রত্যয়ে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং ক্ষণকে অস্বীকার করে বস্তুবাদী অথবা জড়বাদী স্থবিরত্বকে শাশ্বত মনে করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। এই কারণেই 'শেষ প্রশ্নে'র নায়িকা কমল ক্ষণবাদকে জীবনের গতিপথে শাশ্বত বলে গ্রহণ করেছে, স্থায়ী প্রেমধর্মের বন্দনা ও নীতি আদর্শকে করেছে নিন্দা ও আপন জীবনধর্মের পথে কোন কারণেই কোন ঘটনাকে চিরন্তন বলে মনে করে নি। গতিশীল জীবনের চঞ্চল মুহূর্তগুলিকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে সে অজিতকে বলেছেঃ "সে যত অল্পই হোক, পরিণাম তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক তবুও যেন না তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেন না আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জাবোধ করে। ... সত্যি চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকারের পাওয়া।"

আবার, অজিত যখন কমলকে বলেছিল, "নারীর ভালবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহ ও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন করে। ... এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। ... কুহেলিকা যত বড় ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্যই ধ্রুব।" ক্ষণবাদিনী কমল জড়বাদী চিন্তার চিরন্তনত্ব অতিক্রম করে প্রকৃত ব্যাখ্যাটি বিবৃত করে বলেঃ "ওটা কবির উপমা ... যুক্তি নয়, সত্যও নয়। কোন্ আদিমকালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্যকে সে বার বার আবৃত করেচে এবং বাব বার আবৃত করবে। সূর্য ধ্রুব কি-না জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের সত্য নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে।"

অন্যত্র ক্ষণবাদের স্থায়ী রূপের কথা প্রকাশ করে কমল অজিতকে বলেছেঃ "আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্যি বলে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাদের কেউ নয় ...... কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় সে আত্মহত্যা করে মরে।" এই জন্য কমল শিবনাথের সঙ্গে তার বিবাহ

বন্ধনের দায়-দায়িত্বকে খুব কড়াকড়ি নিয়মের পথে বিচার করে নি। বিবাহবন্ধন প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের বন্ধন, সেখানে যদি কোন কারণে শিথিলতা দেখা যায়, তবে সমগ্র বাহ্যিক অনুষ্ঠান মূল্যহীন হয়ে ওঠে। তাই কমল আশুবাবুকে পরিষ্কার ভাবে বলেঃ "সংসারেও অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, তার বেশি নয়।" ইতিপূর্বে বিবাহের স্থায়িত্বের আলোচনাতে সে মনের কথা স্বচ্ছ যুক্তি বিচারে প্রকাশ করে বলেছেঃ "স্থায়িত্ব নিয়েই যাদের কারবার তারা এমনি করেই মূল্য ধার্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে পারেন নি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখৎ লিখে যে বন্ধন নেবে না তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে? ফুল যে বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শংকা নেই, আয়ু একটা বেলার নয় ও নিত্যকালের। ... মানুষে বোঝে না যে হৃদয়-বস্তুটা লোহার তৈরি নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম, এই তার সত্য। অথচ এ-কথা বলাও চলে না, স্বীকার করাও যায় না। ...তাই ত কেউ ভেবেই পেলে না শিবনাথকে কি করে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনের যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইল না। ... গাছের পাতা শুকিয়ে ঝড়ে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হ'লো মিথ্যে, আর বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হ'লো সত্য?" কমলের বিচারে নারী-পুরুষের প্রকৃষ্ট বন্ধন মনের মণিকোঠায়। সেখানে যদি কোন ফাঁক না থাকে তবে বাহ্যিক আচরণ ও বিবাহের নিয়মাবলীর কোন প্রয়োজন নেই। বাহ্যিক বন্ধনের নিয়মনীতিকে প্রধান করতে গেলে সংঘাত উপস্থিত হয়। তাই অজিতকে তৃতীয় স্বামী হিসেবে নির্বাচনের প্রাক্কালে তাকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে শুনিয়ে দিয়েছেঃ "ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র করে বাড়ি গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিশ্চিত অনুভাবনাতে কোনকিছুকে আবদ্ধ করতে গেলেই জীবনের গতিশীলতা রুদ্ধ হয়ে পড়ে ও প্রাণ পীড়িত হয়। জীবনধর্ম ও নীতিবাদে বিশ্বাসী কমল একনিষ্ঠ প্রেমের অভিব্যক্তিকে যুক্তি দিয়ে স্বীকার করতে পারে নি। সে ইতিহাসবন্দিত প্রেমিক সম্রাট সাজাহানের প্রেমের স্থাপত্য নিদর্শন তাজমহলের মধ্যে কোন প্রশংসা অথবা স্তুতির কারণ খুঁজে পায় নি। এই প্রসঙ্গে সে আশুবাবুকে বলেছেঃ "... তাঁর ত শুনেচি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশি হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ

প্রেম তাঁকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিল না। ... সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন ; তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে এমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র-লক্ষ মানুষ বধ করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এমনি চলে যেতো। এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান। এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট। ... কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেচি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।"

কমল মৃতদার আশুবাবুর পত্নীপ্রেমকেও সমর্থন করতে পারে নি। তার মতে মৃতা পত্নীর স্মৃতিতে তন্ময় হয়ে সংযমের নিষ্ঠা শুধুমাত্র আত্মপীড়ন ডেকে আনে, মনের অপমৃত্যু ঘটায়। অতীতের স্মৃতিচারিতায় জরাগ্রস্ত অবসাদভরে অবনত চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় ; সৃষ্টিশীল সত্তা কিংবা প্রাণপ্রবাহের নয়। পরিবর্তনের ক্ষমতাহীন শক্তিই এ রকম সংযমের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। অথচ এই অচল অনড় জড়বাদী ধর্মের প্রতি মানুষের কতই না শ্রদ্ধাবোধ ও আবেগবিহ্বলতা। কমলের উক্তি বিপ্লবাত্মক হলেও সৃজনীমূলক অভিব্যক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে আশুবাবুর একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমকে সমালোচনা করে বলেছে ঃ "নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানি নে। ...ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। ...বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুব জ্ঞানে জীবন-যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ভেবে পাইনে। ...'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে মর্যাদা পেয়ে পেয়ে এমনি স্ফীত হয়ে উঠেচে যে, তার আর স্থান কাল কারণ অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এও ... একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশী নয়···এক এক জন থাকে যারা বুড়ো মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। সেই বুড়ো শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ বিকৃত যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। ...কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দ-লোকের বিসর্জনের বাজনা এ-কথা সে জানতেও পারে না। ...মনের বার্ধক্য আমি তাকেই বলি আশুবাবু, যে মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না,...বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্বস্ব। তার আনন্দ,

তার বেদনা—সেই তার মূলধন।" কমল বিশ্বাস করত যে প্রাণের অন্যতম ধর্ম হচ্ছে গতিশীলতা। সে কোন জায়গায় স্থির থাকতে পারে না, যদি স্থির থাকে তবে সেই স্থিতিশীলতার অপর নাম মৃত্যু। কমল গতিশীলতাকে জীবনের মূল সত্য করেছিল বলে তার মনের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি। শিবনাথের সঙ্গে শৈব বিবাহের নিয়ম অনুসারে তার বিয়ে সংঘটিত হলে, বিবাহের রীতি প্রকরণ ও স্থায়িত্ব নিয়ে তার মনে কোন সংশয় জাগে নি। মনের ভাঙনকে বাঁচিয়ে রেখে অনুষ্ঠানের জোরে কেবল বিবাহকে সার্থক করে তোলার বিরুদ্ধে সে সর্বদা সজাগ ছিল। ক্ষণবাদী জীবনদর্শনে তার স্থির বিশ্বাস ছিল বলে কমল মনে করত মানুষের মন যেমন গতিশীল, তেমনি প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে; এবং এরই ফলে অভিরুচি বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী তার জীবনযাপন নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব নয়। হৃদয় ও মনের নিত্য গতিশীল তত্ত্বকে এবং প্রবৃত্তিকে বাঁধতে গেলে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই কমলের চিন্তার বৈশিষ্ট্য ছিল—"এই ক্ষণটুকু হোক···চিরকাল" এবং জীবনের যাওয়া-আসা "খোলা রবে দ্বার।" এ কারণেই শিবনাথের আচরণ তাকে দুঃখ দিলেও মনকে পীড়িত করেনি। আপন মনের অভিব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে সে বলেছে: "দুঃখ যে পাইনি তা বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের দেবার যা ছিল তিনি দিয়েচেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েচি—আনন্দের সেই ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্ত-দাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলিনি, শুকনো ঝরণার নীচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দু'হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালবাসার আয়ু যখন ফুরালো, তাকে শান্তমনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে তুলতে আমার প্রবৃত্তি হ'লো না।" কমলের এই উক্তি তার নির্মোহ বুদ্ধিবাদ ও সংস্কারমুক্ত চেতনারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কমল প্রথম থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী ছিল বলে শিবনাথের সামনেই বলতে পেরেছিল: "উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড় ধরে ওঁকে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখবো বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ?" রাজেনের কাছেও কমলের সেই এক কথা: "মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল।" এই সত্যনিষ্ঠ দ্বিধাহীন স্বীকৃতি কমলের প্রকৃত পরিচয়। সে বন্ধনমুক্ত, তাই কোন বন্ধনই তাকে বাঁধতে পারে না। কমল কারো অধীন নয়। তার কথায়: "কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।"

শরৎচন্দ্র কমলের মাধ্যমে আধুনিকতার ঐহিক সুখবাদতত্ত্ব প্রচার করেছেন। আত্মাবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে পরকালের আবেদন বা প্রভাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। জীবন উপভোগের মধ্যেই কল্যাণ, সত্য ও সুন্দরের অধিষ্ঠান। আধুনিকতার জীবনবেদে বিশ্বাসী কমল প্রাচীন সংস্কারকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে আশুবাবুকে বলেছে ঃ "আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারব না। আকাশ-কুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য থাকবে না। যে-জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ-বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহলোককে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। ...ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ করে দিয়েছে।"

দুঃখকে জীবনের পরম সম্পদ ও দুঃখানুভূতির অভিজ্ঞতাকে চরম সঞ্চয় বলে আধুনিক নারী মনে-প্রাণে বরণ করেছে। সংস্কারমুক্ত মন, মননশীলতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি, সংশয়, সন্দেহ এবং অস্বীকারের তীব্র প্রচেষ্টা সমস্ত কিছু একত্রযোগে বিষ্ণুকরধৃত সুদর্শন চক্রের নিষ্ঠুর রূপ নিয়ে সতীরূপে নারীমনের অখণ্ডতাকে অবিভাজ্য না রেখে দিকে দিকে খণ্ড খণ্ড বিশ্লিষ্ট করে ছড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিক নারীর মন ও দেহে তাই দেখা দিয়েছে বিচ্ছিন্ন রূপ এবং বহু চিন্তাদর্শের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এই সমস্ত বিভাজন চিন্তা থেকে যে কামনা অহরহ প্রতিধ্বনিত হয়, তা অখণ্ডতার করুণ অন্বেষণ। কিন্তু আধুনিক কালের বিচ্ছিন্নতাবাদ তাকে একত্রীভূত হতে দেয় না। দুঃখ ও মৃত অতীত সংস্কারের স্তূপ থেকে নতুন জীবনবোধ এবং মুক্তির পথ সৃষ্টি হবে, এই আশা লেখক শরৎচন্দ্র কমলের মুখে প্রকাশ করে বলেছেন ঃ "যে দুঃখকে ভয় করেচেন কাকাবাবু (আশুবাবু), তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে ; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের মুক্তির পথ।" জীবনের গতিবেগে এভাবেই মানুষের ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে তার ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে। মানুষের জীবনচিন্তার সর্বশেষ কথা বলা কখনও সম্ভব হবে না, অথচ ক্রমবিবর্তনের চক্রে তার অনুভূতি, চিন্তা ও বিশ্লেষণের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল পাল্টাবে বারবার। তাই মানুষ সম্বন্ধে সর্বশেষ কথা বলা কখনই সম্ভব নয়, "তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায় নি।"[৩৬] ফলে চিরন্তন সত্য বলে গ্রহণ করার কিছু নেই, কারণ তারও বিবর্তন আছে।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা বিতর্ক, প্রশ্ন ও প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ আছে, প্রশ্নের জটিলতায় দর্শনতত্ত্বের দুরূহ বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে, —কিন্তু পরিশেষে যে তত্ত্বটি প্রধান হয়েছে তা একটি নিশ্চিন্ত, নিভৃত হৃদয়ে প্রেম-অনুরাগে আস্থা স্থাপন করে গার্হস্থ্য জীবনপিপাসাকে চরিতার্থ করে তোলা। কমল পরিশেষে অজিতকে নিয়ে এই কামনাই করেছে, যদিও তাতে আত্মবিলুপ্তি ঘটেনি তবুও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্র বহিরাবরণে স্নেহ-প্রীতির পলিমাটি লাগিয়ে কোমল করবার প্রচেষ্টা আছে কমলের শেষ আশ্রয় খোঁজার মধ্যে। সে অজিতকে বলেছে: "জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো অত নিষ্ঠুর আমি নই। ...ভগবান ত মানিনে, নইলে প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।" কমলের মানসচারণায় মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের বিহারের মত আকাশও চাই, আবার নিভৃত, নিশ্চিন্ত গৃহ কোণটিও চিত্তপিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য প্রয়োজন। একদিকে আধুনিক চিন্তার উন্মার্গগামিতা ও অপরদিকে প্রাচীন সংস্কারাবদ্ধ জীবনের প্রতি আকর্ষণ—দুয়ের এক ভাবসামঞ্জস্য 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র করেছেন।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসেও একই নীতির অনুসরণ দেখি। প্রতীচ্য ভাবধারা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উচ্চ গর্বে প্রতিপালিতা বন্দনা অবশেষে জীবনের সুগভীর তত্ত্ব গার্হস্থ্য জীবনের সামগ্রিক সুখের মধ্যে উপলব্ধি করেছে। বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ীর রাধাগোবিন্দজীর সেবায় ও পরিবারের সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তুলসীতলায় মঙ্গল-প্রদীপ জ্বালার মধ্যেই সে আবিষ্কার করেছে জীবনের তাৎপর্য—শান্তি ও পরিতৃপ্তি। ঈশ্বর বিশ্বাস, ভাগ্যের প্রতি আস্থা ও পারিবারিক পরিবেশের ভিতরেই যেন বন্দনার ব্যক্তিত্ব রূপান্তরিত হয়েছে চির স্নিগ্ধ কল্যাণময়ী বধূতে। শরৎচন্দ্র যেন জীবন সমস্যার সকল সমাধান বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নয়, গার্হস্থ্য জীবনের সংগঠন শক্তিতে কামনা করেছিলেন। এইভাবে প্রাচীন ও নবীন দুই রীতির ভাবসম্মিলন শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে পূর্ণতা পেয়েছে।

আধুনিকতার ভাবদ্বন্দ্ব

(প্রথম পর্যায়)

বিংশ শতকের সূচনা কাল থেকে বাংলা কথাসাহিত্য ধারায় এক বিচিত্র ভাবদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। এই বিবাদের একদিকে ছিল প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' ও অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা। বিপিনচন্দ্র পাল, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নীতিবাদী রক্ষণশীল ব্যক্তিরা 'সবুজপত্রে'র আধুনিকতার বিরুদ্ধে সমালোচনায় হয়েছিলেন খড়্গপাণি। রবীন্দ্রনাথের 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি ছিল তাঁদের আক্রমণের বিষয়বস্তু, যদিও প্রমথ চৌধুরী রেহাই পাননি কোনদিক থেকে। প্রাচীন রক্ষণশীল সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ এনেছিলেন; আর প্রমথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য ছিল 'বীরবলী ভাষা' অর্থাৎ চলিত ভাষার সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহারের। চলিত ভাষার বিরুদ্ধে অভিযানে 'নারায়ণ' পত্রিকার শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধারী বিপিনচন্দ্র পাল, অপর প্রতিপক্ষ গাণ্ডীবী প্রমথ চৌধুরীর কাছে হেলায় পরাজিত হয়েছিলেন। প্রমথনাথের 'অ-সাধু' ভাষার খুঁত বার করতে গিয়ে তিনি 'হাতে-নাতে' ধরা পড়লেন।[১] 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের অপর বিরোধী সমালোচক ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সিংহ। আধুনিক চলিত ভাষা রীতির প্রবর্তনার বিরুদ্ধে তিনি আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ১৩২২ ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় তাঁর দুটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। একটি 'ভাষার কথা' ও অপরটি 'একটি মোকদ্দমার রায়'। মোকদ্দমার বিষয়সূচী ছিল—চলিত ভাষা বনাম সাধু ভাষা। বাদী পক্ষে—মিঃ পি. চৌধুরী, বার-এট-ল, তরফ সবুজপত্র ভারতী এণ্ড কোং। প্রতিবাদী পক্ষে—মিঃ সি. আর দাশ, বার-এট-ল তরফ নারায়ণ ঢাকা রিভিউ এণ্ড কোং। সমগ্র রচনাটির বিচারক শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল্পনিক রায়। লেখক যতীন্দ্রমোহন রিপোর্টার।

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' আষাঢ় সংখ্যা ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন সিংহের বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন। অপর সমালোচক নলিনীকান্ত গুপ্ত 'চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা' (নারায়ণ, ১৩২৩, অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা রীতির বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করেন। এই বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় বীরবল 'সাহিত্যের ভাষা' প্রবন্ধে নলিনীকান্তের বক্তব্যের ভুল-ত্রুটি প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়ে সফল হয়েছিলেন। পরে অবশ্য 'সবুজপত্রে'র চৈত্র

সংখ্যায় (১৩২৩) রবীন্দ্রনাথের 'ভাষার কথা' আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'একটি মোকদ্দমার রায়' রবীন্দ্রনাথের আলোচনার বিরুদ্ধে সমালোচনা—প্রসঙ্গতঃ এ কথাটিও জানা দরকার।

বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' (সবুজপত্র, ১৩২১ ; শ্রাবণ) গল্পের সমালোচনা করে 'মৃণালের কথা' (নারায়ণ, ১৩২১) প্যারডি লেখেন। নারীর আপন অধিকার দাবি, সংস্কারমুক্ত মন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যে অভিযান শুরু করেছিলেন, তাতে বিপিনচন্দ্রের রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদী মনোভাব আহত হয়েছিল বিশেষভাবে। বাঙালীর পারিবারিক জীবনচত্বরে এই নব্য চিন্তার ঢেউ এসে লাগতে পারে আশঙ্কায় তিনি সম্ভবতঃ আতঙ্কিত হয়েছিলেন। সর্ব সংস্কারমুক্ত নারী জাগৃতিকে তিনি বাঙালীর সামাজিক জীবনে এক অশুভ শক্তির বন্দনা বলে মনে করেছিলেন। তাই গৃহত্যাগী মৃণালকে সংস্কারাভিমুখী করাই ছিল তার 'মৃণালের কথা' পত্রাকারে লেখা কাহিনীর মূল কথা। অর্থাৎ 'স্ত্রীর পত্র' ছোট গল্পের যেখানে শেষ, 'মৃণালের কথা' সেখানে শুরু। বিপিনচন্দ্র পাল নতুন কাল তরঙ্গ গণনা করতে পারেন নি বলে ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে অতীতকে ধরে রাখতে বৃথা প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর নীতিঋদ্ধ সংস্কারবাদী অতীতচারী মনের পরিচয় 'মৃণালের কথা' গল্পের উপসংহারে মৃণালের আত্মসমর্পণের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে ঃ "তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেই তো তোমাকে এত অযত্ন, এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছি। …আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি। …এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝলাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয়। …যে আপনাকে বড় করে, সে-ই ছোট হয়ে যায়। …আমি তোমার সঙ্গে টককর দিয়ে তোমার সমান হতে গিয়ে তোমাকেও ধরতে পাল্লাম না, নিজেকেও রাখতে পাল্লাম না। আজ এই কলঙ্কের কালি মেখে, তোমার চরণের ধূলি হয়ে, তোমাকেও ধরেছি, নিজেকেও পেয়েছি।"

বিপিনচন্দ্র পাল কোনদিনই সামাজিক কল্যাণ চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সমাজ নিরপেক্ষ মতবাদকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশকে তিনি সর্বদা অ-কল্যাণকর আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখতেন। নারী কেবল "প্রজনার্থং মহাভাগা" ছাড়া অন্য কিছুই নয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

বিপিনচন্দ্রের অপর মন্ত্রশিষ্য গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪) ছোটগল্পের ব্যঙ্গ অনুকৃতি করলেন 'দোসরা নম্বর' লিখে 'নারায়ণ' পত্রিকার (শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩২৪) পাতাতে। 'দোসরা নম্বর'

গল্পের নায়িকা অনিলার যে চিঠি গৃহত্যাগের কারণ হিসাবে স্বামীকে লেখা, তাতে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের দুর্বল ও বিকৃত ছায়াপাত ঘটেছে। স্বামীকে অনিলা লিখেছেঃ "তুমি ক্লাব নিয়ে বাইরের বৈঠকখানায় পড়ে থাকতে আর ভাবতে বুঝি আমি তোমাদের জন্য দিনরাত রান্নাঘরে বসে মাছের কচুরি ও আমড়ার চাটনিই তৈরী কচ্ছি। নাগো না, ঐ রান্নাঘরের বদ্ধ ধোঁয়াটে কারাগারের ছোট্ট জানালাটির ভিতর দিয়েই একদিন হঠাৎ আমি বাইরের পৃথিবীটাকে দেখে ফেলেছিলাম।...সে দিন 'তালপত্র' মাসিক কাগজের একটা গল্পেই আমি আমার এই নতুন অনুভূতির একটা সাড়াও পেয়েছিলাম।"

১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ও 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর বিরোধী সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নব্যরীতি গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আক্রমণ করেছিলেন। এই অধিবেশনের মূল ও সাহিত্যশাখার সভাপতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের যাবতীয় রচনাকে চটুল, ক্ষীণকায়, লঘু ও অস্থায়ী বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেনঃ "এখন মনে হয় যেন, বেশীদিন ভাবিয়া, বেশী দিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব—সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু'চারটা গান লিখিয়া চট্‌ করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুট্‌কীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী। উহাদের কবি আছে—চিরকালই থাকে, আমাদের দেশেও আছে। চুট্‌কীতে সময় সময় মুগ্ধও করে, কিন্তু চুট্‌কীই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না?...রবিবাবু 'নোবেল প্রাইজ' পাইলেন, বাঙ্গালা ভাষার জয়-জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে?"[২]

চিত্তরঞ্জন দাশ 'নারায়ণ' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে অ-বাস্তবতার অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা—যেমন 'শিশু'র জন্মকথা—শুধু অস্বাভাবিক নয়, বিজাতীয় প্রেরণার পরিচায়ক। এসব কবিতাতে বুদ্ধির চাতুর্য আছে, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতির কবিতায় যে বাঙালীসুলভ মধুর রস বা বাৎসল্য রসের পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তার ঠাঁই নেই। দেশভেদে যেমন চেহারার পার্থক্য থাকে, তেমনি কবিতারও পার্থক্য আছে—এবং এটাই চিরন্তন।

তৎকালে অপর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক ও সুপণ্ডিত নবীন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুপ্রাণিত সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শকে সমর্থন

করতে পারেন নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'বাস্তবতা' অভাবের অভিযোগ আনেন। 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব'[৩] প্রবন্ধের জবাবে তিনি ঐ পত্রিকাতেই 'সাহিত্যে বাস্তবতা'[৪] নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা ছিল, কবিতার ভিত্তি যে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতায় তা নয়, —এ দেশ-কাল অনালিঙ্গিত নয়, অর্থাৎ কোন দেশে কোন সময়ে সমাজের যে অবস্থা থাকে, সেখানে যে চিন্তা সমাজ মনকে দোলা দেয়, তার উপরেই ভিত্তি করে কবি সমাজের কাছে নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করেন। সাহিত্যিক নিশ্চয়ই আদর্শবাদী এবং এই আদর্শবাদ জাতির ধর্ম ও যুগের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকবে। এটাই বাস্তবতা বা 'রিয়ালিজম্'। এর নিদর্শন পাওয়া যায় বার্ণাড শ-য়ের নাটকে, রবীন্দ্রকাব্যে এর সন্ধান মেলে না। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দেশধর্ম ও কালধর্মের প্রতি অনুরক্তি দাবি করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী, রাধাকমলবাবুর আলোচনার সমালোচনা করেছিলেন 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি'[৫] প্রবন্ধে। সাহিত্যে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকমল লিখেছিলেন: "মৃণাল না থাকিলে লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য কি করিয়া ফুটিবে?

জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব। সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয়রস হইতে তাহার রস সঞ্চার হয়। এই রস সঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ।

একটা গোলাপ গাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে রস সঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া, এক কথায় বাস্তবকে না মানিয়া, সে লিলি ফুল ফুটাইবে—তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টাও সেইরূপ ব্যর্থ হয়।"

প্রমথ চৌধুরী এই বিশ্লেষণী চিন্তার সমালোচনা করে লেখেন: "মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মের ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকবে না। তবে মৃণাল যদি বাস্তব হয়, পদ্ম যে কেন তা নয়, তা বোঝা গেল না।...গাছের ফুল আকাশে ফোটে কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ, সে কথা আমরা সকলেই জানি; সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মনোজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তি-বিশেষের মনে নিহিত নয়, সমাজের মনে নিহিত, এ হচ্ছে নূতন মত। এই মত

গ্রাহ্য করার প্রধান অন্তরায় এই যে, সামাজিক মন বলে কোন বস্তু নেই ; ও পদার্থ হচ্ছে ইংরেজিতে থাকে বলে অ্যাব্‌সট্র্যাক্‌শন।”

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় উক্ত প্রবন্ধে আরও লেখেন : “সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।” এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন : “যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার কারণ, প্রথমত, যুগধর্ম বলে কোনো যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পরবিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মন-পদার্থটি কোনো বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক অংশে কালের অধীন, অপর অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য ধর্ম আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা।…

নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তা হলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য।…আমাদের দেশে যাঁরা বস্তুতন্ত্রতার ধুয়ো ধরেছেন, তাঁরা যে ইউরোপের…রিয়ালিজমের চর্বিত চর্বণ রোমন্থন করেছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমি অয়কেনের…একটি কথা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি—

‘All spiritual creation possesses a superiority as compared with the age and liberates man from its compulsion, nay, it wages an unceasing struggle against all that belongs to the things of mere time.’

যথার্থ কবির নিকট এ সত্য প্রত্যক্ষ ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের চোখরাঙানি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।”

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে ‘নব নাগরিক সাহিত্য’ প্রবন্ধে আধুনিকতাকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী অনুকারী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন প্রাণসঞ্চার করতে পারেনি, শুধু লেখক ও পাঠকের মধ্যে দূরত্ব ঘোষণা করেছে পরম স্পর্ধাভরে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন : “‥গল্পে, উপন্যাসে, নাটক-নভেলে আমরা শুধু নূতন লইয়া খেলা করিতেছি মাত্র আমরা এখনও ইউরোপীয়নবিশির আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমরা এখনও অ্যানা কারেনিনার (Anna Karenina-র) মোহে “চোখের বালিতে” দেশের মনের সম্পূর্ণ বিরোধী নায়ক-নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃংখলতার চিত্র আঁকিতেছি, “স্ত্রীর পত্রে” ও “নারীর মূল্যে” ইবসেন (Ibsen)-এর মত প্রচার করিতেছি। আলফন্‌সো ডডে (Alphonse

Daudet) ও গিডে মোঁপাসা (Guy de Maupassant) বর্তমান নব্য সাহিত্যিক-দলের গুরু হইয়াছেন।

ইঁহারা ভাবিতেছেন, ইহারা যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন তাহা আসল, সত্য ও সুন্দর, তাহাতে সমাজের মিথ্যা আচার-ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, সমাজের কদর্য অনুশাসন সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধ করে না। সেখানকার জীবন একেবারে স্বাধীন, বাধাবন্ধনহীন, নিত্য-সরস, নবীন, সবুজ।...সাহিত্যে abstractions বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনা লইয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের "গোরা"। প্রত্যেক চরিত্র সেখানে মানুষ নহে, একটা ভাবের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তাহাদের ভাব ও বক্তৃতার বিশ্লেষণের ধূমে মানুষগুলো ছায়াময় হইয়া গিয়াছে। এই 'গোরা'ই হইতেছে নব-নাগরিক-সাহিত্যের কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।"[৬]

রাধাকমলের এই সাহিত্যপ্রসঙ্গ সমালোচনা কালে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। তাই তাঁর আক্রমণ 'গোরা'কে কেন্দ্র করেই বিঘোষিত হয়েছিল। সমালোচক রাধাকমল ছিলেন রক্ষণশীল মতবাদের সমর্থক। আধুনিক কথাসাহিত্যে যে জীবনচিত্র অঙ্কিত হতে শুরু করেছিল, তা ছিল তাঁর মতে অলীক কল্পনা, যার সঙ্গে প্রকৃত জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাকৃত জনপুঞ্জের আনাগোনা, তাদের জীবন-চিত্রলিপির অনুলেখন দেখতে চেয়েছিলেন। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক জীবনচেতনা বাংলা কথাসাহিত্যে জীবনবৃন্তে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত পল্লবিত হয়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর সকল ভাবনার অন্যতম ভাবনা। রাধাকমল দেখেছিলেন যে বাঙালীর আধুনিক সাহিত্য আভিজাত্য দোষদুষ্ট হয়ে, টবে সাজানো মৌসুমী ফুলের মত বাহার সৃষ্টি করতেই আগ্রহী, জাতীয় জীবনের প্রাণরস তাতে সিঞ্চন করা হয় নি। ফলে এই সাহিত্যের মূল্য কি! 'সবুজপত্র' বর্জিত সাহিত্য অভিজাত-গ্লানি পুষ্ট এবং তা জাতীয় জীবনের পরিপন্থী। তবে তাঁর মতেঃ "লোকসাধারণের, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জনসমাজের হৃদয়ে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সাধনা আপনাদের গৌরব অটুট রাখিয়াছে।...গরুচরা মাঠে, ছায়াঢাকা খেয়াঘাটে, বনে-ঘেরা কুটিরে, নিত্য-নূতন রসের রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে।...আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, এই আসল জীবনকে অবলম্বন করিয়া।"[৭] রাধাকমলের মতে জীবনের বহিরঙ্গ কর্ম-জগতের ক্ষেত্রে, যেমন স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে, ধনী ব্যক্তিদের ড্রইংরুমে অথবা বৈঠকখানায় কিংবা কোলাহল মুখরিত ক্লাবঘরে, যে জীবনের পরিচয় পাই, তাতে নকলের কৃত্রিম জৌলুষটি লক্ষ্য করা যায়, প্রকৃত জীবনস্পন্দনটি থাকে গভীর অনুভূতির তলদেশে।

প্রমথ চৌধুরী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের মাধ্যমে। এখানে তিনি লিখেছিলেন: "সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।"[৮] রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন রক্ষণশীল ভাবধারার যে কণ্ডুয়ন ও নীতিবাদী আদর্শের প্রতি মোহ-বিলাস, তাকে সাহিত্যধারার প্রাণসঞ্চারী ক্রিয়া বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন: "আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কি হত ... কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করচিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে। কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তাহলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না। ...বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে ত বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফলে হয়েছে এই যে, যে বাংলা ভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না, এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করবে ও গৌরব করবে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব, গদ্যে-পদ্যে সব জায়গাতেই সাহিত্যের চাল-চলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাঁকে জাতিচ্যুত বলে নিন্দা করেন, ব্যবহার করবার বেলা তাকে বর্জন করতে পারেন না।"[৯] প্রাচীন ও রক্ষণশীল পন্থীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলেন সমাজশাসনের ও নীতিশিক্ষার অন্যতম উপায়রূপে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাদর্শের অধিবাসী। তাঁর কাছে সাহিত্য বিচিন্তা ছিল কোন সংগৃহীত আদর্শের অথবা জ্ঞানের পসরা নয়—জীবনমননের ফসল ফলানো। তাই তাঁর কাছে সাহিত্য সাধনা ছিল কর্মের, চিন্তার এবং আনন্দের—এক কথায় সব সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা—জীবন সাধনা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রাচীন রক্ষণশীল নীতিবাদী সম্প্রদায় উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি। তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে বস্তুতান্ত্রিকতার অভাবের অভিযোগ আনেন। এর সঙ্গে আরও দুটি বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছিল। প্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য 'মায়িক' ও দ্বিতীয় 'কল্পনাসর্বস্ব'। অবশ্য বস্তুতন্ত্রের অভাব ও কল্পনাসর্বস্বতা দুই-ই এক বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ। রবীন্দ্রবিরোধীদের অন্যতম

নেতা বিপিনচন্দ্র পাল 'নারায়ণ' পত্রিকা ছাড়াও অনেক আগে থেকেই অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা শুরু করেছিলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই দুটি প্রধান অভিযোগ এনেছিলেন। যদিও মাঝে মাঝে বিপিনচন্দ্র পালের রবীন্দ্রসাহিত্য অনুরক্তি ঘন বিরূপতার কৃষ্ণ মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুল্লতার মতো চমকে চমকে উঠেছে। আমরা আলোচনার মূল সুরটি প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের প্রধান প্রধান অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে গ্রহণ করব।

"রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্মুখিনতা নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির বা subjective individualism-এর রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈতৃক ও সাম্প্রদায়িক। যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্মুখিনতাকে বস্তু সংস্পর্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজ একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন। ...ইহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই ; জনসাধারণের জীবনের অন্তঃপুরেও ইহাদের কোনো প্রবেশ পথ নাই।...

রবীন্দ্রনাথ এই ধনী সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। ...রবীন্দ্র-নাথের উদার প্রাণ এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক মুক্ত ভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশব এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়াছে। ...স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরে রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। ...তাঁর পৈতৃক জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত ছিল এবং এই উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহে ও অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে বাংলার পল্লীজীবন পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্য যোগনিবন্ধন যে জীবনের সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না। বড় বড় জমিদারীর 'বাবুদের' সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রমুক্ত মেশামেশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য। ...কিন্তু এ সকল চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতাই প্রকাশিত হয়, সে

সকল চেষ্টার সফলতা প্রমাণ হয় না। ...রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আধুনিক অভিজাত সমাজে জন্মিয়া তাহার অংকে, তাহার দোষগুণের ভাগী হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন। এই সমাজে এই ব্যবধানটা চিরদিন আছে। কলিকাতার বড় বড় জমিদারের জমিদারিতে এ ব্যবধানটা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ...আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্য সাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাংলার পল্লীজীবন ও বাঙ্গালীর সাচ্চা প্রাণটা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি এইরূপ মায়িক। ঊর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্যে যেমন, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও তেমন অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দু-চারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেবল রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গের বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেখানে তাঁর চিত্রগুলি অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে 'গোরা'র হারাণবাবুটি অপূর্ব বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি মায়িক। আর যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশি, সেইরূপ তাঁর সমাজ সংস্কারের প্রয়াস ও ধর্মের শিক্ষাও বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহার উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মায়ার সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনি মিলাইয়া গিয়াছে। আশৈশব রবীন্দ্রনাথের ধর্মের রচনায় ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বাদেশিকতা কেবল শৈশবে নয়, আজি পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল বিশ্বমানব কল্পনা করিতেছেন—তাহারও প্রতিষ্ঠা তাঁহার অলৌকিক কবি প্রতিভার অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তিতে।

আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই। ...রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই নিত্য অতৃপ্ত ভাবের সঞ্চার করে। ... রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্বদা মিষ্টি লাগে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিবোধ জাগিয়া উঠে। ইহাও মায়ার ধর্ম।"[১০]

বিপিনচন্দ্র পালের এই প্রবন্ধের উত্তরে অজিত কুমার চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন ?' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন : "সাহিত্য রচয়িতার জীবনের ভালোমন্দের সহিত তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির একান্ত সম্বন্ধ নাই।"[১১] বিপিনচন্দ্র পাল এই মতাদর্শে একমত হতে পারেন নি। তিনি প্রত্যুত্তরে 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' প্রবন্ধে লিখলেন : "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হইতেই সাহিত্য সৃষ্টিতে বস্তুতন্ত্রহীনতার উৎপত্তি হয়। ...বস্তুতন্ত্র রসবস্তুকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া থাকে, বস্তুতন্ত্রতাহীন রসবস্তুকে আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ মানস কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। ...সাহিত্যিকের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিয়া কোথাও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মর্ম ও মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির আলোচনা করিতে যাইয়া, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার অভিধানের সাহায্যে এগুলির অর্থ ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি। ...প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, অধিকার ভেদে ভাল-মন্দের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ও একই ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার ধরিয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে রমণী মুখ দর্শন কেন, স্ত্রীলোকের ছায়াস্পর্শ পর্যন্ত অপরাধের কথা। কিন্তু যে চিত্রকর বা ভাস্কর চিত্রপটে বা মর্মর প্রস্তরখণ্ডে রমণীরূপের অশরীরী মূর্তিটি ফুটাইয়া তুলিয়া, তাহার ভিতর দিয়া মনুষ্য সমাজে সুন্দরের সংবাদ প্রচার করিবেন, তাঁর পক্ষে জীবন্ত রূপসীকে সম্মুখে রাখিয়া, তার মুখ ধ্যান করিতে করিতে, সে রূপে তন্ময় হইবার জন্য সর্ব প্রকারের সাধন অবলম্বন না করা অধর্ম। ...কবির পক্ষে আপনার কবিকৃতির পরম পরিণতি ও চরম চরিতার্থ লাভই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। কোনও কাব্যসৃষ্টি এই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে কি না করিয়াছে, ইহারই দ্বারা তাহার ভালমন্দের বিচার করিতে হইবে। এই কষ্টিপাথরেই আমিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দশ-আজ্ঞার ফুট-ফিতা ফেলিয়া তাঁর জীবনের ভাল-মন্দের কালি কষিতে যাই নাই।"[১২]

সমকালে বাংলা কথাসাহিত্যে ভাব ও ভাষা নিয়ে নবীনে-প্রবীণে যে ভাবদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, সেই কোলাহলের বিষবাষ্প রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করে—যদিও তিনি এই সমস্ত লড়াই থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে ভালবাসতেন। 'মৃণালের কথা', 'ভাষার কথা', 'একটি মোকদ্দমার রায়' ও 'দোসরা নম্বর' প্রভৃতি বিতর্ক সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ ও প্যারডি গল্পগুলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে থাকে নি। এই সময় তিনি প্রমথ চৌধুরীকে মনের আক্ষেপ প্রকাশ করে কয়েকটি চিঠি লেখেন। একটিতে তিনি লিখেছিলেন : "এতদিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, এদেশে সম্ভবতঃ সাহিত্যরসজ্ঞ অনেক আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কেউ সাহিত্যিক নয়

—যেমন ময়রার মুখে সন্দেশ রোচে না, তেমনি আমাদের সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের কারবার করে কিন্তু সাহিত্য ভালোবাসে না—সে শক্তি তাদের নেই। আমি তাই ওদিকে একেবারেই কান দিই নে—কানটা যদি ঢেউকে খাতির করে তাহলে ত' নৌকাডুবি। সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যত দৃঢ় হতে থাকবে, ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশী পড়বে—যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই যে, তাদের মাথার উপর দিয়ে অনেক তুফান চলে যায়। আমি দেখেছি, যত রাজ্যের বাজে লোকের কথায় তোমাকে উত্তেজিত করে—তুমি বাজে লোককে 'নাই' দিয়ে থাক—তার কারণ তুমি তাদের দুর্বাক্যকে এখনো ভয় করো।"[১৩]

অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জাতীয় মনোভাবের প্রকৃত সত্য মূল্য বিচার করে প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: "আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি—যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেছে সেই 'আমার জন্মভূমি'তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয় নোটবই থেকে। এইরকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়—এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, ডসটেভস্কি, বার্ণাড শ কোট কর তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্ তার কাটতি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্ছে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর—এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চলবে না।"[১৪]

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের রবীন্দ্রবিরোধিতার চিত্র বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার সেন অনবদ্য বিশ্লেষণে এক কলমচিত্রে এঁকেছেন। তাঁর কথায়: "রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগে একটু জোর লাগিল বিশেষ করিয়া দুইটি রচনায়, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে এবং 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। স্ত্রীর-পত্রের প্যারডি 'মৃণালের কথা' বাহির হইল নারায়ণের প্রথম সংখ্যায়। আর ঘরে-বাইরের বিষয় ও ভাব যে নিতান্ত দুর্নীতিপূর্ণ সে বিষয়ে প্রতিপক্ষেরা একমত এবং সরবে একতান। সন্দীপের মুখে সীতার বিরুদ্ধে গ্লানিকর মন্তব্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সংস্কৃতির মর্মে শূলে বিঁধিয়াছেন এবং বিমলা-ভূমিকার দ্বারা বর্তমান-হিন্দু-সমাজের ভিত্তিতে বোমা ফাটাইয়াছেন—এই অপরাধে 'সাহিত্যিক' ও 'চিন্তাশীল' সমাজের আশাস্থলেরা কেহ কেহ ব্যবস্থা দিলেন লেখনীর সাহায্যে সম্ভবপর না হইলে গুণ্ডার সাহায্যে 'কালা পাহাড়' রবীন্দ্রনাথকে শায়েস্তা করিতে হইবে, তাঁহার

সাহিত্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু নিঃসার প্রগল্‌ভতা নীরব হইতে বিলম্ব হইল না। তবে বিরুদ্ধবাদীরা বিনা যুদ্ধে—যদিও সে যুদ্ধ অসম—ক্ষান্ত হইলেন না। সনাতন শাস্ত্রের ও চিরন্তন সমাজের দোহাই ছাড়িয়া দিয়া ইঁহারা পাশ্চাত্য বিদ্যার অস্ত্র খুঁজিলেন।”[১৫]

'নারায়ণ' পত্রিকার বহু পূর্বে 'সাহিত্য' পত্রিকা রক্ষণশীল ভাবধারায় যে রবীন্দ্রবিরোধিতা করেছিল, পত্রিকা সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদকীয় মানসচিন্তা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তা নিহিত আছে। তাঁর সাহিত্যবিচিন্তার মধ্যে এই বোধ কিভাবে কোন গল্পে প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিচয় আমরা নিয়েছি ইতোমধ্যে। সেই সঙ্গে একই তালে-লয়ে সুর মিলিয়ে আধুনিকতার বিরুদ্ধে দোহারের মতো উচ্চ গ্রামে কণ্ঠ তুলেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও যতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বাংলা সাহিত্যে অ-রুচিকর চিন্তা ও নীতিবিগর্হিত ভাবনা দূর করতে ব্রতী হয়েছিল 'সাহিত্য' পত্রিকা। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯১ খৃঃ) আত্মপ্রকাশের ব্রাহ্ম মুহূর্তে এই সাময়িকীটি যেন পরশুরামের কুঠার হাতে নিয়ে যা কিছু সমাজ-সংস্কার ও শাস্ত্রীয়রীতি বহির্ভূত, ন্যায়-নীতি পরিপন্থী—তাকে ছেদন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছিলেনঃ "সাহিত্য পূতিগন্ধে পূর্ণ হইলে উগ্র বিশোধকের প্রয়োগ আবশ্যক। এই যে ত্রাহি মধুসূদন ধ্বনি, ইহাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের মঙ্গলের আশা করি। এই সার্থক 'সম্মার্জন বৃত্তি' অমর হইয়া থাক, নতুবা দিনকতক পরে প্রেসম্যান, দপ্তরী, জমাদার পাইব না,—সকলেই ডারুইন-প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের নিয়মে ক্রমে লেখক,—এমন কি, ঘোরতর প্রতাপশালী সম্পাদক হইয়া উঠিবে।”[১৬]

আমরা আগেই দেখেছি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী হিন্দু ভাবধারার মানুষ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচির সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শকে সাহিত্য সমালোচনা ও রচনাশৈলীর মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টি বিচিন্তা ও সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিভাবনাকে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্যের শেষ কথা হবে হিতবাদিতা—যা সমাজের পক্ষে অবশ্যই কল্যাণকর ও মঙ্গলবাণী বলে বিদিত ও পরিগণিত। সুরেশচন্দ্র হয়ত আধুনিক কালের পদধ্বনি শুনেও উপেক্ষা করেছিলেন কিংবা অকারণ জিদ্‌ ও অনমনীয় দৃঢ়তায় ঘুণে ধরা সামাজিক কাঠামোর গায়ে নীতিবাদ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের চড়া পালিশ চড়িয়ে অক্ষয় মহিমা দিতে ব্রতী হয়েছিলেন।

সুরেশচন্দ্রের প্রচণ্ড হিন্দুয়ানী মনোভাব রবীন্দ্রবিরোধিতার অন্যতম কারণ ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি যে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেন নি, এমন নয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর মতো অনেক আগেই বুঝেছিলেন যে নবযুগে বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের পথে অগ্রসর হবে ও প্রতিষ্ঠিত হবে। 'নব্য ভারত' পত্রিকায় (বৈশাখ সংখ্যা, ১৩০১) 'ত্রয়োদশ শতাব্দী' নামে একটি প্রবন্ধে আধুনিককাল পর্যন্ত বিশ্লেষিত বিভিন্ন কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকায় তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেনঃ "নব্য ভারত সম্পাদক 'ত্রয়োদশ শতাব্দী' প্রবন্ধে দাশু রায় পর্যন্ত অনেক নাম করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান যুগের গৌরব, গীতিকবিদের শিরোমণি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করেন নাই। ইহার কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি? নবযুগের বাংলা সাহিত্য হইতে যিনি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভা বাদ দেন,—আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি—'তাঁহার জন্য দাশু রায়ের পাঁচালী ব্যবস্থা',—বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার একবিন্দুও নাই।"[১৭] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের বিরোধ ছিল সাহিত্যাদর্শের মত পার্থক্যের বেদীতে। তাঁর অসহনীয় মত ও বিদ্রূপ সর্বদা জ্যা-মুক্ত তীরের মতো নিক্ষিপ্ত হতো রবীন্দ্রানুরাগীবৃন্দের উপর। তাঁদের উদ্দেশ্যে নির্মম আঘাত করে তিনি রবীন্দ্রবন্দনা করে লিখেছিলেনঃ "হে ভগবান্! রবীন্দ্রনাথ নব-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবঃ—তুমি তাঁহাকে এই চারু-সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জলা খোসামুদি ও নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।"[১৮]

এ সত্ত্বেও সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে কখনো রবীন্দ্রপ্রেমিক বলা চলে না। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্য-গল্প ও প্রবন্ধের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু যেখানে মতাদর্শের পার্থক্য বা বৈপরীত্য ঘটেছে, সেখানে তিনি হয়েছেন খড়্গপাণি। তাঁর আক্রমণ ছিল আক্রোশে ভরা এবং কটু ও গ্রাম্যতাদুষ্ট। সুরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এনেছিলেন। 'শাস্তি' নামক ছোটগল্প সম্বন্ধে তিনি লেখেনঃ "লেখক গল্পটি লিখিয়া কাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি পাঠককে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে।"[১৯] রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে সমাজপতির বক্তব্য ছিলঃ "বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে গ্রীক।"[২০] 'গোরা' উপন্যাসকে তিনি তর্কের খনি বলে অভিহিত করেছিলেন—কারণ তাঁর মতে, এই কথাসাহিত্যে আখ্যানভাগ খুবই অল্প।[২১] সুরেশচন্দ্রের রক্ষণশীল মন ও প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদ সাহিত্যবিচার ও বিশ্লেষণে সর্বদা একটি নীতিকে পরিপোষকতা করত বলে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা ও সাহিত্যবোধকে

তিনি অবোধ্য বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি।[২২] রবীন্দ্রনাথের অপর দুই আধুনিক সাহিত্যচিন্তার প্রতিফলন লিপি 'চোখের বালি' ও 'ঘরে-বাইরে' সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি খুব একটা বড়ো ধারণা পোষণ করেন নি।*

'সাধনা', 'সবুজপত্র' ও 'প্রবাসী' পত্রিকাতে রবীন্দ্রভক্ত আধুনিক চিন্তাবিদগণ যখন সাহিত্যধর্ম ও নীতিতে নব বৈচিত্র্য এবং নতুনত্ব প্রয়াসের উদ্দেশ্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, তখন 'সাহিত্য' পত্রিকা নানা ব্যঙ্গ-বিরূপতা ও অশ্লীল সাহিত্য অননুমোদিত সমালোচনাতে হয়েছিল মুখর। এই সমস্ত সমালোচনা রীতির সমালোচনা করে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' লিখেছিলেন: "আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া করে তারপর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে। ...আর-এক জাতীয় সমালোচনা আছে যার রিজন্ এর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, যা ষোল-আনা আনরিজন এর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এজাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায়, এ নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ। ...এ রকম সমালোচনার জন্মস্থান হচ্ছে হৃদয়।"[২৩]

কেবল মাত্র সম্পাদক সুরেশচন্দ্র নন, 'সাহিত্য' পত্রিকাতে আধুনিকতার বিরুদ্ধে (বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে) অনেকের নিন্দনীয় সমালোচনা প্রকাশিত

---

* (ক) "রবীন্দ্রবাবুর 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি' অনেকটা এক খাতে চলিতেছে। উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বড় সূক্ষ্ম। যাক্ সমাপ্তির পূর্বে বিসর্জনের বাজনা বাজাইবার কাহারও অধিকার নাই।"

সাহিত্য: আষাঢ়, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

(খ) "রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যবিচারে' সংক্ষেপে তাঁহার ঘরে-বাইরে উপন্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'আমার মতে সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা সন্দীপেরই যোগ্য—অতএব সে কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সঙ্গত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।' মম্মটের সেই পুরাতন কথা মনে পড়িল,—'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।' সন্দীপের মত 'ন প্রবর্ত্তিতব্যম্' 'ঘরে-বাইরে' শেষ করিয়া পাঠকের মনে ইহা জাগে কি না? সন্দীপ যে আদর্শ চরিত্র নয়, রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে, এক প্রকার স্পষ্টভাবে গতানুগতিক বাঙ্গালীকে তাহা বলিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।"

সাহিত্য, বৈশাখ; ১৩২৭।

হয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় তাঁর 'প্রণয়ের পরিণাম' গল্পে এক ধনী ঘরের ছেলে ও অল্পবয়সে মাতৃহীন যুবকের যে কাহিনী চিত্রিত হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ যে আক্রমণের পাত্র হয়েছিলেন, সেজন্য রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে সকলেই দুঃখিত হন। এর উত্তরে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'একটি কুক্কুরের প্রতি' নামে ব্যঙ্গ কবিতা 'প্রদীপ' পত্রিকায় (১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) লিখেছিলেন। তবে, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'কাব্যে গল্প' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও রচনাপদ্ধতির সমালোচনা হলেও, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করবার প্রবণতাই বেশী করে চোখে পড়ে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকাতে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যে নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সমালোচনা সাহিত্য নীতির পরিপূরক না হয়ে ব্যক্তি আক্রমণের দিকেই ধাবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করার মূলে ছিল তাঁর ব্যক্তিবিদ্বেষ। বিশেষভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে কুম্ভিলক বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। আধুনিক সাহিত্যরীতির ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা তিনি একই সঙ্গে চালিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করলেই আধুনিক সাহিত্যচিন্তার অনুপ্রবেশকে রোধ করা যাবে ও তা নিশ্চয়ই সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই সমালোচনা সম্পূর্ণভাবে ভব্যতা বর্জিত এবং হৃদয়সর্বস্ব ভাবালুতায় সম্পৃক্ত। বাংলা কাব্যে আধুনিক রীতিকে আক্রমণ করে তিনি লেখেন: "দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।

কবিতা লিখিতে বলিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই, সব নায়ক আর নায়িকা। ...ইহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ, নয়ত টপ্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই। ...আমাদের দেশে যেখানে 'দাম্পত্য প্রেম' ভিন্ন অন্যরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই, সেখানে 'দাম্পত্য প্রেমের' গান নাই বলিলেই হয়! হা অদৃষ্ট!"[২৪] তিনি এই দুর্নীতির মূল কারণ হিসাবে অভিযুক্ত করেছেন কবি, নাট্যকার ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথকে। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন: "রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন।...গান লম্পট বা অভিসারিকার গান।... এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ

সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ। স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত। তবে রবিবাবুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব কবিদের এই প্রভেদ যে, রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।

রবিবাবুর খণ্ড কবিতাও ঐ একইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই।...নারীজাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃত্বের স্বসত্ত্বের কথা মনে পড়ে না। নারীজাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার 'মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।"[২৫] রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কবিতাকে আক্রমণ করে তিনি লেখেন: "রবীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না।"[২৬] যদিও তিনি 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষা, ছন্দ ও উপমার প্রশংসা করেছেন, তবুও দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুয়ানী মন ও রক্ষণবাদী চিত্ত পরিশেষে বলেছে: "মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।"[২৭] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনা আর যাই হোক, সাহিত্য সমালোচনা নয়। বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের রস যে এক জাতীয় বস্তু নয়, তা তিনি উপলব্ধি করেন নি। সাহিত্য মহান্ ভাবের বর্ণনা দিয়ে মহৎ কাজের প্রেরণা যোগাবে, এই নীতিগত প্রশ্নও অবান্তর। নীতিবাগীশ সমালোচকদের উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরী 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরাণী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।

অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমার-সম্ভবের শৈল-আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র।·· গাছের মূল থাকে মাটিতে, কিন্তু তার ফুল ফোটে আকাশে। ফুল দেখবামাত্র যে-লোকের তার মূলের কথাই বেশি করে মনে পড়ে সে ফুলের যথার্থ সাক্ষাৎ পায় না, পায় শুধু মাটির। সুন্দরের হিসেব থেকে ফুল আকাশকুসুম মাত্র এবং তাতেই তার সার্থকতা; কিন্তু সত্যের হিসেব থেকে তা সমগ্র সৃষ্টি প্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুস্যূত। আমরা যাকে প্রেম বলি, তাও মনোজগতের বস্তু হলেও দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। যেমন পার্থিব ফুলের রূপ তার একমাত্র গুণ নয়, উপরন্তু তার প্রাণ আছে; তেমনি মানব-প্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে। তারপর দেহ-মনের বিভাগটা কি তেমন সুনির্দিষ্ট? দেহের কোথায় শেষ ও

মনের কোথায় আরম্ভ, তা কি আমাদের প্রত্যক্ষ।...যদি কোন কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদজ্ঞান মূর্ত হয়ে ওঠে তা হলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই।...যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।"[২৮] পরবর্তীকালে 'কল্লোল' পর্বে সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে যে বিরোধ ও ভাবদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, প্রমথ চৌধুরী নবীন মতাবলম্বীদের পক্ষ অবলম্বন করে সাহিত্যের শুষ্ক প্রাণহীন নীতি ও আচারসর্বস্বতাকে যে নিন্দা করেছিলেন, এই প্রবন্ধে তার সমর্থন আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ইংরেজ সমালোচক রাস্কিনের মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন। তিনি স্পষ্টই লেখেন: "যাহার মূলে দুর্নীতি, তাহা কাব্য হয় না। আর, যে কাব্য পড়িয়া কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে, তাহা উচ্চ কাব্য নয়। দুর্নীতি সত্ত্বেও কাব্য চমৎকার হয় না। সূর্য না হইলে দিবা হয় না।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এবং বিপিন বিহারী গুপ্ত। 'মানসী' পত্রিকাকে তাঁরা আপন মত প্রকাশ ও প্রচারের বাহন করেন। যতীন্দ্রমোহন, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ও বিপিনবিহারী প্রবন্ধ রচনা করে এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা ও প্রবন্ধে মন্তব্য ও সমালোচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্যের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রানুরাগীদের ক্রুদ্ধ হওয়ার অপর কারণও ছিল—সেটা তাঁদের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের কটাক্ষ ও উপেক্ষা। তিনি স্পষ্টই লেখেন: "আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, 'তাহা' না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব। তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র। সে রবিবাবুর minus প্রতিভা। সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু।"[৩০]

প্রত্যুত্তরে যতীন্দ্রমোহন বাগচী 'মানসী'তে 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধ প্রকাশ করে তীব্রভাবে লিখলেন: "পাপ কলি বোধহয় পূর্ণ হইল; নতুবা কল্কি-অবতারের সাক্ষাৎ কেন? সর্বতোমুখী প্রতিভা আজ হাসির গান ত্যাগ করিয়া, থিয়েটারের

গ্যালারি মাতাইয়া, অনুকরণে শিশুশিক্ষা পুস্তক রচনার অবসানে, সমালোচনার রঙ্গমঞ্চে নূতন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ—জীবের আর ভাবনা নাই।"[৩১] ঐ বছর শারদীয়া 'বসুমতী' পত্রিকায় একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল—দ্বিজেন্দ্রলাল 'বাজপাখী'র মত পক্ষ বিস্তার করে 'রবীন্দ্র-হংসে'র উপর ছোঁ মারছেন আর বলছেন সাহিত্যে দুর্নীতি।[৩২] এই ছবিটিকে উপলক্ষ্য করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মরাল ও পেচক' নামে 'মানসী'তে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন।[৩৩] পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের 'অপহরণ' প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছিলেন : "বঙ্গভূমির গৌরবস্থল, বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যসম্রাট, ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিষ্কলঙ্ক কাব্য ও কবিতাগুলিকে শঙ্কাস্পৃষ্ট প্রমাণ করিবার জন্য ইংরাজী ও মার্কিন গানের বিখ্যাত অনুকারক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় দিঙ্‌নাগের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সাময়িক সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন।" পরিশেষের বক্তব্যও ছিল বেশ আক্রমণাত্মক। তিনি লেখেন : "সুদূর ভবিষ্যতে যাঁরা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি কঠোর সমালোচক হইবেন তিনি সত্যের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রবাবুকে বহু বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর অনুকারক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যিনি উদার প্রকৃতির লোক তিনি রায় মহাশয়কে রবীন্দ্রবাবুর শিষ্যের দলে, লাঞ্ছিত হরি ঘোষের দলে, স্থান দিবেন। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবুর বর্তমান ব্যবহার তাঁহার চক্ষে গুরুনিন্দা রূপে প্রতিভাত হইবে। চিরন্তন মানব-জাতির এজলাসে, হাকিম হইলেও দ্বিজেন্দ্রবাবু সহজে রেহাই পাইবেন না। আমি 'অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম।"[৩৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য' সাময়িকীতে তাঁর 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কুম্ভিলক বৃত্তির যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, অভিযোগ কর্তা নিজেই কুম্ভিলক বৃত্তিতে পটু এবং সে অপহরণ প্রকৃতই চুরি। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অপহরণ অপবাদ সর্বৈব মিথ্যা। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, 'রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে' লিখেছেন :

"অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো
অনুগ্রহ করো না এ জনে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল 'দুর্গাদাস' নাটকে লিখেছিলেন,

"সম্রাট। অনুগ্রহ কর্বেন না, এইটুকু অনুগ্রহ করুন।"[৩৫] এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর রচনাকে কটাক্ষ করে সত্যেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'মানসী' পত্রিকাতে আরও তিনটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়, "কে তুমি ?"

মাঘ সংখ্যায় "দশপদীর স্বরূপ" এবং "চড়কের চানাচুর" ও চৈত্র সংখ্যায় "বইঠি বিকায়" ছিল উল্লেখযোগ্য।[৩৬]

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর 'বিরহ কাব্য' প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগের জবাব দিয়ে লিখেছিলেন, "উজ্জ্বল ছবিই আঁকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, সত্য ছবি আঁকিতেই কবি বাধ্য, তবে সত্য শিব সুন্দর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া সকলরূপ মলিনতার মধ্যে উজ্জ্বল আপনি ফুটিয়া উঠে। সংসারে দুঃখ দৈন্য বেদনার অন্ত নাই; কিন্তু তার মধ্যেও গভীর আনন্দের নির্ঝর উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে— Pradise সত্যই Lost হইয়াছে, কিন্তু তাহাই শেষ কথা নহে, Eden-এ যে ইতিহাসের আরম্ভ Calvary-তে মহত্তর পরিণামের মধ্যে তাহার শেষ। এ তত্ত্ব, রবীন্দ্রবাবু যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন খুব অল্প স্থানেই তাহা দেখিয়াছি।"[৩৭] দ্বিজেন্দ্রলাল উপহাস ভরে অভিযোগ করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ একটি 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান' কিন্তু "Wordsworth, Browning প্রভৃতি কবিগণ মানুষের উজ্জ্বল ছবিই আঁকিয়াছেন।"[৩৮] দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিদ্বেষপ্রণোদিত' সমালোচনার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সুচিন্তিত' ও 'সুলিখিত' প্রবন্ধটিতে 'রবীন্দ্রকাব্যের গভীর দিকের মর্মজ্ঞ সমালোচনা' প্রথম পাওয়া গেল।[৩৯]

দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশের সমালোচনা করেছিলেন দুর্বোধ্যতার অভিযোগ নিয়ে। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'কাব্যের অভিব্যক্তি।' 'প্রবাসী' ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে কাব্য-কবিতায় অস্পষ্টতা-জনিত দুর্বোধ্যতার আলোচনা করে লেখেন: "বঙ্গের অস্পষ্ট কবিগণ বড়ই অধিক শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও ব্রাউনিঙের দোহাই দেন। এই ইংরাজ কবিগণ স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য বটে। কিন্তু (ব্রাউনিং ছাড়া) তাঁহাদের কাব্যের মূল বা কেন্দ্রস্থ ভাব ধরিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় অস্পষ্ট কবিগণের কাব্যে কোন ভাবই ধরা যায় না।...কবিতার ভাষা হইতে ভাব যে পাঠকের টানিয়া বুঝিতে হইবে, তাহা তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যান। আমি বলিব শেলীই হৌন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই হৌন, আর গেটেই হৌন, অত্যধিক দুর্বোধ্যতা তাঁহাদের দোষ, গুণ নহে। তাঁহারা স্বয়ং বা তাহাদের কোন বিশিষ্ট সমালোচক সেগুলিকে গুণ করিয়া ধরেন নাই।...কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক অস্পষ্ট কবিগণের দুই-এক শ্লোক নহে—সমস্ত কবিতাটির খুঁজে না পাওয়া যায় মাথা, না পাওয়া যায় লাঙ্গুল। মাথা খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে কোনই ভাব পাওয়া যায় না।[৪০]

আর এই দুর্জ্ঞেয়তার জন্য তিনি দায়ী করেন আধুনিকতার পথিকৃৎ রবীন্দ্র-

নাথকে ও 'সোনার তরী' কবিতাটি হয়ে ওঠে তাঁর এ বিষয়ের আক্রমণ স্থল। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ঐ প্রবন্ধে বলেন: "আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ···কবিতাটির ছয়টি ক্ষুদ্র শ্লোক। তাহার মধ্যে মূলভাবগুলি এত পরস্পর বিরাধী। ...আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিব বলিয়া বসিলে 'পাখী সব করে রব' হইতে তাহা বাহির করা যায়।···

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বিলাতের এক দুর্বোধ্য কবি, তাঁহার Ode on the Immortality of the Soul এক অতি দুর্বোধ্য কবিতা। এ দীর্ঘ কবিতাটির মধ্যে পরস্পরবিরোধী একটি ভাব নাই। সে কবিতাটি বোঝা যায়। পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য কবিতা বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালী ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদঘর্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের বৃহৎ ভাবের ফল হয় ত বলিতে হইবে যে, সে ভাব বড়ই বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি দুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নহে—একেবারে অর্থশূন্য, স্ববিরোধী। ···কবিতা মিষ্ট ছন্দোবন্ধ নহে। যে কবিতা পড়িতে পড়িতে হৃদয় আলোড়িত হয়, উৎসাহে, আনন্দে, কারুণ্যে হৃদয় ভরিয়া যায়, যাহা প্রকৃতির বা মানব-হৃদয়ের সুচিত্র, যাহা আত্মাকে প্রসারিত করে ও বহির্জগতের দিকে মহা সহানুভূতিতে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাই কাব্য। কাব্য যদি দুর্বোধ্য হয় তাহা হইলে এ উদ্দেশ্য সুসাধিত হয় না। ···রবিবাবুই অনেক সত্যই উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহারা তাহা ছাড়িয়া এই অর্থশূন্য শব্দ সমষ্টির দিকে কেন মনোনিবেশ করেন, জানি না। ··· আধুনিক অস্পষ্ট বঙ্গ কবিগণ সাধারণতঃ কোন আইডিয়া লইয়াই চলেন না।"[৪১]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিকতার সর্বৈব বিরোধী অপর একজন সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অনেক আগেই 'সোনার তরী' কবিতাটির প্রশংসা করেন। তিনি কবিতাটিকে দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি; বরং বাংলা কাব্য সাহিত্যে এক মহামূল্য সংযোজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, "এবারকার সাধনার আর একটি মহামূল্য অলংকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী'। আমরা বহুদিন এমন সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিত্বময় কবিতা পড়ি নাই। ...ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য রচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়; তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। .. তিনি 'সোনার তরী'র মত কবিতা লিখুন, তাঁহার 'সোনার' লেখনী অমর হইয়া থাকিবে।"[৪২]

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতানুভূতি গার্হস্থ্যজীবন প্রেম, মৃত্তিকাতলচারী জীবনবেদ ও পার্থিব জীবনপিপাসাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল প্রকাশিত। তিনি দুজ্ঞেয়তা অথবা দুর্বোধ্যতার মিস্টিক চেতনাতে কখনও আচ্ছন্ন হন নি। আধুনিকতার যে

রূপ ক্রমবর্ধমান জীবন জটিলতায় সমাচ্ছন্ন, প্রহেলিকা মায়ায় সমাসীন এবং অপ্রত্যক্ষতার দূরযানী চিন্তায় ভাববিলীন, তাকে দ্বিজেন্দ্রলাল কখনও উপলব্ধি করেন নি। তিনি যেন হৃদয়বিলাসের প্রত্যক্ষতার মধ্যে বিশ্বের সুরসৌন্দর্য ও সকল সুধা বিলাসের উন্মেষ লক্ষ্য করতে প্রয়াসী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লেখেন: "বিশ্ব সৌন্দর্য কেবল গোলাপ ফুলে, সন্ধ্যার মেঘে, নারীর বিম্বাধরে নাই। মানুষের হৃদয়ে যে সৌন্দর্য আছে, বাহিরে তার সিকির সিকিও নাই। এই সব সৌন্দর্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেখানোই কবির মহত্তর কাজ।"[৪৩]

তবে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সর্বৈব প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় হিন্দুয়ানী মনোভাব এই গল্প পাঠে পরিতৃপ্ত হয়েছিল। এই উপন্যাস সম্পর্কে তিনি লেখেন: "এরূপ কৌশলের সহিত ইহা রচিত হইয়াছে যে, এ উপন্যাসখানি আমি মুগ্ধ হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

গোরার চরিত্র অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা ও হিন্দু সমাজ-রক্ষণে একান্ত জিদ অসাধারণ কৌশলের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।...

উপন্যাসখানির উদ্দেশ্য বোধ হয় ব্রাহ্মধর্মের একটি চরম লক্ষ্য নির্দেশ করা। চমৎকার কৌশলের সহিত দেখান হইয়াছে যে, হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামীর চেয়ে আধুনিক ব্রাহ্ম গোঁড়ামী কম অনিষ্টকর নহে। ধর্মই সত্য, আচারভেদে সমাজভেদ নীতি-বিরুদ্ধ—এই মহাসত্য প্রচার জন্যই যেন এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। ..জ্ঞান ও প্রেম, যুক্তি ও অনুভূতি, সহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহ এ অপূর্ব উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। ...ইহা শুদ্ধ উপন্যাস নহে, ইহা ধর্মগ্রন্থ। ...এ উপন্যাস বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব।"[৪৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন আধুনিকতার বিপক্ষে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রধান নান্দী পাঠক, রবীন্দ্রনাথকে তিনি বার বার নিন্দনীয়ভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর এই সমালোচনা জিজ্ঞাসাজড়িত ছিল না, ছিল বিদ্বেষপ্রণোদিত। তাঁর নীতি-বাদী চিত্ত সমাজনিরপেক্ষ মতবাদ, দেহাশ্রিত প্রেম, কামনাবিলাস সমন্বিত জীবন বুভুক্ষাকে কোনক্রমেই সহ্য করতে পারে নি। একে তিনি অধর্ম ও অশ্লীল বলে অভিহিত করেছেন কাব্যনীতির বিচার ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। সাহিত্যের মত ও আদর্শের পার্থক্যই তাঁকে রবীন্দ্রবিরোধী করেছিল। নতুবা তিনি নিজেও উপলব্ধি করতেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভাষা ও ছন্দে সুমধুর। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রানু-রাগীদের ভক্তির আতিশয্য সইতে পারতেন না। অনেক স্থলেই তাঁদের অনুকরণা-ভিলাষী মনোভাব তাঁর কাছে অসহ্য ও অপ্রিয় মনে হতো। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় উষ্মাভরে লিখেছিলেন: "আমি সেই চেলাদিগকে এইখানে বলিয়া রাখি যে

রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি সেই চেলাগণ তাহার দশমাংসও করেন কিনা সন্দেহ। তবে রবীন্দ্রবাবু যা'ই লেখেন তা'তেই 'তাধিন তাকি ধিন, তাকি, ধিন তাকি, ধিন তাকি, ম্যাও এঁও এঁও' বলে' কোরাস দিতে পারি না—রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।"[৪৫]*

রবীন্দ্রবিরোধীদের মধ্যে অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সিংহ। 'নারায়ণ' পত্রিকা ইতিপূর্বে রক্ষণশীল দলের দলী হয়ে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কি রকম অভিযোগ এনেছিল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা নিয়েছি। কিন্তু তবুও এই রক্ষণবাদী সাময়িকীর ফাঁক-ফোকর দিয়ে আধুনিকতার হাওয়া যে প্রবাহিত হয়েছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। যতীন্দ্রমোহন এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে 'বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যের গতি নির্ণয় ও সমালোচনা' (১৯২০/১৩২৭) নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। পরে এই প্রবন্ধগুলি 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' (১৯২২/১৩২৯)নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, লেখককে একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ "...সময় মত সাহিত্যের জন্য কিছু পাঠাইবেন। বর্তমান সাহিত্যে শ্লীলতার শ্রাদ্ধ হইতেছে। মাসিকপত্র ও প্রকাশিত উপন্যাস কবিতাদি উপলক্ষ করিয়া যদি সাহিত্যে নীতি ও ধর্মের অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন করিয়া ছোট ছোট প্রবন্ধ লেখেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।"[৪৬] তৎকালে জীবিত লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হরিদাস হালদার প্রমুখদের কথাসাহিত্য তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকলে তিনিও বোধ হয় রেহাই পেতেন না। যতীন্দ্রমোহন সিংহ আর্টকে Interpretation of life বা মানবজীবনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। বিশেষভাবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয়ের

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রবীন্দ্রপ্রীতির অপর উদাহরণঃ—

"আমাদের শাসন-কর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

—ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০

[দ্বিজেন্দ্রলালের এই আশা পরবর্তীকালে পূর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই উপাধি লাভের সময় দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি লোকান্তরিত হন।]

সাহিত্যবিচিন্তাকে অনুসরণ করেছিলেন। লিও টলস্টয়ের 'What is Art' বই থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আপন মত ও বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে 'কলাকৈবল্য মতবাদ'কে (Art for Art's sake) গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে তিনি বলেন: "যে সকল অনুভূতি দ্বারা মানবহৃদয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম ভাবের বিকাশ হইয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে তাহাই আর্টের বিষয় হওয়া উচিত। ...আর্ট কেবল আর্টের জন্য নহে—যে পরিমাণে ইহা দ্বারা মানবসমাজের উপকার বা অপকার সাধিত হয় সেই পরিমাণে ইহা ভাল অথবা মন্দ।

যাঁহাদের মতে আর্ট কেবল আর্টের জন্যই মূল্যবান, সমাজের উপকারিতার বা অপকারিতার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই—কবির উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, স্কুলমাস্টারি করা কবির কার্য নহে—তাঁহারা Tolstoy-এর এই মত* অবশ্য স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমাদের হিন্দুর দেশে, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, ব্যাস-বাল্মীকি প্রভৃতি স্নিগ্ধ মহর্ষিশাসিত সমাজে, চিরদিনই শিল্পকলা অন্যান্য মানব প্রচেষ্টার (human activity) ন্যায় সমাজসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। Count Tolstoy যে 'religious perception'-এর উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অর্থও সমাজসেবা।

*'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রবন্ধে যতীন্দ্রমোহন সিংহ টলস্টয়ের 'What is Art' গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা আলোচনার স্বার্থে নেওয়া হল—"Art is a means of union among men, joining them together in the same feeling. ...A work of art that united everyone with the another and with one another would be perfect art...... Art unites men. Surely it is desirable that the feelings in which it unites them should be 'the best and highest to which men have risen', or at least should not run contrary to our perception of what makes for the well-being of ourselves and of others. And our perception of what makes for the well-being of ourselves and others is what is called our religious perception. ...Art is a human activity, and consequently does not exist for its own sake, but is valuable or objectionable as it is serviceable or harmful to mankind."

(P. 7-8)

"The religious perception of our time, in its widest and most practical application, is the consciousness that our well-being both material and spiritual, individual and collective, temporal and eternal, lies in the growth of brotherhood among men in their loving harmony with one another." অর্থাৎ বর্তমান যুগের ভাব কি? না মানুষে মানুষে প্রীতি স্থাপন ও ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। তাহার দ্বারাই মানব সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়।

যাহা হউক লোকশিক্ষা ও সমাজের উন্নতিসাধনই যদি আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের বর্তমান যুগের বাঙ্গলা কাব্য দ্বারা সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হইতেছে, এখন তাহার বিচার করিব।"[৪৭]

যতীন্দ্রমোহন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমাজ ও জীবনের উপর প্রভাব বিচার করতে গিয়ে দেখলেন যে "নবেল ও গল্পের বই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেখানে ...একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া (unhealthy atmosphere)-এর সৃষ্টি করিতেছে—আমাদের সমাজের বায়ু দূষিত করিতেছে।"[৪৮] তাঁর মতে বাংলা কথাসাহিত্যে বইদূষণ প্রক্রিয়াতে নিয়োজিত আছেন সেই সকল মহাত্মারা, যাঁরা "প্রকৃত ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহারা Art for Art's sake এই ধুয়া ধরিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন।"[৪৯] লেখক এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের মধ্য থেকে বিহারী ও বিনোদিনীর কথোপকথনের অনেক উদ্ধৃতি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অসামাজিক প্রেমের চিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রও যে দোষী, সেদিকে কটাক্ষ করে যতীন্দ্রমোহন বলেছেনঃ "নাটক নবেল পড়িয়া কোন কোন গৃহস্থের কুলবধূ যে স্টেজের নায়িকা হইতে পারেন ..কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' গ্রন্থে তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।...নাটক নবেলে বর্ণিত প্রেমের চিত্র অপরিণত বয়স্ক ও অগঠিত চরিত্র বালক-বালিকাদিগের মধ্যে যে কতটা হলাহল ছড়াইতে পারে, ইহা দ্বারা তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। আমার বোধ হয় কলেরা প্লেগ বসন্তের বীজ অপেক্ষাও এই প্রেমের বীজ সমস্ত শরীরে অধিকতর মারাত্মক।"[৫০]

যতীন্দ্রমোহন সমসাময়িক লেখকদের বিরুদ্ধে বাংলা কথাসাহিত্য রচনায় প্রেম অভিব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে অভিযোগগুলি এনেছিলেন, তা ছিল প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন—(১) বিধবার প্রেম, (২) সধবার প্রেম ও (৩) বারবনিতার প্রেম।

বিধবার প্রেম ঃ যতীন্দ্রমোহনের প্রথম অভিযোগ ছিল যে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে বিধবার প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও চিত্রচিত্রণ এক অতি দুরূপনের দুর্নীতি ও ব্যভিচার। তিনি বলেছিলেন ঃ "আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিধবার প্রেমে পড়ার চিত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কবিগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে চিরদিন সম্মানের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন ···আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া ইহার পথ দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পরে রোহিণীও তাঁহার সৃষ্টি।...বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা পাইয়াছি কবিবর রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট বিধবা চরিত্র—'চোখের বালি'র বিনোদিনী।...প্রেমের খেলা জিনিসটা কখনও হিন্দুর গৃহে প্রচলিত ছিল না, ঘরের বাহিরে অবশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে হিন্দুগৃহে তাহা প্রবেশ করাইয়াছেন। বিনোদিনী মিশনারী মেমের দ্বারা শিক্ষিতা, হয়ত ইংরেজি নবেলও দুই চারিখানি পড়িয়া থাকিবে, তাই flirtation, coquetry প্রভৃতি ইংরেজী ধরণের প্রেমের খেলার মর্ম বুঝিয়াছিল। তাই সে মহেন্দ্র ও বিহারীকে অবলম্বন করিয়া অনেক খেলাই খেলিয়াছে। অথবা বলিতে গেলে গ্রন্হকার স্বয়ং মহেন্দ্র, বিহারী, বিনোদিনী ও আশাকে লইয়া অনেক খেলা দেখাইয়াছেন—ইহারা যেন তাঁহার হাতের দাবার ঘুঁটি—'চোখের বালি' উপন্যাসখানি একটা শতরঞ্চ খেলার ছক—গ্রন্হকার এই ছকের উপর তাঁহার ইচ্ছামত এই সকল ঘুঁটি চালাইয়া কিস্তি মাৎ করিয়াছেন। উপন্যাসের মধ্যে শতরঞ্চ খেলারই অপর নাম উপন্যাসে মনোবিজ্ঞান-চর্চা। ইহাই না কি এখন খুব উচ্চ দরের আর্ট।...বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনার নবেলী প্রেম চরম মাত্রায় (climax) উঠিয়াছে। ইহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত আয়েষার 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর', শিশুর আলিঙ্গন।...আমার কথা এই, গ্রন্হকার একজন হিন্দু বিধবাকে এইরূপ পর পুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়া ও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন। আর এই গ্রন্হের প্রায় পনের আনা ভাগে পাপের চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এইরূপ পাপ চিত্রের সহিত পাঠক-পাঠিকার মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, পাপের প্রতি ঘৃণাও ক্রমে কমিয়া আসে। এই হিসাবে এই গ্রন্হ সমাজ-শরীরের পক্ষে বিষস্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র পরে, বিধবার প্রেমে পড়া লইয়া আরও কয়েকখানা বই বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে বর্তমান সময়ের লোকপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি' ও 'পল্লীসমাজ' উল্লেখযোগ্য।...কিন্তু এ স্থানে আমাদের নালিশ এই, তিনি মাধবীকে দেবীরূপে

চিত্রিত করিয়া অবশেষে মানবী করিলেন কেন ?...আমরা গ্রন্থমধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খ‍ুঁজিয়া পাই না। বিনোদিনীর রক্তে যেমন প্রেমে পড়ার বীজ ছিল, এবং তাহার বাল্যকালের শিক্ষায় সেই বীজের বিকাশ হইয়াছিল, মাধবীর মধ্যে ত আমরা সেরূপ কিছু পাই না।...আসল কথা এই, প্রেম না হইলে নবেল হয় না, আর বিধবাকে প্রেমে না ফেলিলে নবেলের উপকরণ কোথা হইতে আসিবে ?...কিন্তু এইরূপ অপবিত্র প্রেমের চিত্র দ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, ইহা একবার চিন্তা করা উচিত।...আমাদের মতে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিতা হিন্দু বিধবারূপ লতা ভূমিতলে গড়াইবে কেন ? তাহার স্থান দেব মন্দিরের চূড়ায়। তাহার সেই গৌরবের স্থান হইতে তাহাকে ভ্রষ্ট করিবার পক্ষে যাঁহারা সাহায্য করেন, তাঁহারা সমাজের উপকার না করিয়া অপকার করেন।

এই গ্রন্থকারের 'পল্লীসমাজে' আর একটি হিন্দু বিধবার পতনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।...বাল্যকালে অনেক বালক বালিকাই একসঙ্গে খেলা করে, তাই বলিয়া বয়স হইলেই কি তাহারা প্রেমে পড়িবে ?...আর বাল্যকালের সেই নির্মল, নির্দোষ প্রণয় বিবাহ হওয়ার পরেও স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু passion বা love-এ পরিণত হইবে, তাহার কোন কথা আছে ?·· এ স্থলে রমার রমেশের সহিত প্রেমে পড়িবার কি কারণ আছে ?...রমা কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া রমেশকে ভালবাসিতে শেখে নাই। রমা রোহিণীর ন্যায় কোকিলের কুহুতানে মাতিয়া উঠে না। রমা বিনোদিনীর ন্যায় ইংরেজী মেম দ্বারা শিক্ষিতা নহে, এবং বিলাতী হাবভাবও শিক্ষা করে নাই। তবে সেই অর্ধশিক্ষিতা নির্মলচরিত্রা সরলা হিন্দু বিধবা তাহার মৃত পতিকে ভুলিয়া রমেশকে কেন ভালবাসিবে ?···

গ্রন্থকার নবেল লেখার জন্য তাঁহার 'পল্লীসমাজে' এই অবৈধ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়া পল্লীগ্রামের দলাদলি ও কলহদূষিত বায়ু যে আরও দূষিত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার ফলে পল্লীগ্রামে অতি কুৎসিত আকারে প্রচলিত স্বকীয় ও পরকীয় প্রেম সভ্য বেশ ধারণ করিয়া সাধারণের ঘৃণার স্তর কাটাইয়া উঠিতে পারে।"[৫১]

হরিদাস হালদারের 'কর্মের পথে' উপন্যাসখানিকেও যতীন্দ্রমোহন আক্রমণ করে নিন্দনীয় সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে এই গ্রন্থখানি কেবল 'নবেল' লেখার উদ্দেশ্যেই লেখা, আর্টের কোন সূক্ষ্ম বিকাশ নেই। যুবক-যুবতীর লালসাদীপ্ত কামনাকে লেখক যে অনাবিল অতীন্দ্রিয় প্রেম নামে অভিহিত করেছেন, তা প্রকৃত-পক্ষে বিশুদ্ধ কামায়ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ ধরনের gross love বা কামের

চিত্রে পাঠক-পাঠিকাদের মনে পাপের প্রতি আসক্তি বেড়ে যাবে বলে লেখক আশংকা প্রকাশ করেছেন।[৫২]

সধবার প্রেম (বিবাহের পূর্বে জাত)ঃ কুমারী অবস্থায় সঞ্জাত প্রেম যা বিবাহোত্তর পর্বেও স্থায়ী হয়ে সমাজের আবহাওয়াকে কলুষিত করে তুলেছে— আধুনিক উপন্যাসে এরকম প্রেমের চিত্রচিত্রণে বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে যতীন্দ্রমোহন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই নীতিহীন কর্মপ্রচেষ্টার উৎস হিসাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি এ বিষয়ে রেহাই দিলেও, শরৎচন্দ্রকে অভিযুক্ত ও বিদ্ধ করেছেন অত্যন্ত তীক্ষ্ন শলাকায়। বিবাহের পূর্বে জাত প্রেমচিত্র চিত্রণ সম্পর্কে তিনি লেখেন ঃ "বিধবার প্রেমে পড়া হিন্দু সমাজের আদর্শ অনুসারে ঘোরতর পাপকার্য। এই সকল পাপচিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া কোনও কোনও হিন্দু বিধবা সংযমভ্রষ্টা হইতে পারেন, এই কারণে সমাজের পক্ষে এই সকলের চিত্রাঙ্কন নিতান্ত দূষণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সধবা স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত প্রেম করাটা সকল সমাজেই নিন্দনীয়, এবং তাহার চিত্রাঙ্কন সকল সমাজের পক্ষেই অনিষ্টজনক। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক উপন্যাস লেখক বিলাতী উপন্যাসকে আদর্শ করিয়া সধবার পরপুরুষের প্রতি প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং করিতেছেন।...কুমারী অবস্থায় একজনকে ভালবাসিয়া পরে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হইলেও...আমরা অবস্থা বিশেষে সেই রমণীকে কৃপার পাত্র মনে করিয়া ক্ষমা করিতে পারি···

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে তাঁহার শৈবলিনী-চরিত্রে··· (এইরূপ) প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ···শৈবলিনীর পাপ মানসিক পাপ। ···গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগই সেই প্রায়শ্চিত্তের কথায় পরিপূর্ণ। ইহা দ্বারা পাঠকের মনে পাপীর প্রতি সহানুভূতি ও পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়। ...তবুও প্রেমের মাদকতা এত বেশি যে, শৈবলিনীর কঠোর দণ্ড দেখিয়াও লোকের মনে পাপাসক্তি কমে না। এবং শৈবলিনীর অনুকরণে পরপুরুষাসক্তি সমাজে চলিয়াছে...

...রবীন্দ্রনাথের কোনও উপন্যাসে আমরা এই শ্রেণীর প্রেমের চিত্র পাই না। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দেবদাসে' এই শ্রেণীর আর একটি প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। .. পার্বতীর···পরপুরুষের প্রেমে তন্ময়তা কাব্যের হিসাবে খুবই মর্মস্পর্শী। ...পার্বতীর লজ্জা নিন্দার ভয়ের সীমার অতীত এই অসাধারণ পরকীয় প্রেম কাব্য হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা অনিষ্টকর। ...সমাজের হিসাবে পার্বতীর এই পরকীয় প্রেম যে নিতান্ত গ্লানিজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পার্বতীর দেবদাসকে আপন ভাবা ও

নিজের স্বামীকে পর ভাবা সমাজে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরপুরুষ-প্রেম-কলুষিত নারীর মনে একটা নজির হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ, লেখকের আর্টের গুণে ইহা সকলেরই হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে। ...পার্বতী...একজন দেবচরিত্র স্বামী পাইয়াছিল, কিন্তু পার্বতী তাঁহাকে একদিনের তরেও ভালবাসিতে চেষ্টা করে নাই, সে তাহাকে বরাবর পর ভাবিয়া আসিয়াছে আর পরপুরুষ দেবদাসকেই আপন ভাবিয়াছে। বৃদ্ধ ভুবনবাবুর কথা মনে পড়িলে পার্বতীর কেবল হাসি পাইত, আর তাহার হৃদয়ের কান্না দেবদাসের জন্য মজুত রাখিয়াছিল। ... পার্বতী ও দেবদাস, শৈবলিনী-প্রতাপের ন্যায় এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মত প্রায় জন্ম হইতে ফুটিয়াছিল। ভাগ্য বিপর্যয়ে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয়েই জীবনে ঘোরতর দঃখ ভোগ করিল। কিন্তু সৌদামিনীর (স্বামী) বেলায় একথা খাটে না। সৌদামিনী মামার যত্নে উত্তমরূপে আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। সে দর্শন শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন লইয়া তর্ক করিতে পারিত, অথচ নিজের হিতাহিত বুঝিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যুবকগণ যে নিরীশ্বর শিক্ষা (Godless education) পাইতেছে, তদ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ...সৌদামিনী তাহার মামার নিকট এই Godless education পাইয়াছিল, এবং নরেনের সঙ্গে অবাধে মিশিতে পাইয়া তাহার প্রতি অবৈধ প্রেমে আসক্ত হইল। এইরূপ অগঠিত চরিত্র যুবক-যুবতীকে পরস্পরের সহিত অবাধে মিশিতে দেওয়া আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় কতদূর সমীচীন তাহাও এ স্থানে বিবেচ্য। ...সৌদামিনী তাহার মামার নিকট এইরূপ বিকৃত শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহার পরে স্বামীগৃহে গিয়া স্বামীর মহৎ চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে না হইতে, নরেন আসিয়া তাহার কানে মধুর হলাহল ঢালিয়া দিল। ··· সৌদামিনীর অধঃপতনের বীজ বাল্যকাল হইতেই তাহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়া কালক্রমে সুযোগ পাইয়া তাহা পল্লবপুষ্পে শোভিত হইয়া অবশেষে বিষময় ফল প্রসব করিল। গ্রন্থকার তাহাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করিয়া···যতই অনুতাপ করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক, তাহার অধঃপতনের ইতিহাস যে একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজে পরকীয় প্রেমাসক্তা সৌদামিনীর সংখ্যা হয়ত বাড়িবে, কিন্তু দেবচরিত্র ঘনশ্যামের সংখ্যা বেশী বাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। ...অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ দিলে যদি পার্বতী ও সৌদামিনীর সৃষ্টি হয়—এবং তাহা যে কালক্রমে না হইবে এরূপ বলা যায় না—তবে ইউরোপীয় আদর্শটা আমাদের অবিচারে গ্রহণ করা কর্তব্য কিনা, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।"[৩]

পরবর্তীর প্রেম (বিবাহের পরে জাত) ঃ যতীন্দ্রমোহন নারীর বিবাহোত্তর প্রেমকে সর্বাপেক্ষা চিত্তের কলুষ প্রবৃত্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। কুমারী অবস্থায় জাত ব্যক্তিপ্রেম কোনক্রমে ক্ষমার্হ হলেও, রমণীর একজনের সঙ্গে বিবাহের পরে অন্য পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে তিনি কোনক্রমেই সহ্য করতে পারেন নি। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন ঃ "কিন্তু যে সকল লেখকের আর্ট আছে, তাঁহারা এই দ্বিতীয়টিতেও পরপুরুষাসক্ত রমণীকে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাহার প্রতি পাঠকের সমবেদনা আকর্ষণ করেন। ইহাতে তাঁহাদের আর্টের সার্থকতা হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সমাজের হিসাবে তাহা অত্যন্ত দূষণীয়।"[৫৪]

বিবাহের পরে সঞ্জাত রমণীর প্রেমচিত্র চিত্রণে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে দায়ী করেছেন। আধুনিক সাহিত্যিকদের নবীন জীবনানুভাবনাকে তিনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে ক্ষত-বিক্ষত করে প্রকাশ করেন ঃ "কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথই এইরূপ চিত্রের পথ প্রদর্শক। ...'নষ্টনীড়ে' যাহার অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তাহার পূর্ণ বিকাশ। আবার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'র একটা মিলিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে—তাহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন'। ...ভারতচন্দ্র অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য মাটির তলে সুড়ঙ্গ কাটার কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিবাহিত স্ত্রীর মনের মধ্যে পরপুরুষের ধ্যানের জন্য সুড়ঙ্গ নির্মাণের পথ দেখাইয়াছেন। ... আমাদের হিন্দুর গৃহে দেবর-ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধটা বড়ই মধুর সম্বন্ধ,...কবিবর রবীন্দ্রনাথই প্রথমে সেই পবিত্র স্নেহের কিরূপ অপব্যবহার হইতে পারে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। ...এই সকল সাহিত্য সমাজ-শরীরে বিষের ন্যায় কার্য করিতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ...কবি স্কুল মাস্টারের স্থান অধিকার করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবশ্য তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই—তিনি আর্টের কারচুপি দেখানর জন্যই চারু-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—কিন্তু আমার মতে এখানে তাঁহার আর্ট নিষ্ফল হইয়াছে। লাভের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে একটি পাপচিত্র বাড়াইয়া সমাজের আবহাওয়া দূষিত করিয়াছেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস এই 'নষ্টনীড়ে'র রাজকীয় সংস্করণ (royal edition)। এই উপন্যাসে কবিবর art for art's sake এই নীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ...নিখিলেশের মতে তাঁহার স্ত্রী ঘরের বাহিরে গিয়া আর দশজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের যাচাই করিয়া যদি অবশেষে তাঁহার নিকটই আবার ফিরিয়া আসেন, তবেই তাঁহার সেই প্রেম খাঁটি প্রেম হইবে। তবে কথা এই, কৈ মাছ পুকুরে তেমন বাড়িতেছে না মনে করিয়া তাহাকে যদি নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়,

তবে সে আবার পুকুরে নাও ফিরিয়া আসিতে পারে। ...এই গ্রন্থে নিখিল, বিমলা ও সন্দীপ ইহারা কেহই মানুষ হয় নাই। ...সন্দীপও আমাদের নিকট সেই রাবণের একটি ক্ষুদ্র অবতার বলিয়া মনে হয়। ... মাইকেল যেটুকু বাকি রাখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের চরিত্রের মধ্য দিয়া, সীতার চরিত্র খর্ব করিয়া তাহা শেষ করিয়া দিলেন।* ...এই উপন্যাসের যে তিনটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তিনটিই নিতান্ত অস্বাভাবিক। কাজেই তাহারা কেহই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না।...

এই কাব্যে মানসিক ভাব বিশ্লেষণের চূড়ান্ত ছড়াছড়ি, ইহার আখ্যায়িকা গ্রন্থকার...পাত্র-পাত্রীদের আত্মকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ক্রমাগত নিখিল, বিমলা ও সন্দীপের sick sentimentalism পাঠকের চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করে। সময় সময় তাহাদের পূতিগন্ধময় ভাবের বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠক পাঠিকার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ...

এই পূতিগন্ধময় কাব্য রচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু (moral atmosphere) কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।"[৫]

যতীন্দ্রমোহন শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে আরও রূঢ়ভাবে লেখেন: "কবিবর রবীন্দ্রনাথ যেটুকু বাকী রাখিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা শেষ করিয়াছেন। ...রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে-বাইরে' অপেক্ষা

* 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের এই আত্মকথনটি সমালোচক মহলে বিশেষ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল: "যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক বনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ওই এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্য সমস্ত লংকাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত।" যতীন্দ্রমোহন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "এই শেষ কথাটি নকল করিতে করিতে আমার চিত্ত শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জাতীয় সংস্কার হইতে এত দূরে মুক্ত হইয়াছেন যে, অবলীলাক্রমে তাঁহার নিজের মনে এইরূপ ভাবের কল্পনা করিয়া কলম দিয়া তাহা লিখিয়াছেন।"

—সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা: যতীন্দ্রমোহন সিংহ; পৃঃ ৮৬।

শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন' সমাজের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর, ...এই চরিত্রহীনে আমরা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট—বিনোদিনী, চারুলতা ও বিমলাকে এক সঙ্গে পাই।...

উচ্চশিক্ষিত আদর্শ যুবক উপেন এই উপন্যাসের মেরুদণ্ড। অর্ধশিক্ষিত যুবক সতীশ তাঁহার চেলা, কিন্তু সে কলিকাতায় পড়িতে গিয়া এক মেসের ঝি সাবিত্রীর প্রেমে পড়িল। সাবিত্রী বেশ্যার গৃহে বাস করিলেও তাহার চরিত্র কলুষিত হইতে দেয় নাই। সতীশের সঙ্গে সে প্রেমের খেলা খেলিত, কিন্তু ধরা ছোঁয়া দিত না।...সতীশ কিন্তু সে অন্যের প্রেমে আসক্ত মনে করিয়া তাহার জন্য পাগল হইল—এবং 'বড়দিদি'র সুরেন ও দেবদাসের ন্যায় হতাশ প্রণয়ীদের অনুকরণে মদ গাঁজা ইত্যাদি ধরিল। ...কিরণময়ী যেমন সুশিক্ষিতা, তেমনি চরিত্রহীনা। সে বিদ্বান স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনেক পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিতে শিখে নাই। ...কিন্তু উপেনকে দেখামাত্রই কিরণময়ীর প্রেম নিতান্ত ইন্দ্রিয় লালসার স্থূলত্ব হইতে সূক্ষ্মত্বের দিকে প্রমোশন পাইল। ... দিবাকর .. কে কাছে পাইয়া কিরণময়ী ...'নষ্টনীড়ে'র চারুলতার মত ঠাকুরপো-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা ও প্রেমচর্চা আরম্ভ করিয়া দিল। ...বিনোদিনী বাঘিনী হইলেও কিরণময়ীর সঙ্গে তুলনায় যেন একটি পোষা বিড়াল। কিরণময়ী উপেনের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে দিবাকরকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ...তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) লেখার গুণে এই চরিত্র-হীন এবং চরিত্রহীনাদের মেলাও পাঠক-পাঠিকাকে আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ...তবে অবশ্যই কিরণময়ীর চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে মনে ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া যায় না। ...এই পাপ-পঙ্কিল আর্ট আমাদের মাথায় থাকুক; যে আর্টের দ্বারা সমাজের আবহাওয়া দূষিত হয়, পাঠক-পাঠিকার মনে কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করে—আমরা সে আর্ট চাই না। আমরা এ পর্যন্ত যত কলুষিত নারী চরিত্র সাহিত্যে পাইয়াছি, কিরণময়ী তাহার সকলের উপরে টেক্কা দিয়াছে।...

কিরণময়ী প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা না হইয়াও বেশ্যার অধম।...সাবিত্রী সতীশের জন্য যেরূপ দুঃখভোগ করিয়াছে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের চোখে জল আসে। কিন্তু তাহা হইলেও সাবিত্রী-চরিত্র সমাজ-শরীরে বিষের কার্য করিবে। ইহার পরে যদি 'মেসে'র ছেলেরা সুন্দরী যুবতী চাকরাণীর সঙ্গে প্রেম করিতে যায়—তবে এই সাবিত্রীর জন্মদাতা সে জন্য দায়ী হইবেন।...গ্রন্থকার পুস্তকের নাম 'চরিত্রহীন' রাখিয়া সচ্চরিত্র লোকদিগকে যেন challenge করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।...হতাশ-প্রণয়ীর সংযত চরিত্র হইয়া থাকাটা কি শরৎবাবুর অলঙ্কারশাস্ত্রে একটা দোষ বলিয়া গণ্য?"[৫৬]

বারবনিতার প্রেম ঃ বারবনিতার প্রেমকাহিনী চিত্রণকে যতীন্দ্রমোহন সামাজিক ন্যায় ও নীতিধর্মের দিক থেকে সমর্থন করতে পারেন নি। এ বিষয়ে তিনি তৎকালীন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য' প্রবন্ধটিকে আদর্শস্থল হিসাবে বিচার করে আপন যুক্তি ও মতাদর্শকে স্থাপন করেছেন। ফলে, ললিতকুমারের বক্তব্য ও যতীন্দ্রমোহনের মতাদর্শ উভয়ই একই মার্গে ধাবিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ "বঙ্গ-সাহিত্যে বারবনিতার প্রেম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কারণ কিরণময়ীকে গৃহস্থ-নারী ও বারনারীর মধ্যবর্তী সেতু মনে করা যাইতে পারে।

বারনারীর প্রেম সাহিত্যে কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে···শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণিকাতন্ত্র সাহিত্য' ·· প্রবন্ধটি গত ১৩২৬ সনের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে ।···তিনি এই প্রকার সাহিত্যের এক বিস্তৃত তালিকা দিয়া তাহাকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অন্তর্গত—পতিতা নারী কোন মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া অথবা হরিভক্তি লাভ করিয়া কিরূপে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস। ···দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যকে সাহিত্যের ওস্তাদগণ 'realism in art' এই নাম দিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাহিত্যে 'বেশ্যার হাবভাব, ছলাকলা, চাতুরী, কপটতা, ভালবাসার ভাণ, নীচতা, অর্থলোভ, আমোদ-প্রমোদ, বিলাসলালসা প্রবৃত্তির,—এক কথায় বেশ্যার জঘন্য জীবন-যাত্রার চিত্র রং ফলাইয়া অংকিত করা হইতেছে।' নারায়ণে প্রকাশিত 'কমলের দুঃখ' গল্পে হেনা চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যে পতিতার প্রেমের প্রভাবে প্রকৃতির পরিবর্তন অংকিত হইয়াছে—যেমন দেবদাসের প্রেমে পড়িয়া চন্দ্রমুখীর পরিবর্তন। চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্যে নারী পতিতা হইলেও সে নারীর বিশিষ্টতা একেবারে হারায় না, মন্দর ভিতরেও ভাল বীজ থাকে, এক শুভ মুহূর্তে অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া সেই পতিতা নারীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত করে, ইহাকে romantic movement তথা humanitarianism-এর ফল বলা যাইতে পারে।···

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ধর্ম সাহিত্যের অন্তর্গত হইয়াছে, তাহাতে বারবিলাসিনীর চিত্র মহাপুরুষের চিত্রের পাশে অতি সংকুচিত হইয়া আছে।...দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধে স্বপক্ষ-বিপক্ষ উভয় প্রকার যুক্তির আলোচনা করিয়া ললিতবাবু বলেন—

'জগতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে কাব্যের বিষয়ীভূত হইবে, এমন কোন

কথা নাই ;…যে চিত্র দর্শনে পাপের প্রতি ঘৃণা বা আতঙ্কের উদয় হয়—সে সব চিত্র পাপের চিত্র বলিয়াই বর্জনীয় নহে। বরং তাহাতে পাপের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে বলিয়া তাহা উপকারী। কিন্তু যে সব চিত্রে উত্তেজক উন্মাদক উপাদান আছে, চিত্ত কলুষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সব চিত্র উদ্ঘাটন করা যুক্তিযুক্ত নহে। পরিণতবয়স্ক লোকে হয়ত এ সব চিত্র দর্শনে অবিচলিত থাকিবেন। কিন্তু অগঠিত চরিত্র যুবক-যুবতী সকলেরই যে এরূপ সুবুদ্ধি হইবে, তাহা বলা যায় না।'

…আমি আর একটা কথা বলিতে চাই। পাপের চিত্র দর্শনে যে ঘৃণা ও আতঙ্কের উদয় হয়, তাহা আবার ক্রমাগত পাপের চিত্র দেখিতে দেখিতে পাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা (familiarity) জন্মিলে থাকে না। …সুতরাং সৎ-সাহিত্য মধ্যে পাপের চিত্র, যে কারণেই হউক, উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা সমাজের পক্ষে নিতান্ত দূষণীয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বারবনিতা-সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-সম্বন্ধেও একথা খাটে।

বেশ্যার মধ্যে সুষুপ্ত নারীত্ব বা মানবিকতা ফুটাইয়া তোলা খুব ভাল কথা সন্দেহ নাই।…কিন্তু একটি বেশ্যাকে ভাল করিতে গিয়া লেখক যদি সেই সঙ্গে সঙ্গে আর দশটি সতী রমণী বা সচ্চরিত্র যুবককে পাপপথে টানিয়া নামান, তবে তাঁহার সেই সমাজ হিতৈষণা থাকিল কোথায়? দুঃখের বিষয়, এই গণিকাতন্ত্র-সাহিত্য-রচয়িতা কবিগণ সব সময়ে একথা মনে রাখেন না।… নবেল লেখার জন্য প্রেমের চিত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—তাহা বেশ্যা-পল্লীতেই যেন আজকাল কতকটা সুলভ হইয়া পড়িয়াছে।…বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের এইদিকে একটা ঝোঁক (tendency) দেখা যাইতেছে—এমন কি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রভৃতি চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তিগণও এই পথ ধরিয়াছেন। বলাবাহুল্য, তাঁহাদের চেলারা যে তাঁহাদের অনুগামী হইবেন, তাহা একেবারেই বিচিত্র নহে। এই জন্য এই শ্রেণীর গল্পের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইতেছে।…আজকাল বঙ্গ সাহিত্য পাপচিত্রের প্রসারে ভারাক্রান্ত হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছে। ভগবান্! বাঙ্গালীর অতি সাধের ধন, সাধনার বস্তু বঙ্গ সাহিত্যকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।"[৫৭]

পরিশেষে যতীন্দ্রমোহনের মন্তব্য ছিল: "আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের স্থিতিশীল সমাজে অনেকদিন হইতে 'ভাঙ্গন ধরিয়াছে', সমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, …পাশ্চাত্য সমাজের লালসা-পিপাসা উদ্দীপ্ত হইয়া—হিন্দু জাতির মজ্জাগত

সংযমের বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীশ্বর শিক্ষা-পদ্ধতি (Godless education) নব্য যুবকদিগকে কেন্দ্রভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ইহার পরে বাস্তব নামধারী কামকলুষময় সাহিত্য যদি আর্টের পুষ্টির জন্য লালসার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করে, তবে সমাজকে কিসে রক্ষা করিবে ?"[৫৮]

কিন্তু তখন বাংলা সাহিত্যের তরণীর পালে পালাবদলের হাওয়া লেগেছে। নতুনত্বের ইশারা ও হাতছানির প্রতি তার আকর্ষণ গভীর। ফলে হিন্দুজাতির অতীত আদর্শ, নীতির সংযম প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত ভারতবাক্য এর গতিবেগকে রুদ্ধ করতে পারল না। অতীত সংস্কারের কাছির বন্ধন টুটে এক নতুন জগতের দিকে ধাবিত হল বাঙালীর সাহিত্য বিচিন্তার সোনার তরী। 'নারায়ণ', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যরথীরা যেন ভগ্ন উরু মহারাজ দুর্যোধনের মত দূরে উপকণ্ঠে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরদেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে উপেক্ষিত অবস্থায় কাল কাটাতে লাগলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি দলের 'শেষ কামড়ও ব্যর্থ' হয়ে গেল।[৫৯]

॥ ২ ॥

বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতাকে কেন্দ্র করে ভাবদ্বন্দ্বের সূত্রপাতে প্রগতিপন্থী লেখকমণ্ডলীর রচনা কিভাবে রক্ষণশীল ও সংস্কারমতবাদী সমালোচকদের হাতে নিন্দিত হয়েছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র আমরা গ্রহণ করেছি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও সর্বশেষে যতীন্দ্র মোহন সিংহ আধুনিকতার বিরুদ্ধে, বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত আক্রমণ চালিয়েছিলেন, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁদের অভিযোগের বিষয়গুলি ছিল—(১) বস্তুতন্ত্রহীনতা, (২) মায়িক সর্বস্বতা, (৩) অশ্লীলতা, (৪) অস্পষ্টতা এবং (৫) দুর্বোধ্যতা। রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী অর্থাৎ যাঁরা আধুনিকতার বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতিভার যে অংশ অপকৃষ্ট, তাই তাঁর সমকালবর্তী শিষ্যদের এবং পরবর্তী কালের ভক্তবৃন্দের সাহিত্য সমালোচনার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বঙ্কিমের সমালোচনার বৃহৎ গুণ,—তিনি কাব্যের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যানে অসমর্থ হলেও কাব্য বিশ্লেষণে সামান্য লক্ষণে পৌঁছাতে পারতেন, এবং সামান্য থেকে আর বিশেষে অবতরণ করতেন না। তাঁর উত্তরসূরীবৃন্দ (রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষীদের কথা মনে রেখেও) কেউই এ বিষয়ে

সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে Neo-Hinduism বা নব্য হিন্দুত্বের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তার ফলেই পরবর্তী কালের সমালোচকদের সাহিত্যবিচার অথবা সমালোচনা একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ কাব্য বাগর্থ সম্পৃক্ত যুগ্মক অথচ একক সৃষ্টি বলে প্রতিভাত হল না। বাক্ থেকে অর্থের প্রাধান্য হল অধিকতর এবং অর্থ বলতেও লেখকেরা বিষয়বস্তু বা হিন্দুর আদর্শের জয়গান বুঝেছিলেন। আবার যেখানে এই ধর্মান্ধতা নেই, সেখানেও সাহিত্য আলোচনা শুধু বিষয়বস্তুর বর্ণনা অথবা তার নিন্দা-প্রশংসায় পর্যবসিত হয়েছিল।[৩০] অবশ্য এই তত্ত্ব প্রসারে বঙ্কিমের প্রভাব ও শিক্ষার অবদান স্বীকার্য; কারণ তিনি অনুবর্তীদের কবিকৃতির বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যের বিষয়গৌরবের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। তবে পরবর্তী কালের সাহিত্য অনুরাগীদের মধ্যে কেউই তাঁর অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন না। নীতিবাগীশের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, শুচিবায়ুগ্রস্ত হিন্দুয়ানী মনোভাব, আধ্যাত্মিক চিন্তার অনুধ্যান এবং বিষয়বস্তুর স্থূল বিচারের মধ্যে সাহিত্য সমালোচনার উপাদান অনুসন্ধান—সমস্ত কিছু একত্রযোগে তাঁদের আলোচনাকে অর্থহীন বাচালতায় (senseless maunderings) উপাস্তে দাঁড় করিয়েছে মাত্র। ভাব ও চিত্রের স্পষ্টতায় এবং ভাষার স্বচ্ছতায় শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য, জীবনতত্ত্বের অনুসন্ধান ও অ-লৌকিকতার রহস্য উদ্‌ঘাটন যে সম্ভব নয়, বোধহয় এই বোধ ও বোধিচেতনা তাঁদের জন্মায় নি অথবা তাঁরা স্বীকার করতে আগ্রহী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার বিপক্ষে যাঁরা অভিযান চালিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই মনে-প্রাণে ছিলেন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁরা সাহিত্যে নীতিবাদের প্রসার ও হিন্দুয়ানীর প্রচার চেয়েছিলেন। এমন কি তাঁদের সাহিত্য সমালোচনার গুরু বঙ্কিমচন্দ্র যে 'নব্য হিন্দুত্ব' মতবাদ এবং জাতিবৈর ভাবাদর্শকে আপন সমালোচনায় প্রকট হতে দেন নি, তার সংক্রমণ তাঁর ভাবশিষ্যদের মধ্যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও যতীন্দ্রমোহন সিংহের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং বিপিন চন্দ্র পালের আদর্শগত পার্থক্য আছে। এক গোষ্ঠী দেশীয় আদর্শের উপর জোর দিয়েছিলেন (অবশ্য যতীন্দ্রমোহন সিংহের সাহিত্যগুরু ছিলেন রুশ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক টলস্টয়) ও অপর গোষ্ঠী বিদেশী সাহিত্যাদর্শকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি বা চেষ্টা করেন নি। তবে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দুটি সামান্য লক্ষণ আছে: উভয়েই সাহিত্যে ভাব ও বিষয়বস্তুর উপরে জোর দিয়েছিলেন এবং সাহিত্য যে সূক্ষ্ম শিল্প, অর্থ যে শব্দাশ্রিত—সে কথা তাঁরা মনে করতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য নীতি শিক্ষা দেওয়া ও সৌন্দর্য সৃষ্টির স্থান তার

নীচে। যে অনপেক্ষতা সাহিত্যে সমালোচনার প্রধান গুণ, তা উভয় সম্প্রদায়ের কারোরই ছিল না।"[১]

এছাড়া আধুনিকতার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য যে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট, সাহিত্য-নীতির এই প্রশ্ন অনেকটা বিভ্রান্তিকর বলে মনে করা যেতে পারে। নীতির আদর্শ যুগে যুগে দেশ ও কালে ভিন্ন অর্থ বহন করে। ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ ও সাক্ষ্য আছে। সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন অপরিহার্য। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি, অথচ বাস্তব জীবনের স্থূল, পঙ্কিল ও নোংরা আচরণকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকার করলে সাহিত্য পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে এবং প্লেটোর eldos বা আইডিয়া ধর্মের অনুবর্তী হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার যে অভিযোগ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এনেছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তার কোন সারবস্তা ছিল না। নীতিবাদ ও গোঁড়ামির ঠুলি চোখে এঁটে তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্য ও আধুনিকতার পরিমাপ করেছিলেন বলে, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। বিপিনচন্দ্র পালেরও বস্তুতন্ত্রহীনতা ও মায়িকতার অভিযোগের মূলে ছিল সংস্কারাবদ্ধ জীবনদৃষ্টিতে দেখা সংকীর্ণ পৃথিবী। সাহিত্যচিন্তা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই Neo-Classical নীতিকে অনুসরণ করে সাহিত্য বিচিন্তায় কলাকৈবল্যবাদকে (Art for Art's Sake) অস্বীকার করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অ্যারিস্টটল থেকে ডক্টর জনসন পর্যন্ত যে ক্ল্যাসিকাল সমালোচনা পদ্ধতি প্রচলিত, তাকেই অনুসরণ করেন। বিশেষ-ভাবে ম্যাথু আর্নল্ড ছিলেন তাঁর আদর্শস্থল। সুরেশচন্দ্র ম্যাথু আর্নল্ডের মতো বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য—মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ও ভাবসম্পদ সমৃদ্ধ করা, বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ, আত্মলীন ও গীতি কবিতার নির্বাসন, অতীত আদর্শ ও ধর্ম বিশ্বাসকে ফিরিয়ে এনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ (spasmodists) গীতি কবিদের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সমালোচনা করা। সুরেশচন্দ্র জীবনের নীতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তিনি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শুচিতা, সত্য, গাম্ভীর্য ও ভাষার গৌরবের উপর জোর দিয়েছিলেন। যে কাব্য নীতিবিরোধী তা জীবনবিরোধী। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সাহিত্য নীতির সম্বন্ধে উদাসীন, তা জীবন সম্বন্ধেও উদাসীন। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো তিনি মনে করতেন, 'Poetry is the criticism of life'—কবিতা জীবনের সমালোচনা। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হবে বাস্তব জীবনে যা ঘটে বা আদর্শ জগতে যা ঘটা উচিত, তারই বিশ্লেষণ করা।

সুরেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে জীবনের সমালোচনার অর্থ আদর্শ নৈতিক জীবনের অভিমুখে যাত্রা। তাই নীতিকে নির্বাসিত করে কলাকৈবল্যবাদের উপাসনা অন্যায় ও নৈতিক অপরাধ।

ক্ল্যাসিক সমালোচনার বুদ্ধিদীপ্ত রীতি ও সংযমাদর্শ তাঁর বিচারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এর জন্য তিনি রোম্যান্টিকতার গগনবিহারী কল্পনাকে প্রাধান্য দেন নি। সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার বৈশিষ্ট্য বিচার করলে মনে হবে: "অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকেরা শেক্সপীয়রের সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতেন, কিন্তু তাঁহার সুদূরপ্রসারী কল্পনার সঙ্গে ইঁহাদের বুদ্ধি পক্ষবিস্তার করিতে পারিত না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রবীন্দ্রসমালোচনা খানিকটা এই ধরণের; মনে হয় ড্রাইডেন কিংবা পোপ বা তাঁহাদের অনুবর্তী কেহ সেক্সপীয়রের সমালোচনা করিতেছেন।"[৩২] ফলে, 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদকের 'রবীন্দ্রনাথের 'পিপাসী' ও 'মানসী' কবিতার যে সমালোচনা, তাতে তাঁর সীমিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৩] 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সুরেশচন্দ্রের যে অভিযোগ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পাপচিত্র আঁকার জন্যই পাপচিত্র এঁকেছেন, তাতে মনে হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তা ও নীতিবোধ সম্পর্কে কোনরূপেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। যতীন্দ্রমোহন সিংহের অভিযোগের যে সমস্ত কারণ ও পর্যায়ক্রম আমরা গ্রহণ করেছি, তার মূল কথা হচ্ছে —রবীন্দ্রনাথ সমাজের পূতিগন্ধময় নারকীয় চিত্র এঁকেছেন এবং মানবমনের যে সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা প্রকাশযোগ্য নয়, তাকে প্রকাশিত করে সমাজের নৈতিক পরিবেশ ও আবহাওয়াকে কলুষিত করেছেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে চেয়ে মনে হয় প্রাণকে অস্বীকার করেছেন।

বিপিনচন্দ্র পালের রবীন্দ্রবিরোধিতার অন্তরালে বিশ্লেষণী আলোক নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে তাঁর সমালোচনার মানসপুষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রই খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যচিন্তা ছিল জ্ঞানকাণ্ডের (Literature of Knowledge) অন্তর্গত। উদ্দেশ্যবাদকে তিনি গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন বলে কোনদিনই 'কলাকৈবল্যবাদ'কে (Art for Art's Sake) সমর্থন করেন নি। সাহিত্যবিচার ও সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন Neo-Classicism মতবাদের অনুপন্থী। বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও সামাজিক মানুষের নৈতিক কল্যাণসাধন। তাঁর উপন্যাস 'শোভনা' ও 'রাগের পথে' এবং ছোটগল্প গ্রন্থ 'সত্য ও মিথ্যা'তে (পাঁচটি গল্পের সংকলন—'লাবণ্য', 'লণ্ডনে নন্দলাল', 'মৃণালের কথা', 'কল্যাণী' ও 'বাৎসল্যের আতিশয্য') 'কলাবৈকল্যবাদ'সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। যদিও 'রাগের পথে' উপন্যাসে ভবানীপ্রসন্ন ও বাল্যবিধবা রাধারাণীর

প্রেমে আধুনিকতার অভাব ছিল না এবং 'লাবণ্য' ও 'কল্যাণী', ছোটগল্পে নারীর সমাজনিন্দিত প্রেমে আকর্ষণ ও জৈব তৃষ্ণার প্রতি তীব্র লালসা অনুভব, লেখক বিপিনচন্দ্র পালের সদাসতর্ক সচেতন মনের ফাঁক দিয়ে ক্ষীণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তবুও তাঁর সৃজনীকল্পনা সর্বদা উদ্দেশ্যবাদের দ্বারা রূপায়িত এবং অনুভূতির প্রতি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছে মানুষের প্রতি একনিষ্ঠ কল্যাণ চিন্তা। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর 'বস্তুতন্ত্রহীনতা' ও 'মায়িক' চিন্তার যে অভিযোগ, তাতে এই ভাবাদর্শই কার্যকরী হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেও তিনি রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না। বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তাও এই মার্গ অনুসরণ করেছিল। যদিও তিনি মূল তত্ত্বকে নিজের মত করে গড়ে পিটে নিয়েছিলেন, তবুও বঙ্কিমের প্রভাবকে কখনও অস্বীকার করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবানুকারিতাকে বিপিনচন্দ্রের 'বস্তুতন্ত্রতা' বলে অভিহিত করা যায়। তাঁর মতে সাহিত্য স্বভাবের অনুসরণ করবে এবং সাহিত্যিকের আপন অভিজ্ঞতার অনুসারী হবে। যে সাহিত্যে এই বস্তুতান্ত্রিকতা নেই, তা মনোহরণকারী ও মনোলোভা হলেও সৎ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তা মায়িক অথবা অলীক। তিনি একথাও বলেছেন যে কাব্য ও সাহিত্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হলেও তা যদি হুবহু বাস্তবের অনুকরণ করে, তবে 'বস্তুতন্ত্রতা' বাস্তবের দাসত্বে পরিণত হবে এবং কল্পনার স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবে। মনে হয়, সাহিত্যসৃষ্টির form-এর আলোচনায় ও অনুভাবনাতে তিনি ইংরেজ কবি কোলরিজের imagination মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর এও বিশ্বাস ছিল যে কবিকল্পনা একাধারে বস্তুযুক্ত ও বস্তুভারমুক্ত। বস্তুকে অবলম্বন করে বিকশিত হলেও সে বস্তুকে অতিক্রম করে যায়। তবুও তিনি ক্ল্যাসিক্যাল নীতিবাদের মতানুসারী ছিলেন। বিপিনচন্দ্র অ্যারিস্টটলের মতবাদকে কিন্তু স্বীকার করতে পারেন নি যে, কবি যা ঘটে তাকে অনুকরণ করেন না ; যা ঘটতে পারে অথবা ঘটা উচিত ছিল, তারই অনুকরণ করেন। তবে তাঁর সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্যবিচার মার্গ উদ্দেশ্যবাদিতাকে অবলম্বন করেছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'মরণে জয়', 'আঁধার ঘরে' এবং 'হাসির দাম'[৬৪] —তিনটি কথানাট্য নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল, তাতে বিপিনচন্দ্র পাল আদর্শবাদিতাকে অবলম্বন করে 'ধর্ম-নীতি ও আর্ট' প্রবন্ধে লিখেছিলেন ঃ "আর্ট ধর্ম প্রচার করে না, মত প্রতিষ্ঠা করে না, সমাজ-সংস্কার বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যাহাতে ব্যাহত হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখে না। এ সকল কথা মানিলাম। কিন্তু আর্টের

নিজের একটা লক্ষ্য আছে, এই সকল মামুলি কথা দিয়া তার বিচার আলোচনার মুখ বন্ধ করা যায় না।...কবির প্রত্যেক শব্দ যোজনার অন্তরালে সমগ্র চরণটির, প্রত্যেক চরণটির সংস্থানের মধ্যে সমগ্র কবিতাটির প্রতি কি লক্ষ্য থাকে না? আর ঐ সমগ্র কবিতাটি যে কি তাহা কি এই শব্দ ও চরণ বিন্যাসের মধ্যেই প্রকাশ পায় না? নাট্যকার, চিত্রকর, ভাস্কর সকল রসস্রষ্টা বা আর্টিস্ট সম্বন্ধে কি ও কথা খাটে না?"[৩৫] বিপিনচন্দ্র সৌন্দর্যকে সকল আনন্দের উৎস হিসাবে স্বীকার করতে পারেন নি। যা কিছু প্রাণে আনন্দ বিধান করে, তাই সুন্দর বলে গৃহীত হতে পারে, এ কথা তাঁর পক্ষে স্বীকার করা অসম্ভব ছিল। রূপে জগৎ মুগ্ধ হলেও সেই রূপজ আনন্দ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এখানে তিনি অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব বা 'কান্তিকৈবল্যবাদে'র (Art for Aesthetic's Sense) এর নিকটবর্তী হয়েছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথও সৌন্দর্য চেতনার অন্তরালে সত্য-শিব ও মঙ্গলের আরাধনা করেছিলেন।

সাহিত্যচিন্তাতে রবীন্দ্রনাথ ঐক্যের উপর খুব জোর দেন—এবং এই ঐক্যচিন্তা ছিল সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে সত্যান্বেষণ। তিনি রোম্যান্টিক ইংরেজ কবি কীটস্-এর মতো 'Truth is beauty, beauty truth' সূত্রের উল্লেখ বহুবার করেছেন। মনে হয় তাঁর সাহিত্যসাধনার এটাই ছিল বীজমন্ত্র। সৌন্দর্যের পূজাই কবির কর্তব্য—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস। সংস্কার ও সামাজিক নিয়ম-নীতি অথবা জীবনের সৌন্দর্য বিকাশের পরিপন্থী কোন ঘটনাকে অধিকতর প্রাধান্য দিতে তিনি কখনও উৎসাহ দেখান নি। তাঁর মতে আদর্শবাদিতার বস্তুভার কর্ম ও চিন্তার মধ্যে উদ্ভাসিত জীবন-উৎসবের বাঁশির সঙ্গীতকে নিষ্ফল কামনা ও আত্ম-বঞ্চনার অগৌরবে ভরিয়ে দেয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা বা সাহিত্যপ্রকাশ দেশ-কাল ও সমাজের কাছে কোন দায়ভাগ বহন করে নি। তিনি জীবনকে সমগ্র ও অংশের অবিভাজ্য রূপ হিসাবে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ও 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য ছোট-গল্পগুলিতে যে সমাজনিষিদ্ধ ব্যক্তিপ্রেমের ছবি এঁকেছেন, তার অবস্থিতি অথবা অস্তিত্ব—ঘটনা সমূহের খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণের পরম্পরার মধ্যে নিহিত ছিল না, সম্পূর্ণ মনোবিশ্লেষণের অপরূপ ভঙ্গিমার উপর ছিল তার প্রতিষ্ঠা। সমাজের ধ্রুব নীতি-বোধের দাবিতে নয়, জীবনপিপাসার অবারিত কামনা যা 'পুষ্পে কীট সম' হৃদয়ে জেগে থাকে শাশ্বতভাবে, তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের চরিত্র ব্যাখ্যাতে আধুনিক জীবনের জটিল গ্রন্থীর বন্ধনমুক্তির প্রয়াসের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন নর-নারীর ব্যক্তি সম্পর্কের গূঢ় রহস্য চিন্তাজাল এবং আবিষ্কার

করেছিলেন ব্যক্তিত্বের অন্তরালে চেতনাপ্রবাহের মধ্যে অভিসঞ্চারী ভাব-কল্পনা এবং মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা।

রবীন্দ্রবিরোধীরা এ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁরা সাহিত্যসমালোচনাতে জগতের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনের যোগ, বুদ্ধির যোগ দেখেছিলেন—আনন্দের যোগ দেখতে পাননি। তাই এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় প্রয়োজন ও সমাজসাপেক্ষতার মধ্যে সাহিত্যবিচিন্তাকে নিবিষ্ট করেছিলেন। যে সৌন্দর্যচেতনা প্রয়োজন ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী থেকে জীবনকে মুক্তি দিতে চায় এবং অন্য দিকে মুক্তি পিপাসু মন নিয়ম-নীতির গুরুভারে নিপীড়ত হলে, জীবন-বিকাশ ব্যর্থতার ক্লান্তিভারে শুকিয়ে পড়ে,—জীবনসত্যের এই দিকটি তাঁরা সযত্নে উপেক্ষা করেছিলেন। নীতিবাদ ও সংস্কারচিন্তার বেড়িতে জীবনপথ সত্যের পুঁজি হারিয়েছিল। সৌন্দর্য যে প্রয়োজনের বাড়া সকল ঐশ্বর্যের পটভূমি এবং আমাদের জীবনের স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য যে প্রেমের গভীরতার মধ্যে মুক্তি পায়,—তার পরিচিতি বা অনুসন্ধান রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী লাভ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেন যে বস্তুজগৎ বা জ্ঞানের জগৎ কোন স্থানেই মনের প্রকৃত মুক্তি ঘটে না। বাস্তব প্রত্যক্ষ বলেই বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু অনেক স্থলেই মানুষের সম্বন্ধে যাকে আমরা বাস্তব বলি, তার বেশি ভাগই আমাদের অ-প্রত্যক্ষ। বুদ্ধিনিষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা যে অধিকার পাওয়া যায় তা অসম্পূর্ণ। বুদ্ধি বা জ্ঞানের কাছে আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না, তার ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু জগতের সঙ্গে যেখানে আনন্দের যোগ বা শুধু প্রকাশ করবার ইচ্ছার যোগ, সেখানে নিজের ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়—বুদ্ধির শক্তি বা কর্মের শক্তিতে উপলব্ধি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ একেই সাহিত্যে 'বাস্তব' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যের মধ্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাওয়া যায়, যখন অন্তরের মধ্যে তার নিবিড় উপলব্ধি ঘটে এবং তা জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। কবিগুরুর ভাবনায় এটাই প্রকৃত বাস্তব। ফলে বিরোধী গোষ্ঠী, বিশেষভাবে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাস্তবতা অভাবের যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার সঙ্গে কবির চিন্তার প্রকৃতিগত কোন মিল নেই।

বক্ষ্যমান আলোচনার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠীরা সাহিত্যবিচার ও আলোচনাতে Neo-Classical ভাবধারাকে বরণ করেছিলেন

চিন্তার খোরাক হিসাবে। বিশেষভাবে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ম্যাথু আর্নল্ডের চিন্তাধারার অনুগামী ছিলেন। ফলে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল—কাব্য জীবনের সমালোচনা বা criticism of life। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচিন্তাতে 'আইডিয়া'কে গৌণ করে দেখেছেন। সাহিত্যে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এ কথা তিনি স্বীকার করতেন না। তিনি উল্লেখ করেছিলেন: "বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক।...সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই। ...যদি কোন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যের অন্তর্গত করতে চায়, তবে তাকে আমাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আমাদের সন্দেহ বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত করে আমাদের মানসিক প্রাণপদার্থের মধ্যে নিহিত করে দিতে হবে।... সত্য যখন মানব জীবনের সঙ্গে মিশে যায় তখনই সাহিত্যে ব্যক্ত হতে পারে।"[৬৬] অর্থাৎ তাঁর ধারণা উদ্দেশ্যবাদের স্তূপের মধ্যে মানুষের প্রাণের রূপ সর্বাংশে চাপা পড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্মকে 'লীলা' বলে অভিহিত করেছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টি জীবনের নিছক অনুকরণ বা অপর বস্তুর নকল নয়,—পরন্তু সৃষ্টি স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। এর কোন উদ্দেশ্য নেই। কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধিকেই তিনি 'লীলা' বলে মনে করতেন। উপকারিতার পরিমাপের উপর সাহিত্যের সত্যতা ও সৌন্দর্যের পরিমাণ নির্ভর করে না—এই ছিল তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত: "আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এই প্রশ্নের কোন অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের হিতসাধন হয় কিনা।"[৬৭]

সাহিত্যবিচার ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্রনাথকে 'কলাকৈবল্যবাদ' বা Art for Art's Sake-এর সমর্থক বলে মনে করা যেতে পারে। আমাদের মনে হয় এই দিকে তাকিয়েই যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'কলাকৈবল্যবাদে'র অভিযোগ এনেছিলেন। অবশ্য যতীন্দ্রমোহন সিংহের আদর্শগুরু ছিলেন লিও টলস্টয় ও বিচারের মাপকাঠি ছিল তাঁর নন্দনতত্ত্বের আলোচনা—'What is Art' গ্রন্থ। তিনি সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও উদ্দেশ্যবাদিতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করেছিলেন। সে বিচারে যতখানি জ্বালা ছিল, ততখানি মনন ছিল না। তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতার পরিমাপ তিনি সৌন্দর্যহানির পরিমাণের মধ্যে করেছেন—কোন নৈতিক অথবা সামাজিক দায়-দায়িত্বের বেদীতে নয়। প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জন দিলেও তিনি কল্যাণরূপে ও মঙ্গলরূপে তাকে অবশ্য

আহ্বানও করেছেন। তিনি সৌন্দর্যের মধ্যে মঙ্গল এবং কল্যাণকে পূজা ও বন্দনা করেছেন। যে সৌন্দর্য শুভদা, বরদা ও কল্যাণময়ী নয়, তাকে তিনি বর্জন করেছেন নিষ্ঠুরভাবে। সুইনবর্ণ প্রভৃতির Gospel of Beauty বা সৌন্দর্যের ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করে বলেছেন: "সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্যে ধিক্ থাক্। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।"[৬৮] সুতরাং সৌন্দর্যের স্থান ও মাত্রা প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে মঙ্গল ও কল্যাণের উচ্চ বেদীতে—স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য থেকে সৌন্দর্যবোধ প্রেমের মধ্যে মুক্তি পায়। ত্যাগের মহান্ ঐশ্বর্যের মধ্যে কল্যাণ ও সৌন্দর্যের প্রকৃত সম্মেলন। 'চোখের বালি' উপন্যাসের সমাপ্তিতে বিনোদিনীর যে উপলব্ধি, তা প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের গৌরবময় ভূমিতে আত্মত্যাগের বিশালতায় সৌন্দর্যবোধের দীপ্তিময় প্রতিষ্ঠা। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেও সেই এক কথা। নিখিলেশ তার অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বিমলাকে জীবনসৌন্দর্যের মূল তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছে। বিমলা যতদিন সৌন্দর্যের আভ্যন্তরীণ কল্যাণ ও মঙ্গলের সমন্বয়ীভূত শ্রেষ্ঠ আদর্শকে প্রকৃত ত্যাগের মধ্যে উপলব্ধি করতে না পেরেছে, ততদিন মানসদ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে তার মুক্তি ঘটেনি। সন্দীপের মঙ্গল ও কল্যাণ নিরপেক্ষ সৌন্দর্যবাদী ভাবধারা বিমলাকে করেছিল চঞ্চল ও উৎকেন্দ্রিক জীবনের অভিলাষী। পরিশেষে মঙ্গল ও কল্যাণময় সৌন্দর্যবোধ বিমলাকে স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছিল প্রেমের বিশালতার মধ্যে। বিমলার সর্বশেষ আত্মস্বীকৃতিতে এই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে: "চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো, সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগরসঙ্গমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। ...আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের মধ্যে বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সামঞ্জস্যহীন দ্বন্দ্বচিত্রের কথাই উল্লেখিত হয়েছে। জীবনের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা ঘরে বাইরের ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষকে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে

হলে সৌন্দর্যচেতনাকে কখনই অস্বীকার করা চলে না। কর্মভাববিলাসের বাহ্যিক প্রয়োজন এবং জীবনপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অকৃত্রিম কৃচ্ছ্রতা সাধন যে কিভাবে পরিশেষে আত্মঘাতের সীমান্তে দাঁড় করিয়ে দেয়, ভূপতি ও চারুলতার দাম্পত্য জীবনের করুণ পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় তা বিশ্লেষণ করেছেন। বস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতার মধ্যে মানুষের জীবনের যে অসম্পূর্ণতা আছে, সে দিকটিও এই 'নষ্টনীড়' ছোট গল্পে আমরা দেখতে পাই। আর এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আধুনিক কালের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। ভূপতির অন্তিম মনোবিশ্লেষণঃ "যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইঁটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?" সৌন্দর্যহীন দায়িত্ব পালনের অনিবার্যতা যে কত ক্লান্তিকর, রবীন্দ্রনাথ তাকেই যেন এখানে দেখিয়েছেন।

'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা'য় উদ্‌গ্রীব যতীন্দ্রমোহন সিংহ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বের দিকটি একেবারেই বোঝেন নি। বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের সৌন্দর্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগতকে তার আনন্দের দ্বারা অধিকার করবার ইতিহাস, মানুষের সাহিত্যে যা আপনাআপনি রক্ষিত হচ্ছে,—তা উপলব্ধি করার সূক্ষ্ম চেতনা তাঁর ছিল না। এমন কি তাঁর সাহিত্যগুরু রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের লেখাতে আপাত শুচিহীনতা ও জীবন-ব্যভিচারের নানারূপ নিষিদ্ধ কর্মের মধ্যে যে সৌন্দর্যবোধ বিলসিত হয়ে উঠেছে, তাকেও বোধহয় তিনি উপলব্ধি করেন নি। যিনি শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' নিয়ে এত নিন্দনীয় সমালোচনা করলেন, তিনিই কিভাবে 'রেজারেকশন' উপন্যাসের স্রষ্টাকে সাহিত্যগুরু পদে বরণ করে, তাঁরই নির্দেশিত পথে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষায় আগ্রহী হলেন, তা স্বাভাবিকভাবে আমাদের বিস্মিত করে।

সাহিত্য রচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির অভিযোগ শরৎচন্দ্রের উপরেও বর্ষণ করা হয়েছিল সমান গতিবেগে। শরৎচন্দ্র যদিও 'কেবল একজন আধুনিক সাহিত্য সেবকের নিতান্তই নিজের কথাটাই' বলেছেন, তবুও তাঁর ভাষণগুলির মধ্যে আধুনিক সাহিত্য চিন্তার মূল সুর ও উদ্দেশ্যটি প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত সহজ কিন্তু বলিষ্ঠ ভাবে। যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও অন্যান্য বিপক্ষবাদী সমালোচকেরা যখন নিন্দার স্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলছিলেন, তখন তিনি তিনটি ভাষণ দেন। 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' (আষাঢ়, ১৩৩০), 'সাহিত্য ও নীতি' (আশ্বিন, ১৩৩১) এবং 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' (চৈত্র, ১৩৩১)—বক্তৃতাগুলি পরবর্তী কালে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তিনটি ভাষণই ছিল তাঁর এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে সকল সওয়ালের উপযুক্ত জবাব।

এর সঙ্গে শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যসরণীর প্রকৃত রূপ ও চিন্তার বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরেছিলেন অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে।

প্রথমেই যে সমস্ত সমালোচকের দল আধুনিক সাহিত্যকে আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা, অচ্ছুৎ এবং জীবনসম্পর্কহীন বলে অভিহিত করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র বলেন: "বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সত্যকার পরিচয় যদি তাঁহাদের থাকিত ত জানিতেন, যাহাকে তাঁহারা আবর্জনা বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন, সেই আবর্জনাই সকল সাহিত্যের বনিয়াদ, তাহারাই সাহিত্যের অস্থি-মজ্জা।...আবর্জনার বালাই যেদিন দূর হইবে, সেদিন যাহাকে তাঁহারা সার বস্তু বলিতেছেন, সেও সেই পথেই অন্তর্হিত হইবে। আবর্জনা চিরজীবী হইয়া থাকে না, নিজের কাজ করিয়া সে মরে, সেই তাহার প্রয়োজন, সেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু সেই আবর্জনার ভার বহিতে যেদিন দেশ অস্বীকার করিবে সেদিন আনন্দ করিবার দিন নহে, সেদিন দেশের দুর্দিন।"[৯]

আবার এও দেখেছি যে সংরক্ষণশীল পন্থীরা, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবিচিন্তা ও বিশ্লেষণের অভ্যন্তরে জীবন ও প্রেম সম্বন্ধে যে বৃহত্তর মানবিক দিকটি আত্মগোপন করে আছে, তাকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁরা কেবলমাত্র তাঁর নীতিবাদী আদর্শ ও Neo-Hinduism আদর্শবাদকে সাহিত্য বিশ্লেষণের ধ্রুব পন্থা বলে মনে করেছিলেন। এরই পশ্চাৎপটে তাঁরা আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সমালোচনা ও নিন্দা করেন। সাহিত্যশাস্ত্রীদের আতঙ্কের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন: "বঙ্কিম-সাহিত্য ডুবিবার নয়," তবে আধুনিকরা যে পূর্বধারাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এবং অবজ্ঞায় স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষে বাধাবন্ধন হারা হয়ে উঠেছে—এ কথা তিনি কোন ক্রমেই স্বীকার করেন নি। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অকপটে বলেন: "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাংলা-সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি ত সে তাঁহার মর্যাদা-হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছুই নাই।"[১০]

প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসদুটির পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সাহিত্য চিন্তার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের নতুনত্বটুকু বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ নির্ধারিত হয় অবশ্যম্ভাবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে; তাই বর্তমান সাহিত্যসেবীদের ধারণাতে বিচার্য হচ্ছে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেমে তাদের জীবন ও চরিত্রের যে পরিণতি দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ ঠিক বজায় আছে কি না! ফলে আধুনিককালে যে প্রশ্ন ওঠে, তা অবশ্যই বিচার ও বিশ্লেষণ মার্গের: "শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মান সম্ভবপর কি না"[১১] এই কার্যকারণ শৃংখলাই বর্তমান কালের সাহিত্যের পক্ষে বড় কথা। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসকে নিয়েও শরৎচন্দ্রের যে সমালোচনা, তাও আধুনিকতার বিশ্লেষণী চিন্তার পথবাহী। এই উপন্যাসের নায়িকা রোহিণীর মৃত্যুর সমালোচনা তিনি করেছিলেন। রোহিণীর প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি তা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সাহিত্যচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করাই কর্তব্য। নীতিবাদীদের চিন্তায় রোহিণীর মৃত্যু যেখানে পরম স্বস্তির নিদর্শন হিসাবে নন্দিত, সেখানে শরৎচন্দ্রের 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' ভাবনা জীবনের এরূপ পরিসমাপ্তিকে সহ্য করতে পারেনি। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন: "তাহার (রোহিণীর) মরার সম্বন্ধে আধুনিক লেখক ও পাঠকগণের যে আপত্তি আছে তাহা নয়। কিন্তু আগ্রহও নাই। বস্তুতঃ এ-সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন। পাপের শাস্তি না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না, অতএব শাস্তি চাই-ই। এই চাই-ই'র জন্য গ্রন্থকারকে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সেইখানেই আমাদের বড় বাধা। ... পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। রোহিণী পাপিষ্ঠা, এবং যে পাপিষ্ঠার প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, তাহারও প্রতি কিন্তু এত বড় অবিচার করিতে আমাদের হাত উঠে না। সেকাল ও একালে এখানেই মস্ত বড় ব্যবধান। বিধবা রোহিণীর দুর্ভাগ্য যে, সে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার দুর্বুদ্ধি তাহার দুর্বলতা,—কিন্তু পাপের সঙ্গে এক করিয়া, ইহাদের একযে ছাপ মারিয়া দিবার যখন অনুরোধ আসে, তখন সে অনুরোধ রক্ষা করাকেই আমরা অকল্যাণ বলিয়া মনে করি।"[১২] কিন্তু শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন, বঙ্কিম-সাহিত্যের শাশ্বতী আয়ুষ্কালের প্রকৃত অরূপ-মাধুরী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বঙ্কিমচন্দ্র চির আধুনিক, চির নূতনের দিশারী—কারণ তাঁর সৃষ্টিসত্তার মধ্যে

বৃহত্তম দিকটি সর্বদাই প্রেম ও জীবনের দাবিকে মেনে নিয়েছে। শরৎচন্দ্র তাই স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি যে: "যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয় দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রু-পরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে; মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেচে।"[৭৩] 'বড় আমি' ও 'ছোট আমি' এই দুয়ের দ্বন্দ্ব বঙ্কিমসাহিত্য এবং বোধ হয় বঙ্কিমজীবনের আভ্যন্তরীণ ট্র্যাজেডি এবং এই ট্র্যাজেডির বিয়োগাত্মক অশ্রুজল তাঁর সমস্ত উপন্যাসের গল্প-কাহিনীতে পরিব্যাপ্ত। জীবন-রস-রসিক শরৎচন্দ্র এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বঙ্কিম-বন্দনায় তিনি কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু যে নীতিবাদকে নিয়ে রক্ষণশীল সমালোচকেরা দুন্দুভিনিনাদে মুখরিত হয়েছিলেন, সেখানেই ছিল তাঁর কঠোর আপত্তি। নীতিধর্মের 'চক্রেস্পৃষ্ট আঁধারে বক্ষফাটা' জীবনের ক্রন্দনে শরৎচন্দ্র অভিভূত হয়েছিলেন, আর দুঃখিত হয়েছিলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর জীবনপরিণতির উপায় উদ্‌ভাবন দেখে। তাই তিনি বলেন: "মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে। হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে, আর তার সঙ্গে সত্য সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।"[৭৪]

যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের রচনার নীতি-হীনতার যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার ধিক্কার ছিল art-এর নয়, এ ধিক্কার ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের, ছিল প্রথান্ধ অনমনীয় জীবনবিমুখ নীতি অনু-শাসনের। কিন্তু "এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি!"[৭৫] 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র একথা বলেন।

শরৎচন্দ্র কোনদিন Art for Art's Sake বা 'কলাকৈবল্যবাদ'কে সাহিত্য বিচিন্তার নীতি হিসাবে সমর্থন করেন নি। এ বিষয়ে তিনি বলেন: "সত্যকার যা ঐশ্বর্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য-প্রয়োজনের অতিরিক্ত। ··· এই ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি কোথায়? সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায়,—art, morality এবং ধর্মে। ··· যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়, ধর্ম নয়। Art for Art's Sake কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে কিছুতেই তা immoral

এবং অকল্যাণকর হতে পারে না ; এবং অকল্যাণকর এবং immoral হলে Art for Art's Sake কথাটাও কিছুতে সত্য নয় ; শত-সহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়। মানবজাতির মধ্যে যে বড় প্রাণটা আছে, সে একে কোনমতেই গ্রহণ করে না।"[৭৬]

এ ছাড়াও শরৎচন্দ্র অন্যদিক থেকে 'কলাকৈবল্যবাদ'কে সংশোধন করেছেন। সাহিত্যের ধর্মকে শুধু কল্যাণচিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে তিনি চান নি। সাহিত্য যদি জীবনের সমস্যা প্রতিফলিত না করে, তবে তার প্রকৃত মূল্য হ্রাস হয়ে যায় অনেকখানি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য মীমাংসাতে কোন স্থির অনুশাসন না থাকলেও, তাঁর সাহিত্যচিন্তা অনেকাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শকে বরণ করেছিল। তবে তিনি যে সাহিত্যকে জীবনের প্রকৃত অনুলিপি (প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography নয়) হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন, তাতে কোন শুচিবাই মনোভাবনাকে স্থান দেন নি। তাঁর চিন্তাতে সাহিত্যে ভাল-মন্দ, সুনীতি-দুর্নীতি দুই-ই আছে, কারণ এরা জীবনেরই উপাদান এবং সাহিত্যের মূলধন—এই দুই উপকরণের মিশ্রণেই মানুষের জীবন। শরৎচন্দ্র 'কলাকৈবল্যবাদ'কে স্বীকার না করলেও সাহিত্যকে বন্ধনমুক্ত করতে চেয়েছিলেন, অ-সত্য ও অ-মঙ্গলের অনুপ্রবেশকে চেয়েছিলেন রোধ করতে।[৭৭] তিনি 'মঙ্গল' বলতে সমাজ অনুমোদিত শুভকে ও 'সত্য' শব্দ ব্যবহারিক জীবনের ঘটনাগত সত্য অর্থে প্রযুক্ত করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের বিচিন্তাতে, জীবনের যে সত্য অভ্যন্তরে নিহিত আছে, তার প্রকাশের মাধ্যমেই মঙ্গল (জাতি ও জীবন উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে) সাধন করা সম্ভব। বাইরে যাকে অসুন্দর বলে মনে হয়, তার যথাযথ বর্ণনাকে বীভৎস ও কদাকার বলে চিহ্নিত করলেও অনেক সময় তার অভ্যন্তরস্থিত সত্য প্রকাশিত হয় না, আবার অপর দিকে বাইরের যে সৌন্দর্য থাকে তা প্রকৃতপক্ষে মুখোশ মাত্র, আবরণ খসে পড়লে কুৎসিত রূপটি বেরিয়ে আসে। শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী চরিত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতে এই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাকে প্রয়োজনবোধে স্মরণ করতে পারি। সাহিত্যের প্রকৃত কাজই তাই—"সে কয়লার মধ্য হইতে হীরা মানিক তুলিয়া আনে, কয়লাকে ধুইয়া মুছিয়া তাহার মধ্যে যে মানিক লুক্কায়িত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত করে। এই অর্থেই রসাস্বাদ সত্যের স্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; গৌণ অর্থে এই সাক্ষাৎকারকেই বলা হয় অভিব্যক্তি বা রূপান্তরীকরণ। এই অর্থেই বলা যাইতে পারে, 'Truth is beauty, beauty truth' অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা সুন্দর, যাহা সুন্দর তাহাই সত্য—এবং তাহাই শিব।"[৭৮]

বাংলা কথাসাহিত্যে সাহিত্য মীমাংসাতে কখনই নীতিতত্ত্ব অস্বীকৃত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাদিতার স্পষ্ট প্রবক্তা ছিলেন, তবে নীতির যূপকাষ্ঠে জীবনের করুণ ক্রন্দনকে তিনি জীবনরসিকের সহানুভূতিতে দেখেছিলেন, যা তাঁর অনুগামীরা পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে নীতির কথা বলেন নি। 'সবুজপত্রে'র যুগে তিনি কিভাবে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তার চিত্র আবিষ্কারে আমরা সক্ষম হয়েছি। তবুও মনে হয় তাঁর সৌন্দর্যবাদ বা 'কান্তিকৈবল্যবাদে'র (Art for Aesthetic's Sense) অন্তরালে নীতিবাদের গন্ধ 'কস্তুরি মৃগনাভি সম' সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তিনি নীতির কথা প্রকাশ্যভাবে না বললেও কল্যাণের কথা বলেছেন। ফলে, বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব অধিক নয়। একজন বলেছেন সাহিত্যের কাজ জগতের হিতসাধন ও অপরজনের বিচারে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মঙ্গল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যরসের সাধনায় কোন সামাজিক নীতি ও দায়ভাগের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বহন করেন নি কখনও।

শরৎচন্দ্র প্রচলিত অর্থে Art for Art's Sake বা 'কলাকৈবল্যবাদ'কে সমর্থন করেন নি। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে শুধু সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্নের দ্বারা সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয় না। সাহিত্যে উভয়েরই প্রয়োজন আছে—সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার ও চিত্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা।

তিনি পরবর্তী কালে অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টার মধ্যে এই ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্যোগ দেখেছিলেন বলে বহু নীতি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এদের সমর্থন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। তরুণরাও তাঁর কাছ থেকে জীবনের ক্ষেত্রে সত্য কথা বলবার স্পর্ধা অর্জন করেছিল। শরৎচন্দ্র অতি আধুনিকদের সাহিত্যসাধনার নীতিকে সমর্থন করে বলেছিলেনঃ "আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই বয়ে চলেচে, মানব-মানবীর যাত্রা-পথের সীমা আজও তেমনিই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্তি তেমনই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা।···যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ-দুঃখের বাহিরে,···তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দিষ্ট পথের সংকেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ করে থাকবে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায়! তাঁদের চিন্তা, ভাব আজ অসঙ্গত, এমন কি, অন্যায় বলেও ঠেকতে পারে, কিন্তু তারা না বললে বলবে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে

প্রকাশ করবে-না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সংবর্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই।...আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি।...সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেচে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনায় সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে ত তার কুৎসা করা চলে না...।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে-ই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। ...সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়? ...আনন্দ ও সৌন্দর্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, এ-কথা কোনমতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হতে পারে; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক সাহিত্য-সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন। ...সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেচেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেচে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না; অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না।[৭৯]

অতি আধুনিক সাহিত্যসেবীদের বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয়ের অভিযান ও সত্যানুসন্ধান শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করেছিল এবং সেই সঙ্গে আপন জীবনচিন্তার সঙ্গে তাঁদের

সাহিত্য-দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে, তিনি অতি আধুনিক সাহিত্যসেবীদের পক্ষ হয়ে সমস্ত নীতিবাদী ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছিলেন। এমন কি তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম'' প্রবন্ধের জবাবে বহুলাংশে তরুণদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই তারুণ্য প্রীতি ও সমর্থন মতবাদ অধিকদিন স্থায়ী হয় নি। তিনি পরবর্তীকালে অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যচিন্তা ও রচনাশৈলীকে সমর্থন করতে পারেন নি। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন চিঠিপত্রে, সভা-সমিতির নানা বক্তৃতায়।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলা সাহিত্যের ভাবদ্বন্দ্বের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ, 'সবুজপত্র' এবং শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বিরোধিতার তরঙ্গপ্রবাহ তীব্র বেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভাবদ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্বে অচিন্ত্য, প্রেমেন, বুদ্ধদেব প্রভৃতি অতি আধুনিক সাহিত্যিকেরা বিদ্রোহী সেনাপতির ভূমিকা নিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ আধুনিক নয়'—রবীন্দ্রবিরোধী ধূলোটের একমাত্র বুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাজবাস্তবতা, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার অন্তরালে চৈতন্যপ্রবাহের স্বরূপ বিচার এবং মনোবিকলন তত্ত্বের প্রকৃত পরিচয় পূর্ণভাবে চিত্রিত হয়নি। 'কলাকৈবল্যবাদে'র অস্বীকৃতি এবং ঔপনিষদিক ভাবধারায় জীবনের প্রতি গভীর আস্থা ও মনুষ্যপ্রেমের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাসকে অতি আধুনিক সম্প্রদায় যুগ ও কালের বিচারে সাহিত্য রচনার ভাবধারার পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। এই নতুন পথিক দল সাহিত্য রচনাতে যে ভাবধারার অবতারণা করেন, রক্ষণশীল ও প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত সমালোচকগণ এবং রবীন্দ্রানুরাগী ভক্তরা অত্যন্ত উগ্রভাবে তার বিরোধিতা করেন। তাঁরা অতি আধুনিকদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনেন। নবীনরাও তাঁদের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তির অবতারণা করেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা যে, রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের ভাবদ্বন্দ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি 'তরুণ তুর্কী'দের সাহিত্যচিন্তা ও নীতি-বাদের সমালোচনা করলেও, তাঁদের সৃষ্টি ক্ষমতাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। নবীন ও প্রাচীন মতাবলম্বী উভয় সম্প্রদায়ই একত্রযোগে সাহিত্য মীমাংসার বিচারকরূপে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে,—এই পর্বের এটাই ছিল সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সর্বৈবভাবে অতিক্রম করবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন এবং অপরদিকে যে সম্প্রদায় তরুণদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও ভর্ৎসনার গালি নিক্ষেপ করে তাঁদের প্রদমিত করতে চেয়েছিলেন, উভয়েই একত্রিত হন 'বিচিত্রা ভবনে' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে।

অবশ্য এ ইতিহাস ভাবদ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের।